বাংলাদেশে শক্তিশালী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকাঃ পরিপ্রেক্ষিত ইউনিয়ন পরিষদ

Role of Elected Women Representatives in Strengthening Local Self-Government in Bangladesh: Union Parishad Perspective

পিএইচ ডি ডিগ্রীর জন্য অভিসন্দর্ভ

গবেষক

সুলতানা নাজমীন

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক

ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণ

শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুন, ২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে শক্তিশালী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকাঃ পরিপ্রেক্ষিত ইউনিয়ন পরিষদ

Role of Elected Women Representatives in Strengthening Local Self-Government in Bangladesh: Union Parishad Perspective

পিএইচ ডি ডিগ্রীর জন্য অভিসন্দর্ভ

গবেষক

সুলতানা নাজমীন

বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

বাংলাদেশ, ঢাকা।

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক

ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণ

শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুন, ২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

বাবা ও মাকে

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, পিএইচ ডি ডিগ্রীর জন্য সুলতানা নাজমীন কর্তৃক রচিত বাংলাদেশে শক্তিশালী স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকাঃ পরিপ্রেক্ষিত ইউনিয়ন পরিষদ শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বধানে সম্পাদন করেছেন। গবেষণা কর্মটি একটি মৌলিক গবেষণা। আমার জানা মতে, এই অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক

ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণ

শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ: জুন ২৫, ২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, বাংলাদেশে শক্তিশালী স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকাঃ পরিপ্রেক্ষিত ইউনিয়ন পরিষদ শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে, এই শিরোনামে অন্য কেউ ইতোপূর্বে গবেষণা করেনি। পিএইচডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

তারিখঃ ২৫ জুন, ২০১৪

সুলতানা নাজমীন

সহযোগী অধ্যাপক

বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

বাংলাদেশ, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারায় আমি সর্বপ্রথমেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তালার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনি আমাকে ধৈর্য্য ও শক্তিদান করায় আমি কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। এর পরই আমি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণ স্যার এর প্রতি। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য্য ও আন্তরিকতার সাথে দীর্ঘ সময় ব্যয় করে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং অভিসন্দর্ভটি সংশোধন করে দিয়েছেন। ফলে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সহজসাধ্য হয়েছে। এমন একজন অভিজ্ঞ গবেষকের অধীনে কাজ করতে গিয়ে আমি যে বিষয়গুলো শিখেছি, সেই অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। তাই আমি গর্বিত এবং আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের কাছে কৃতজ্ঞ।

গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের যেসব নারী সদস্য দীর্ঘক্ষণ ধরে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, কষ্ট সহ্য করে ইউনিয়ন পরিষদে উপস্থিত থেকেছেন এবং বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এছাড়াও তথ্য সংগ্রহের কাজে চেয়ারম্যান, পুরুষ সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, গ্রাম পুলিশ ও এলাকার সাধারণ জনগণের সহযোগিতা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি।

গবেষণার প্রয়োজনে সকল স্তরের লাইব্রেরী ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আমাকে যে সহযোগিতা করেছে তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে এনআইএলজি, খান ফাউণ্ডেশন, স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা আমাকে বিভিন্নভাবে তথ্য সরবরাহ ও অন্যান্য সহযোগিতা করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাই আমি তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।

আমার তথ্য সংগ্রহের কাজে সার্বক্ষণিক সময় দিয়েছেন আমার শ্রদ্ধেয় মামী ইসমতআরা খাতুন এবং আমার স্নেহধন্য ভাই ইসমাতুল বারী। যাদের সঠিক সহযোগিতা ছাড়া প্রত্যন্ত অঞ্চলের তথ্য সংগ্রহ করা ছিল প্রায় অসম্ভব। এছাড়াও অভিসন্দর্ভটির কম্পিউটার কম্পোজের কাজেও ইসমাতুল বারী পরিপূর্ণভাবে সহযোগিতা করেছে। কাজেই তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

আমার গবেষণাকর্মে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন আমার মা-বাবা এবং স্বামী। তাঁদের অনুপ্রেরণাই আমাকে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে। তাঁদের প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। গবেষণা কর্মটি চলাকালীন সময়ে আমি আমার সন্তানদের দীর্ঘ সময় ধরে অনেক বঞ্চিত করেছি। তারা আমার সময়, আদর ও যত্ন থেকে অনেক বঞ্চিত হয়েছে।

পরিশেষে আমি আবারও মহান আল্লাহ্ তালার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সুলতানা নাজমীন

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সারাংশ

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ প্রয়োজন। তেমনি স্থানীয় পর্যায়েও গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিশ্চিত করার জন্য দরকার নারী ও পুরুষ উভয়ের সমান অংশগ্রহণ ও সঠিক প্রতিনিধিত্ব। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারী ও পুরুষকে যদি সঠিক ভাবে কাজে লাগানো যায় তাহলে তারা দেশের সার্বিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

স্থানীয় সরকার কাঠামোর সর্বনিম্ন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্তর হচ্ছে আমাদের ইউনিয়ন পরিষদ। বৃটিশ শাসনামলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত নারীদের ভোটাধিকার ছিল না। ১৯৫৬ সালে স্থানীয় সংস্থাগুলোতে নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে। ১৮৭০ সালের আইন অনুসারে প্রথম চৌকিদারি পঞ্চায়েত নামে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ইউনিয়নের নাম, কাজের পরিধি ও আর্থিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন ও সংশোধন করা হয়েছে। ১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়। এই অধ্যাদেশে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে দু'জন নারী প্রতিনিধি মনোনীত করা হয়। ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে মনোনীত প্রতিনিধির সংখ্যা তিন জন করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের সঠিক প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ (দ্বিতীয় সংশোধনী) বিল ১৯৯৭ পাশ হয়।

১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রবর্তিত নতুন আইনে নারীদের জন্য ৩টি সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা হয়। ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমেই প্রথমবারের মত নারী সদস্যরা প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হবার যোগ্যতা অর্জন করেন। পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদে অর্ধেক জনগোষ্টীকে সম্পৃক্তকরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার পর ইউনিয়ন পরিষদে ভূমিকা পালনে প্রথমেই নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। ১৯৯৭ সালের পর ২০০৩ সালে এবং ২০১১ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ১৯৯৭ অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

বর্তমানে স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের কথা বলা হচ্ছে। স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা কি ভূমিকা পালন করছেন, প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টিতে কতটুকু সক্ষম হয়েছেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উন্নয়ন প্রকল্পে কতটুকু অংশগ্রহণ করেছেন এসব বিষয়গুলোই এই গবেষণায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণা কর্মটি মোট সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছেঃ-

প্রথম অধ্যায়ঃ প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা, গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণার যৌক্তিকতা, গবেষণার সীমাবদ্ধতা, গবেষণার অধ্যায় সমূহ এবং প্রাসঙ্গিক বই পত্রের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে এবং নারীর উন্নয়নে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট, জাতিসংঘের ভূমিকা ও তাত্ত্বিক কাঠামো তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও স্থানীয় সরকারে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের গঠন কাঠামো ও কার্যাবলীসমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থায় (ইউনিয়ন পরিষদ) নারীদের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে, বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে নারীদের অবস্থানের চিত্র ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ এই অধ্যায়ে ২০১১ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নির্বাচিত নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিষয়ে সংগৃহীত তথ্যগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নির্বাচিত নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তা পর্যায়ক্রমে শতকরা হারে এবং কিছু তথ্য সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা কি ভূমিকা পালন করছেন এই প্রসঙ্গে গবেষণা এলাকার উত্তরদাতাদের প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে নারী প্রতিনিধিদের সমস্যা আলোচনা করা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে কিছু সুপারিশ করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ঃ উপসংহার। ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নে নারীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে স্থানীয় সরকারে নারীর ভূমিকা পালন করার যে পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে তা অনেকাংশেই বিদ্যমান সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার কারণে কাংঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হচ্ছে না।

সবশেষে বলা যায়, নারী প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হলেই যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার শক্তিশালী হবে তা নয়। কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। নারী প্রতিনিধিদের মতামতের গুরুত্ব দিতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা সঠিকভাবে বাস্তবায়নেরও সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। তবেই তৃণমূল পর্যায়ে রাজনীতিতে নারী তাঁর সঠিক অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হবে এবং শক্তিশালী হবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদ।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

অধ্যায়সমূহ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	i-ii
	গবেষণার সারাংশ	iii-iv
প্রথম অধ্যায়	ভূমিকা ও গবেষণা পদ্ধতি	১-২১
দ্বিতীয় অধ্যায়	তাত্ত্বিক কাঠামো ও ধারণাগত দিক	২২-৩৭
তৃতীয় অধ্যায়	বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও নারী প্রতিনিধিত্ব	৩৮-৭৩
চতুর্থ অধ্যায়	বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থায় (ইউনিয়ন পরিষদ) নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন	৭৪-১১২
পঞ্চম অধ্যায়	গবেষণা এলাকাধীন ২০১১ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র ও ভূমিকা	১১৩-১৬২
ষষ্ঠ অধ্যায়	ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ	১৬৩-১৭৮
সপ্তম অধ্যায়	উপসংহার	১৭৯-১৯০
-	গ্রন্থপঞ্জি	১৯১-১৯৩
	পরিশিষ্ট: গবেষণায় ব্যবহৃত প্রশ্নমালা	১৯৪-২০১

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ও গবেষণা পদ্ধতি

১.১ ভূমিকা

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি

ক) গবেষণার প্রকৃতি

খ) তথ্য উপাত্তের নমুনা নির্বাচনঃ

গ) প্রশ্নপত্র প্রণয়নঃ

ঘ) প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠ জরিপঃ

ঙ) গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বিতকরণঃ

১.৪ গবেষণার যৌক্তিকতা

১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

১.৬ গবেষণার অধ্যায়সমূহ

১.৭ পুস্তক পর্যালোচনা

১.১ ভূমিকাঃ

রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ প্রয়োজন। স্থানীয় পর্যায়ে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিশ্চিত করার জন্য দরকার নারী ও পুরুষ উভয়ের সমান অংশগ্রহণ ও সঠিক প্রতিনিধিত্ব। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। তাই এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীর চাহিদা, আশা, আকাঙ্খার প্রতিফলন জাতীয় ও স্থানীয় উন্নয়নে থাকা একান্তই আবশ্যক।[১] কারণ নারী ও পুরুষকে যদি সঠিক ভাবে কাজে লাগানো যায় তাহলে তাঁরা দেশের সার্বিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন।

রাজনীতিসহ জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমান অংশগ্রহণের দাবী এখন আর মোটেই অযৌক্তিক নয়। ইউনিয়ন পরিষদ হচ্ছে স্থানীয় সরকারের মূল ভিত্তি যার মাধ্যমে দেশের তৃণমূল পর্যায়ের বিশাল জনগোষ্ঠীকে রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। যদিও তুলনামূলকভাবে উন্নত ও উন্নয়নশীল সমাজে স্থানীয় পর্যায়ে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ কম তথাপি জাতীয় পর্যায়ের মতো রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের স্থানীয় পর্যায়ে সম্পৃক্ততা বা প্রতিনিধিত্ব থাকা খুবই প্রয়োজনীয়।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন তারা দেখিয়েছেন স্থানীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং স্থানীয় বিষয়াদিতে নারীর বিশেষ আগ্রহ ও স্বার্থ রয়েছে।[২] বাংলাদেশের সর্বোচ্চ দলিল সংবিধানে নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের ১০, ১৯ (১) (২), ২৭, ২৮ (১) (২) (৩), ২৯ (১) (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক কর্মক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রে সমান সুযোগ পাবে।[৩] বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা যেমন সিডও, মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল, পিআরএসপি, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

এছাড়া বিশ্বব্যাপী নারীর অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যেমন-

- মেক্সিকো সিটি প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন -১৯৭৫ সালে
- কোপেনহেগেন দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন -১৯৮০ সালে
- নাইরোবি তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন -১৯৮৫ সালে
- বেইজিং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন-১৯৯৫ সালে
- নিউইয়র্ক বেইজিং প্লাস ফাইভ-২০০০ সালে

নারীর মানবাধিকার এবং নারী উন্নয়ন ইস্যুটির আন্তর্জাতিকায়ন করে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপর একটি নৈতিক দায়িত্ব আরোপ করতে এই সম্মেলনসমূহ সমর্থ হয়েছে।[৪] জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ এবং ১৯৭৫-৮৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করে। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন (**সিডও**) এবং বিভিন্ন ধারায় নারীর সকল অধিকারের পাশাপাশি নারীর রাজনৈতিক অধিকার ও নারী পুরুষের সমান প্রতিনিধিত্বের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের ভিত্তি রচিত হয়। পরবর্তীকালের সকল বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে সম্মেলনের ঘোষণা, সনদ ও কর্মপরিকল্পনায় অনুস্বাক্ষর করেছে।[৫]

এরই ধারাবাহিকতায় সরকারি ও বেসরকারী পর্যায়ে নারীর উন্নয়নের বিভিন্ন রকম কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতার পর পঞ্চবার্ষিক ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোতে নারীর অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু পঞ্চবার্ষিক ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোতে বরাদ্দকৃত সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে নারীর বাস্তবে অগ্রগতি সম্ভব হয়নি। কাজেই সংবিধান, আন্তর্জাতিক সনদ এবং পঞ্চবার্ষিক ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অধিকার থাকলেও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বাস্তবে এর প্রতিফলন ঘটেনি।

আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সরকারি বেসরকারী পরিকল্পনাগুলোর মাধ্যমে যে বিষয়গুলো নারীর অধিকার আদায়ের মূল উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে তার সফল বাস্তবায়ন তখনই সম্ভব হবে যখন সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রতিটি স্তরে নারী সচেতন ভাবে অংশগ্রহণ করবেন। সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক সনদে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অধিকার থাকলেও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বাস্তবে এর প্রতিফলন ঘটেনি। রাজনীতিতে অংশগ্রহণের

পূর্বশর্ত হলো রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান ও ধারণা, রাজনীতি বিষয়ে আগ্রহ, উৎসাহ, সচেতনভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা অর্জন। সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ড. নাজমা চৌধুরী একটি জাতিসংঘ স্টাডির উল্লেখ করে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের পাঁচটি কারণ দেখিয়েছেন।

প্রথমতঃ গণতন্ত্র ও সমতার প্রশ্ন নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন জনসংখ্যার অনুপাতে রাজনীতিতে তাদের প্রতিনিধিত্বের দাবী অনস্বীকার্য। **দ্বিতীয়তঃ** নারীর দুর্বল উপস্থিতি রাজনীতি অঙ্গনে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। কেননা, রাজনৈতিক কাঠামো ও প্রক্রিয়ায় অপ্রতুল উপস্থিতি ও সীমিত অংশগ্রহণের কারণে নারী সমাজ ও রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে রয়ে যায় এক বিরাট ব্যবধান বা ডিসজাংশন। **তৃতীয়তঃ** যুক্তি নারী পুরুষের স্বার্থের ভিন্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত। নারীরা তাদের মৌলিক সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পর্কে ওয়াকেবহাল। কিন্তু যদি রাজনীতিতে তাদের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব না থাকে তাহলে তারা তাদের স্বার্থ উপস্থাপন ও সংরক্ষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। **চতুর্থতঃ** নারীর সবল সংখ্যায় রাজনীতিতে প্রবেশ রাজনীতির মূল ফোকাসে বাঞ্চনীয় পরিবর্তণ ও বিস্তৃতি ঘটাবে। কেননা, নারীর জীবন ও সমস্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে সমস্ত সমস্যা নেহায়েত ব্যক্তিগত বলে চিহ্নিত এবং যথার্থ রাজনীতির আওতা বর্হিভূত বলে বিবেচিত সেগুলিও রাজনীতির প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচিত হবে। **সর্বশেষে,** দেশের মানব সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের প্রয়োজনেও রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর সবল উপস্থিতি আবশ্যক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬]

স্থানীয় সরকার কাঠামোর সর্বনিম্ন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্তর হচ্ছে আমাদের ইউনিয়ন পরিষদ। বৃটিশ শাসনামলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত নারীদের ভোটাধিকার ছিল না। ১৯৫৬ সালে স্থানীয় সংস্থাগুলোতে নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে।[৭] ১৮৭০ সালের আইন অনুসারে প্রথম চৌকিদারি পঞ্চায়েত নামে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮] পরবর্তীতে ইউনিয়নের নাম, কাজের পরিধি ও আর্থিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন ও সংশোধন করা হয়েছে।

১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়। এই অধ্যাদেশে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে দু'জন নারী প্রতিনিধি মনোনীত করা হয়।

১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে মনোনীত প্রতিনিধির সংখ্যা তিন জন করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের সঠিক প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ (দ্বিতীয় সংশোধনী) বিল ১৯৯৭ পাশ হয়।[৯]

ইউনিয়ন পরিষদের সংশোধিত আইন আনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়নকে ৩টি ওয়ার্ডের পরিবর্তে ৯টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়। প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ১ জন সাধারণ সদস্য এলাকাবাসীর প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত করার নিয়ম করা হয়। নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৩টি আসন নির্ধারিত থাকে। ৩টি সংরক্ষিত আসনে নারীদের মনোনয়নের পরিবর্তে নারী পুরুষ নির্বিশেষে ভোটারের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রবর্তিত নতুন আইনে নারীদের জন্য ৩টি সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা হয়। নতুন আইনে প্রতিটি ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে ৯ জন সাধারণ সদস্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং এই ৯ টি ওয়ার্ডকে ৩ ভাগে ভাগ করে প্রতি ভাগে একটি করে সদস্যপদ নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ৯টি ওয়ার্ড থেকে একজন করে ৯ জন সদস্য এবং ইউনিয়নের প্রতি ৩টি ওয়ার্ড থেকে (সংরক্ষিত আসনে) একজন করে নির্বাচিত নারী সদস্য নিয়ে বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত।

১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রবর্তিত নতুন আইনে নারীদের জন্য ৩টি সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের উদ্দেশ্য হলো, ইউনিয়ন পরিষদে সিদ্ধান্তগ্রহণ, নীতি নির্ধারণ, বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, স্থানীয় সম্পদ আহরণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ণে স্থানীয় নারীদের সরাসরি সম্পৃক্তকরণ ও সর্বাত্মক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারী সদস্যরা প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটারদের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পান। নারীর উন্নয়নে নিঃসন্দেহে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। স্থানীয় পর্যায়ে নারীর এই অংশগ্রহণ কার্যকর ভূমিকা রাখলে ভবিষ্যতে জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রেও বড় ধরণের অবদান রাখবে। তৃণমূল পর্যায়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। তৃণমূল পর্যায়ে অধিকার বঞ্চিত নারীদের অধিকার আদায় ও অর্থনৈতিক মুক্তি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীরা সহায়তা দিয়ে উন্নয়ন ঘটাতে পারে। কিন্তু ১৯৯৭ সালে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সদস্যরা নির্বাচন পরবর্তী সময়ে জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত নারী সদস্য সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীগণ অভিযোগ করেছিলেন যে, তারা সুষ্ঠুভাবে কাজ

করতে পারছেন না। পুরুষ সদস্য ও চেয়ারম্যানগণ তাদেরকে ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নমূলক কাজে উপেক্ষা ও অসহযোগিতা করছেন।

পরবর্তী কালে ২০০৩ সালে ইউনিয়ন পরিষদের সপ্তম নির্বাচনে দেশের তৃণমূলের নারীরা দ্বিতীয় বারের মত ক্ষমতার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ২৫ জানুয়ারি ২০০৩ থেকে ১৬ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত ৫১ দিনে পর্যায়ক্রমে দেশের ৪ হাজার ২২৮টি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচিত হয়েছিলেন ১২ হাজার ৬৭৯ জন নারী প্রতিনিধি যা ১৯৯৭ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যদের তুলনায় কম ছিল।

নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করতে না পারার ফলে এমনটি হয়েছে। স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে আগের মতই তিনটি সাধারণ আসনের সমন্বয়ে একটি সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচনের বিধান অনুমোদন করেছে। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে মোট তিনজন সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। ২০১১ সালে এরই আলোকে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নারীদের সংখ্যা বাড়লেও বাস্তবে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে তারা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারছেন না। বৈষম্যের শিকার ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের আর্থ-সামাজিক জীবন, ভূমিকা পালনে বাধাবিঘ্ন ও সমস্যাসমূহের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। তৃণমূল পর্যায়ে কার্যকর প্রতিনিধিত্ব, নেতৃত্ব গঠন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নারীরা কতটুকু সক্ষম সেগুলোর পর্যবেক্ষণ করা এই গবেষণার গুরুত্ব নির্ধারণ করেছে। নির্বাচিত হওয়ার পর নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করতে পারছেন কি না, কতটুকু ক্ষমতা ভোগ করছেন, উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনায় নারী সদস্যগণ ভূমিকা পালন করতে পারছেন কি না, তাদের অবস্থার কোন উন্নয়ন ঘটেছে কি না, সমাজে তারা কোন অবদান রাখতে পারছেন কি না, এসব বিষয় এ গবেষণায় অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হবে।

১.২ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে শক্তিশালী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠায় ২০১১ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা কি ভূমিকা পালন করছে তা অনুসন্ধান করা এবং তাদের ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণ করা।

এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও আলোচনা করা হবে :

১. বাংলাদেশে শক্তিশালী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠায় ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করা।

২. স্থানীয় সরকারের ক্রমবিকাশ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন শাসনামলে ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের অবস্থান মূল্যায়ণ করা।

৩. ২০১১ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা।

৪. বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদে নারী সদস্যদের নির্বাচিত হয়ে আসার প্রক্রিয়া পরিষদের কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহণের প্রকৃতি সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা অনুসন্ধান করা।

৫. স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের পক্ষে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিশ্লেষণ করা।

৬. সিদ্ধান্তগ্রহণ, নীতি নির্ধারণ ও স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যাগুলো সমাধানে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছেন তা পরীক্ষা করা।

৭. সর্বোপরি, দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণে প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণয়ন করা।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি ঃ

গবেষণার ফলাফল ও মান বহুলাংশে নির্ভর করে সঠিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণের উপর। গবেষণার এই অংশে বর্তমান গবেষণা কর্মে ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। যে কোন গবেষণা কর্মে কী ধরণের গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করে চিহ্নিত গবেষণা সমস্যা এবং কী কী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ের উপর।

এমতাবস্থায়, চিহ্নিত গবেষণা সমস্যার সমাধানের জন্য নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য এবং অনুকল্প (Hypothesis) প্রমাণ করার জন্য ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো। এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমান গবেষণা কর্মটি বর্ণনা এবং বিশ্লেষণমূলক হওয়ায় নিম্নরূপ একটি হাইপোথিসিস বা অনুকল্প ভাবা হয়েছিল।

অনুকল্প ঃ "বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকা অত্যাবশ্যক।" বর্তমান গবেষণায় প্রাথমিক তথ্যের উপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এ কারণে গবেষণার ফলাফল বহুলাংশে মৌলিক গবেষণার দাবীদার।

ক) গবেষণার প্রকৃতি ঃ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমান গবেষণা কর্মটি বর্ণনা এবং বিশ্লেষণমূলক। তবে গবেষণা কর্মটি বর্ণনা এবং বিশ্লেষণমূলক হওয়ায় আলোচনায় নির্ধারিত গবেষণা সমস্যার প্রকৃতি ও গভীরতা সঠিক ভাবে উপলব্ধি করে সমাধান সম্পর্কে নতুন এবং ফলপ্রসূ দৃষ্টিভঙ্গী (insight) ও দিক নির্দেশনা (direction) দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া, বর্ণনামূলক পরিসংখ্যাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করায় গবেষণা কর্মটি অনেকটা তাত্ত্বিক এবং বস্তুনিষ্ঠ হয়েছে।

খ) তথ্য উপাত্তের নমুনা নির্বাচনঃ

মোট পাঁচ ধরণের উত্তরদাতার কাছ থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্যের সাথে এই পাঁচ ধরণের উত্তরদাতাই সংশ্লিষ্ট। বাংলদেশে শক্তিশালী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠায় (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকার সাথে এই পাঁচটি পক্ষই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। এই পাঁচ শ্রেণীর নমুনাই উদ্দেশ্যমূলক (purposive) এবং সুবিধামত (convenient) নির্বাচন করা হয়েছে। বাংলাদেশের পাঁচটি বিভাগ থেকে উল্লিখিত নমুনা নির্বাচন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট পাঁচ ধরণের নমুনার উপরই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাই নমুনাসমূহ প্রতিনিধিত্বমূলক হয়েছে বলে দাবি **করা যায়**।

নমুনাসমূহ নিম্নরূপঃ

সারণিঃ ১. বিভাগওয়ারী ইউনিয়ন ও নমুনা ঃ

নির্বাচিত বিভাগসমূহ	নির্বাচিত ইউনিয়ন সংখ্যা	তিটি ইউনিয়ন থেকে নমুনায় অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতার সংখ্যা
১. ঢাকা	৩ টি	নারী সদস্য = ৩ জন পুরুষ সদস্য = ৩ জন চেয়ারম্যান = ১ জন সচিব = ১ জন সাধারণ জনগণ = ১০ জন
২. খুলনা	৩ টি	নারী সদস্য = ৩ জন পুরুষ সদস্য = ৩ জন চেয়ারম্যান = ১ জন সচিব = ১ জন সাধারণ জনগণ = ১০ জন
৩. রাজশাহী	৩ টি	নারী সদস্য = ৩ জন পুরুষ সদস্য = ৩ জন চেয়ারম্যান = ১ জন সচিব = ১ জন সাধারণ জনগণ = ১০ জন
৪. বরিশাল	৩ টি	নারী সদস্য = ৩ জন পুরুষ সদস্য = ৩ জন চেয়ারম্যান = ১ জন সচিব = ১ জন সাধারণ জনগণ = ১০ জন
৫. সিলেট	৩টি	নারী সদস্য = ৩ জন পুরুষ সদস্য = ৩ জন চেয়ারম্যান = ১ জন সচিব = ১ জন সাধারণ জনগণ = ১০ জন
মোট		নারী সদস্য = ৪৫ জন পুরুষ সদস্য = ৪৫ জন চেয়ারম্যান = ১৫ জন সচিব = ১৫ জন সাধারণ জনগণ = ১৫০ জন

উল্লিখিত সারণি থেকে লক্ষ করা যায় যে, সর্বমোট ৪৫ জন নির্বাচিত নারী সদস্য, ৪৫ জন পুরুষ সদস্য, ১৫ জন চেয়ারম্যান, ১৫ জন সচিব এবং ১৫০ জন সাধারণ জনগণ নির্বাচিত নমুনায় অন্তর্ভুক্ত করে তাদের কাছ

থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বর্তমান গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। সময়, অর্থ ও সুযোগের অভাবে নমুনার আকার এর চেয়ে বড় করা সম্ভব হয়নি।

গ) প্রশ্নপত্র প্রণয়নঃ

তিনটি ভিন্ন প্রশ্নপত্রের সেট তৈরি করে প্রাথমিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যেক প্রশ্নপত্র সেটেই কাঠামোবদ্ধ (structured) এবং অ-কাঠামোবদ্ধ (unstructured) প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে প্রশ্নপত্রের সেটসমূহের প্রকৃতি অনেকটা আংশিক কাঠামোবদ্ধ (semi- structured) হয়েছে। তথ্য উপাত্তের পরিসর বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়েই মূলতঃ আংশিক কাঠামোবদ্ধ (semi- structured) প্রকৃতির প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি সেটেই দুই ধরণের প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত ছিল। এগুলো হল উদ্দেশ্যমুখী (objective) এবং বিষয়ভিত্তিক (subjective)। কোন কোন প্রশ্নের উত্তর সংখ্যাবাচক (quantitative) এবং কোন কোন প্রশ্নের উত্তর গুণবাচক (qualitative) এ এসেছে। বিষয়ভিত্তিক (subjective) প্রশ্নগুলো গুণবাচক এবং খোলা প্রশ্নে (open-ended) বর্ণনামূলক উত্তর সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে উদ্দেশ্যমুখী (objective) প্রশ্নসমূহ গবেষণা বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সংখ্যাবাচক এবং আবদ্ধ প্রশ্নে (close-ended) উত্তর সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়েছে। উদ্দেশ্যমুখী প্রশ্নসমূহের কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্রে দেওয়া একাধিক প্রশ্ন থেকে উত্তরদাতাকে একটি উত্তর নির্বাচন করতে হয়েছে।

প্রশ্নপত্রে এভাবে নানামুখী প্রশ্ন ব্যবহার করায় গবেষক উত্তরদাতাদের মতামতের গভীরতা উপলব্ধি করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের সত্যিকার ভূমিকা পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রশ্নপত্রগুলি তৈরি করার পর গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের সাথে আলাপ আলোচনা করে তিন সেট প্রশ্নপত্রেই প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন এবং সংশোধন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে প্রতিটি প্রশ্নের প্রয়োজনীয়তা, বাস্তবতা এবং উত্তর সংগ্রহের সক্ষমতাও যাচাই বাছাই করা হয়েছে। এভাবেই তিন সেট প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করা হয়েছে।

ঘ) প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠ জরিপঃ

গবেষণা কর্মটির জন্য গবেষক নিজেই মাঠ জরীপ কাজটি করেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মোট পাঁচটি বিভাগের পনেরটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে তিন সেট প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে মাঠ জরিপের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ইউনিয়নের তিন জন মহিলা সদস্যের কাছ থেকে প্রথম সেট প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দ্বিতীয় সেট প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়েছে তিন জন পুরুষ সদস্য **(মেম্বার)**, চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন পরিষদের সচিবদের জন্য। নারী সদস্যদের ভূমিকার প্রতি পুরুষ সদস্যদের মনোভাব যাচাইয়ের জন্যই মূলতঃ দ্বিতীয় সেট প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়েছে। তৃতীয় সেট প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ জনগণের মতামত সংগ্রহের জন্য। প্রত্যেকটি ইউনিয়নের ১০ জন করে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এভাবে পাঁচটি বিভাগের ১৫ টি ইউনিয়ন থেকে ৪৫ জন নির্বাচিত নারী সদস্য, ৪৫ জন নির্বাচিত পুরুষ সদস্য, ১৫ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ১৫ জন সচিব এবং ১৫০ জন সাধারণ জনগণের কাছ থেকে তথ্য ও মতামত সংগ্রহ করে গবেষণা কর্মটি তৈরি করা হয়েছে।

এ গবেষণায় মাধ্যমিক উৎস থেকেও তথ্য সংগ্রহ করে ব্যবহার করা হয়েছে। স্থানীয় স্বায়ত্তশসিত সরকার ব্যবস্থা ও নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বই, গবেষণা প্রবন্ধ, বিভিন্ন সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, বাৎসরিক প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা হয়েছে। উইমেন ফর উইমেন, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, স্টেপ্স টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট, খান ফাউণ্ডেশন, এনআইএলজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন জার্নাল ও বই থেকেও পর্যাপ্ত তথ্য পাওয় গেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ উন্নয়ন-সমীক্ষা, সমাজ নিরীক্ষণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ইত্যাদিতেও যথেষ্ট তথ্য পাওয়া গেছে।

ঙ) গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বিতকরণঃ

সংগৃহীত উত্তর এবং তথ্য-উপাত্তসমূহ তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এজন্য উত্তরগুলো বর্ণনামূলকভাবে ও ধারবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রয়োজনে কোথও কোথাও শতকরা হারে মতামত উপস্থাপন করা হয়েছে। আবার প্রয়োজনমত ফলাফল সঠিকভাবে বিশ্লেষণের সুবিধার্থে সংগৃহীত তথ্যসমূহ উপযুক্ত সারণির মাধ্যমেও উপস্থাপন করা হয়েছে।

১.৪ গবেষণার যৌক্তিকতা ঃ

ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে এদেশের নারী সমাজের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। নারী সমাজের উন্নয়ন হলে সে সমাজের সমৃদ্ধিও দ্রুত হয়। এদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। কাজেই এই অর্ধেক জনগোষ্ঠী যদি ক্ষমতাহীন, হতাশাগ্রস্থ ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয় তাহলে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র বা দেশ তাদের কাছ থেকে কোন ধরণের গঠনমূলক কিছু আশা করতে পারে না। বিশ্বের বহু দেশের অভিজ্ঞতা বলে স্থানীয় সরকার শক্তিশালী হলে কেন্দ্রীয় সরকারও শক্তিশালী হয়। মজবুত হয় গণতন্ত্রের ভিত্তি। তাই স্থানীয় সরকারে নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ ও সঠিক প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন। ধর্মীয় গোড়ামী, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস নারী জাতির উন্নয়নে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশের নারীরা পরিবার ও সমাজের আদেশগুলো নিষ্ক্রিয়ভাবে মানতে বাধ্য হয়। তারপরেও তৃণমূল পর্যায়ে ফতোয়া ও অন্যান্য সামাজিক, ধর্মীয় বিধিনিষেধ কুসংস্কার উপেক্ষা করে গ্রাম অঞ্চলে নারীরা নির্বাচিত হতে পেরেছেন। কিন্তু নির্বাচিত হলেই নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ বা ক্ষমতায়ন ঘটে যাবে অথবা নারী সঠিকভাবে ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে এমন কথা বলা যায় না। গবেষণায় দেখা গেছে নারী সদস্যগণ সঠিকভাবে তাদের নির্ধারিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারছেন না। সিদ্ধান্তগ্রহণ থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পরিষদের অনেক কাজের ক্ষেত্রেই তাঁরা বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। নারীদের এরূপ বাস্তব সমস্যা ও তার সমাধানকল্পে ব্যাপক গবেষণা পরিচালিত হলে নারীদের ভবিষ্যত রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি। এ ধরনের প্রেক্ষাপটে সমস্যাটিকে আলোচ্য গবেষণার বিষয় হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। শক্তিশালী স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠায় তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের অবস্থান নির্ণয়ে এই গবেষণা কর্মটি একটি যৌক্তিক, তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী গবেষণা হিসেবে বিবেচিত হবে।

১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ঃ

এই গবেষনায় ২০১১ সালে ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকা ও অবদান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সময়, অর্থ ও প্রয়োজনীয় লোকবলের স্বল্পতার জন্য ৫টি বিভাগের ১৫টি ইউনিয়ন পরিষদকে গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল এক্ষেত্রে দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদের বেলায় প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তবুও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকা ও সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও তাঁদের সমস্যার ধরণ সর্বত্রই প্রায় একই রকম বলে ধরে নেয়া যায়।

১.৬ গবেষণার অধ্যায়সমূহঃ

গবেষণা কর্মটি নিম্নলিখিত অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছেঃ

প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা, গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণার যৌক্তিকতা, গবেষণার সীমাবদ্ধতা, গবেষণার অধ্যায়সমূহ, পুস্তক পর্যালোচনা

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ তাত্ত্বিক কাঠামো ও ধারণাগত দিক

তৃতীয় অধ্যায়ঃ বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও নারী প্রতিনিধিত্ব

চতুর্থ অধ্যায়ঃ বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থায় (ইউনিয়ন পরিষদ) নারীদের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন

পঞ্চম অধ্যায়ঃ গবেষণা এলাকাধীন ইউনিয়ন পরিষদে ২০১১ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র ও ভূমিকা

ষষ্ঠঃ ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ

সপ্তম অধ্যায়ঃ উপসংহার

অনুকল্প (Hypothesis)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকা অত্যাবশ্যক।

১.৭ পুস্তক পর্যালোচনাঃ

গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রাসঙ্গিক বই-পত্রের পর্যালোচনা। এই বিষয়ের উপর এ পর্যন্ত যেসব গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে গবেষণা কার্যসমূহ পর্যালোচনা করা হলোঃ-

মোজাম্মেল হক ও কে.এম. মহিউদ্দিন, ইউনিয়ন পরিষদে নারী, পরিবর্তনশীল ধারা, বাংলাদেশের নারী প্রগতি সংঘ, ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ। এটি একটি গবেষণাধর্মী বই। লেখকদ্বয় মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে বইটি রচনা করেছেন। বইটিতে গবেষণা এলাকার নির্বাচিত নারী সদস্যগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, নির্বাচনে প্রার্থীতা, প্রচারণা ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা পালনে তাদের সমস্যার প্রকৃতি, প্রত্যাশা ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাছাড়া বইটিতে ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের সম্পৃক্ততার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার স্বরূপ ও নারীদের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, ১৯৫৬ সালে স্থানীয় সরকার পরিষদে নারীদের ভোটাধিকার প্রদান, ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন প্রণয়ন, ১৯৬৯ সালে গণ-আন্দোলনে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়গুলো উঠে এসেছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, সাংগঠনিক সম্পৃক্ততা পর্যালোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নারীর প্রার্থীতা, নির্বাচনী প্রচার কৌশল এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এনজিওর ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডে নারী সদস্যরা কিভাবে দায়িত্ব পালন করছেন, স্থানীয় জনগণ ও স্থানীয় প্রশাসনের সাথে নারী সদস্যরা কিভাবে সংযোগ রক্ষা করেন সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে নারী সদস্যদের সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং তাদের ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা ও কার্যক্রম সম্পর্কে সিভিল সোসাইটির মতামত আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের উপর বিভিন্ন পুস্তক প্রবন্ধ রচিত হলেও ইউনিয়ন পরিষদে নারী বিষয়ক গবেষণাধর্মী কাজের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এদিক থেকে বলা যায় এবিষয়ে লিখিত এটি একটি পূর্ণাঙ্গ বই।

মেঘনা গুহঠাকুরতা, সুরাইয়া বেগম, হাসিনা আহমেদ, (সম্পাদিত) নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি, সমাজ নিরীক্ষণ, জানুয়ারী, ১৯৯৭, গ্রন্থটিতে নারী বিষয়ক চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে। সম্পাদনামূলক এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে নারীর অগ্রগতি ও পশ্চাদপসরণ এবং বিপ্লবোত্তর সমাজ, রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ এবং অংশগ্রহণের সংকট, বাংলাদেশের মৌলবাদ এবং নারী রাজনৈতিক ক্ষমতা ও নারী আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ ও অংশগ্রহণের সংকট পরিপ্রেক্ষিতে নারী শীর্ষক প্রবন্ধে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সাংবিধানিক সংশোধন, নারী আন্দোলন, নারী বিষয়ে রাষ্ট্রীয় নীতির আলোচনা করা হয়েছে। নারীদের

অথনৈতিক কর্মকাণ্ডে মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণ, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়েছে।

মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন, ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৪ ডিসেম্বর, **১৯৮৯**। বইটিতে অবহেলিত ও নির্যাতিত নারী সমাজের পশ্চাদপদতার কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নারী অধিকার আদায়ের সংগ্রাম ও বিশ্ব প্রেক্ষাপটে নারী শ্রমিকদের ইতিহাস এখানে বর্ণিত হয়েছে। বইটিতে স্থানীয় পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কিত কোন বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়নি।

নাজমা চৌধুরী, হামিদা আক্তার বেগম, মাহমুদা ইসলাম, নাজমুন্নেসা মাহতাব (সম্পাদিত) নারী ও রাজনীতি, উইমেন ফর উইমেন, সেপ্টেম্বর-**১৯৯৪**। নারী ও রাজনীতি শীর্ষক সম্মেলনে যে প্রবন্ধগুলো বা মতামত উপস্থাপিত হয়েছিল সেগুলিকেই এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এই গ্রন্থের "স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া, সমস্যা ও সম্ভাবনা" প্রবন্ধটিতে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের উপাদান, স্থানীয় পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যা দূরীকরণে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রাজনীতিতে নারীর অবস্থান সুসংহত করে নারীর সমস্যাকে রাজনীতির অঙ্গনে প্রতিভাত করে এবং নারী পুরুষ সমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। সবশেষে, বিভিন্ন অধিবেশনে বিশিষ্ট অতিথি, সভাপ্রধান এবং আলোচকবৃন্দের বক্তব্যের অংশ তুলে ধরা হয়েছে।

সেলিনা হোসেন, মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত) নারীর ক্ষমতায়ন রাজনীতি ও আন্দোলন, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, **২০০৩**। গ্রন্থটি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া, এই গ্রন্থটিতে তাত্ত্বিকভাবে নারীর ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে এবং বাংলাদেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে ভবিষ্যতে আমাদের কোন পথে চলা প্রয়োজন এসব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাতেও যে নারীর প্রতিনিধিত্ব এবং তার সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরী সে সম্পর্কে এই গ্রন্থে "স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর ক্ষমতায়ন" শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্ব নিম্নস্তর ইউনিয়ন পরিষদের পটভূমি, ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধির অবস্থান, সমস্যা এবং ভূমিকা কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত সেই প্রসঙ্গগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অধ্যাপক মোঃ আব্দুল মান্নান এবং সামসুন্নাহার খানম মেরী, নারী ও রাজনীতি, ঢাকা; অবসর প্রকাশনা সংস্থা, এপ্রিল, **২০০৬**। বইটি নারী উন্নয়ন ও রাজনীতি বিষয়ক একটি গ্রন্থ। এই বইয়ের প্রথম থেকে সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত নারী সম্পর্কিত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উন্নয়নে নারীর সক্রিয় সম্পৃক্তকরণ, নারী ও উন্নয়ন, জেণ্ডার ও উন্নয়ন এসব বিষয় অষ্টম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। নবম অধ্যায়ে ব্রিটিশ আমল থেকে বাংলাদেশ আমলের বিভিন্ন আন্দোলনে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এই বইয়ের দশম অধ্যায়ে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের সমস্যার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ে নারী নির্যাতন, নারী নির্যাতনের কারণ, প্রতিরোধ, সংবিধানে নারীর ক্ষমতায়ন, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা তথা ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রতিনিধিত্বের ভূমিকা ও ক্ষমতায়ন সম্পর্কে যেমন আলোচনা করা হয়েছে তেমনি নারী সদস্যদের নির্বাচিত হওয়ার পর যথাযথ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার কারণগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং নারী সদস্যদের ভূমিকা বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুদর্শ অধ্যায়ে নারী উন্নয়ন, জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা, বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে নারীর উন্নয়নে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার ঘোষণা, আন্তর্জাতিক সম্মেলনের বিভিন্ন অঙ্গীকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বইটি নারী সম্পর্কিত বিষয়ের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ বই।

দিলীপ কুমার সাহা, স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা, নোয়াখালী, মৈত্রী সাহা, **১৯৯৭**। বইটিতে ৮টি অধ্যায়ে **১৩**টি বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদের সামগ্রিক কার্যাবলী অর্ন্তভুক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ এবং এর কার্যাবলী ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে বইটিতে ধারণা পাওয়া যাবে।

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম তালুকদার, Rural local Government in Bangladesh, Osder Publications **(2012)**. বইটি দুটি অংশে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশে রয়েছে ভূমিকা, ধরণাগত গঠন কাঠামো, উত্তরাধিকার ও ইতিহাস বাংলাদেশের গ্রামীণ স্থানীয় সরকার এবং বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার বিষয়ক আইনসমূহ। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন, রাজনৈতিক ও রাজস্ব প্রেক্ষাপটে স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় নারী পুরুষের অংশগ্রহণ, উপজেলা ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন এবং উপসংহার। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী পুরুষের অংশগ্রহণের বিষয়টিও তিনি অত্যন্ত সাবলীলভাবে আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে নারীর অধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার কারণগুলো তুলে ধরেছেন।

Kamal Siddiqui, Local Government in Bangladesh, The University Press Limited, (2005). স্থানীয় সরকারের উপর লিখিত এটি একটি গবেষণাধর্মী গুরুত্বপূর্ণ বই। বইটি নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। বইটিতে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত বিষয়টি সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা, বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের বিবর্তন, এর গঠন কাঠামো, কার্যাবলী, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের মধ্যকার সম্পর্ক, স্থানীয় সরকারের প্রধান প্রধান ইস্যু ও সমস্যার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। স্থানীয় শাসন কাঠামোয় মহিলা প্রতিনিধিদের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে।

Local Government in Bangladesh ১৯৮৪, ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব লোকাল গভর্ণমেন্ট (এন, আই, এল, জি), ঢাকা। বইটি দ্বিতীয় সংস্করণে কামাল সিদ্দিকী বাংলায় বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার শিরোনামে বইটি প্রকাশ করেন ২০০৯ সালে। বইটিতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে এর নিজস্বতা তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটা তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। স্থানীয় সরকারের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

কে.এম. টিপু সুলতান (সম্পাদিত) বিকেন্দ্রীকরণ স্থানীয় সরকার ও সম্পদ আহরণ, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বার্ড (১৯৮৫), গ্রন্থটিতে বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনের ধারণা, তত্ব ও বিশ্লেষণমূলক কাঠামো আলোচনা করা হয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকার ও সম্পদ আহরণে এশীয় দেশগুলোর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রশাসন ও উন্নয়নে স্থানীয় পর্যায়ের সংগঠনের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সিরাজ উদদীন আহমেদ, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি মেক্সিকো থেকে বেইজিং ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা (২০১২) গ্রন্থটিতে ১৯৯৭ সালে গৃহীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া, লেখক আন্তর্জাতিক নারী ইস্যুতে বিভিন্ন সম্মেলনে যোগদানের বাস্তব অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। ১৯৯৭ সালের নারী উন্নয়ন নীতির পর ২০০৪, ২০০৮ এবং ২০১১ সালের নারী নীতিগুলো সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বইটিতে।

Bishawjit Mallick, Local Government: Local People's Institution a Compliation on Local Government Issue, Dhala: AH Development Publishing House, 2004.

বিভিন্ন দেশের স্থানীয় সরকার কাঠামোর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া ছাড়াও বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের ক্রমবিবর্তন ও বিভিন্ন শাসনামলে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের গঠন কাঠামো, কার্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

Mohammad Mohabbat Khan, Local Government in Bangladesh: Some Contemporary Issues and Practices, Dhaka: AH Development Publishing House, 2011.

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের উপর লিখিত এটি একটি গবেষণাধর্মী বই। বাংলাদেশের ৬ টি বিভাগের ৯০ টি ইউনিয়ন পরিষদের উপর মাঠ পর্যায়ে গবেষণা করে তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদের সমস্যাগুলো তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ঐতিহাসিক ক্রম বিবর্তন ও বিভিন্ন শাসনামলে স্থানীয় সরকারের গঠন কাঠামো ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

ড. প্রতিমা পাল মজুমদার, জাতীয় বাজেটে নারীর অংশ, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা: **২০০১,** প্রকাশনাটিতে জাতীয় বাজেটে নারীদের জন্য বরাদ্দের বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নারী উন্নয়ন এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ, আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য, বাজেটে নারীর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বরাদ্দ না থাকার কারণসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। বাজেটে যথাযথ বরাদ্দ না থাকলে কোন পলিসিই নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে না। সেই প্রেক্ষাপটেই দেশের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ও বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এবং জাতীয় বাজেটে নারী উন্নয়নের জন্য বরাদ্দের বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করেছেন।

একে শমসুল হক (সম্পাদিত) ইউনিয়ন পরিষদ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, ঢাকা: এন, আই, এল, জি, **২০০৩**। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার পদ্ধতিতে প্রশাসনিক একাংশ হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলটি দু'টি খণ্ডে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে আইন ও

বিধিবিধান সংক্রান্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হল, বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের পটভূমি এবং ক্রমবিকাশ, ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যাবলী অফিস ব্যবস্থাপনা, সভা, স্থায়ী/ অতিরিক্ত কমিটি, কর্মচারী ব্যবস্থাপনা, অফিস ব্যবস্থাপনা,বিচার কার্য, স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, সমাজকল্যাণ কার্যক্রম, জেণ্ডার, গ্রামীণ উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি ইত্যাদির উপর বিস্তারিত ভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশ বিধি ও আইনসমূহ সম্পর্কেও বইটিতে উল্লেখ করা রয়েছে।

বদিউল আলম মজুমদার, গণতান্ত্রিক উত্তরণ স্থানীয় শাসন ও দারিদ্র্য দূরীকরণঃ **২০১১**, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা। বইটিতে নারী উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তোফায়েল আহমেদ, বৃত্ত ও বৃত্তান্ত : বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় শাসন, রাজনীতি ও উন্নয়ন ভাবনা, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী**, ২০১১,** নামক বইটিতে স্থানীয় সরকারের সমস্যা, সম্ভাবনা ও এ সময়ের করণীয়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর ক্ষমতায়ন, স্থানীয় জাতীয় বাজেট ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণের তাত্ত্বিক ধারণাসমূহ বাস্তবে প্রয়োগের পর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় তার প্রতিফলনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলোর উপর একটি পর্যবেক্ষণমূলক আলোচনা করা হয়েছে।

কাজী মোহাম্মদ আফছার হোসেন ছাকী (সম্পাদিত) ইউনিয়ন পরিষদে মৌলিক বিষয়, ঢাকা: এন, আই, এল, জি, **(১৯৯১)** বইটিতে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী, আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৯৭ সালে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতিমালা উল্লেখপূর্বক স্থানীয় উন্নয়নে নারীর ভূমিকার উপর আলোচনা করা হয়েছে।

তোফায়েল আহমেদ, স্থানীয় সরকারের সংস্কার ভাবনার দুই দশক, কোষ্টাল এসোশিয়েশান ফর সোস্যাল ট্রান্সফরমেশন (কোষ্ট ট্রাষ্ট), ভোলা, ফেব্রুয়ারি**, ১৯৯৮**। স্থানীয় সরকারের উপর লিখিত এটি একটি গবেষণাধর্মী বই। লেখক বইটিতে স্থানীয় সরকারের সমস্যাগুলো তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম ঘনিষ্ট একটি নতুন কাঠামো এবং সে কাঠামোর আওতায় জনবল, অর্থায়ন, আইনশৃঙ্খলা, বিচার, জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। স্থানীয় সরকার

কাঠামোর ব্যাপক আলোচনা ছাড়াও চার স্তর বিশিষ্ট গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের পরিবর্তে থানা ও ইউনিয়ন এই দুই স্তরে স্থানীয় সরকার গঠনে সুপারিশ করা হয়েছে বইটিতে।

Julia Moin, Empowerment of Women and Their participation in Local Government Politics. Dhaka: AH Development Publishing House: 2011.

বইটিতে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়গুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা হয়েছে। নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও স্থানীয় রাজনীতিতে নারীদের অবস্থানের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। স্থানীয় রাজনীতিতে নারীর অবদানের পাশাপাশি তাদের সমস্যা, সীমাবদ্ধতা এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্থানীয় রাজনীতিতে নারীদের সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে সুপারিশসমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

মোঃ নাজিউদ্দিন, স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ আইন ও বিধিমালা: গুরুত্বপূর্ণ পরিপত্রের সংকলন, ঢাকা: মাতৃভাষা প্রকাশ, ২০১২। বইটিতে ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু ধারণা দেয়া ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আইন, বিধিমালা ও পরিপত্র সংযোজন করা হয়েছে। তাছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের জন্য যে নানামুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে তা এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্য নির্দেশিকাঃ

১। সৈয়দা রওশন কাদির, পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনে মহিলা কমিশনারদের ভূমিকা, ক্ষমতায়ন, উইমেন ফর উইমেন, সংখ্যা-১, ডিসেম্বর-১৯৯৬।

২। জালাল ফিরোজ, বাংলাদেশের সংসদে নারীঃ সাফল্য ব্যর্থতা, সংরক্ষণ বিতর্ক এবং ভবিষ্যত, ক্ষমতায়ন, উইমেন ফর উইমেন- ২০০৩, সংখ্যা-৫, পৃষ্ঠা-৩।

৩। সৈয়দা রওশন কাদির, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের ভূমিকা ও কার্যাবলী, উইমেন ফর উইমেন, প্রথম প্রকাশ-জুলাই, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৯।

৪। বুলেটিন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) বেজিং প্লাস ফাইভ; সেপ্টেম্বর-২০০০, পৃষ্ঠা-৫।

৫। নারীর ক্ষমতায়ন, বাংলাদেশ এবং একটি সমীক্ষা, সৈয়দা সুলতানা পারভীন, ঢা.বি. পত্রিকা, সংখ্যা-৭৬, আষাঢ়, ১৪১০, জুন-২০০৩।

৬। নাজমা চৌধুরী, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ: প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য (সম্পাদিত), নারী ও রাজনীতি, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-২১।

৭। মালেকা বেগম, সংরক্ষিত মহিলা আসন, সরাসরি নির্বাচন, অন্যপ্রকাশ-২০০০, পৃষ্ঠা-২৬।

৮। মালেকা বেগম, সংরক্ষিত মহিলা আসন, সরাসরি নির্বাচন, প্রথম প্রকাশ-২০০০, পৃষ্ঠা-১৮, ক্ষমতায়ন।

৯। আবেদা সুলতানা, ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষনের ভূমিকা একটি বিশ্লেষণ, লোক প্রশাসন সাময়িকী, সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০০০, পৌষ, ১৪০৭, পৃষ্ঠা-৪।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাত্ত্বিক কাঠামো ও ধারণাগত দিক

২.১ ভূমিকা

২.২ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারঃ

২.৩ স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারঃ

২.৪ তাত্ত্বিক ধারণাঃ

১. উন্নয়নে নারী

২. নারী ও উন্নয়ন

৩. জেন্ডার ও উন্নয়ন

২.৫ আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সনদে নারীর উন্নয়নঃ

২.১ ভূমিকাঃ

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীকে সম্পৃক্ত করতে হলে ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার সর্বস্তরে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। তাত্ত্বিক কাঠামোর যথার্থতা নিরূপনের জন্য এই অধ্যায়ে গবেষণা কর্মটিতে ব্যবহৃত প্রত্যয়গুলোর বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। শক্তিশালী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকাকে তাত্ত্বিক ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বশেষে এই গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল সংক্ষেপে তুলে ধরে এর সাথে গবেষণায় ব্যবহৃত অনুমানের সত্যাসত্য যাচাই এবং তাত্ত্বিক কাঠামোর যথার্থতা নিরূপণ করা হয়েছে।

২.২ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারঃ

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার বলতে বোঝায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে এলাকার জনসাধারণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা। স্থানীয় সরকার পরিচালিত হয় সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা। কিন্তু জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাদের সকল প্রকার কার্যক্রমের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। এক কথায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার হল জনসাধারণের প্রতিনিধিদের শাসন। তবে স্থানীয় সরকার কোন সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান নয়, বিভিন্ন সময় আইন ও বিধিবিধানের মাধ্যমে জাতীয় সরকার স্থানীয় সরকারের কার্যপরিধি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার নিজস্ব এলাকায় কর, রেট ফি, টোল ইত্যাদি নির্ধারণ ও আদায় করে থাকে।

২.৩ স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারঃ

বাংলাদেশে বর্তমানে দু'ধরণের স্থানীয় সরকার বিদ্যমান। স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার। স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও এ দুইয়ের মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট পার্থক্য।

স্থানীয় সরকার (Local Government) হচ্ছে রাষ্ট্রের এলাকাকে বিভক্ত করে ক্ষুদ্রতর পরিসরে প্রতিষ্ঠিত সরকার ব্যবস্থা। আমাদের দেশের বিভাগ এবং জেলা হল স্থানীয় সরকার। কোন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিক সরকারও স্থানীয় সরকারের পর্যায়ভুক্ত। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার (Local Self-Government) বলতে বুঝায় এমন এক ধরণের সরকার ব্যবস্থা যা ছোট ছোট এলাকার স্থানীয় প্রয়োজন মেটাবার জন্য প্রতিষ্ঠিত ও আইনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা। আমাদের দেশে ইউনিয়ন পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান।[১] জাতিসংঘের ঘোষণা অনুসারে, "স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার বলতে জাতীয় অথবা প্রাদেশিক সরকারের রাজনৈতিক বিভাগ বা উপবিভাগকে বুঝায়", যেগুলি আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট, যা স্থানীয় ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ বিস্তার এবং প্রয়োজনবোধে করারোপ করতে পারে। এ সরকার নির্বাচিত অথবা স্থানীয়ভাবে মনোনীতও হতে পারে। [২]

ইণ্ডিয়ান স্টেটুটরি কমিশনের মতে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার হচ্ছে একটি স্থানীয় প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা, যা স্থানীয় নির্বাচকদের নিকট দায়ী, যে শাসনব্যবস্থা পরিচলনায় আইন প্রণয়ন, বিচার শাসন এমনকি নিজস্ব তহবিল সৃষ্টির মাধ্যমে এলাকার জনগণের উপর করারোপ করতে পারে এবং দায়িত্ব পালন ও সরকারের সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে একটি প্রশিক্ষণাগার হিসেবে কাজ করে।[৩] গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সফল বাস্তবায়নের জন্য সুগঠিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকে কেন্দ্র করেই গণতন্ত্রের জয়যাত্রা শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারই হল যে কোন প্রকার গণতন্ত্রের মূলভিত্তি। গণতন্ত্রকে নিচ থেকে ভাল করে গড়ে তুলতে না পারলে কার্যকারিতা লাভ করতে পারবে না।[৪]

নিম্নে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের মধ্যকার পার্থক্যগুলি আলোচনা করা হলঃ

প্রথমতঃ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ক্ষুদ্র এলাকার স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য গড়ে উঠেছে। নিজস্ব গণ্ডিতে নীতি নির্ধারণ ও নীতি বাস্তবায়নের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছে। রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম যে কোন এলাকার সরকারি নীতি কার্যকর করার জন্য কর্তৃত্ব সম্পন্ন যে কোন সংগঠনকে স্থানীয় সরকার বলে। **দ্বিতীয়তঃ** স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। তার কোন স্বাধীন অস্তিত্ব ও নিজস্ব কোন কর্তৃত্ব নেই। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের স্বাধীন সত্তা রয়েছে আর নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে রয়েছে স্বাধীন ভাবে নীতি

নির্ধারণের কর্তৃত্ব। **তৃতীয়তঃ** ক্ষমতা বিভাজনের ফলে জন্মলাভ করে স্থানীয় সরকার। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার জন্মলাভ করে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে। **চতুর্থতঃ** স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা নিয়োগ লাভ করেন কেন্দ্রীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সংস্থা কর্তৃক, কিন্তু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারে কর্মকর্তাদের নিয়োগ হয় স্থানীয় পর্যায়ে। **পঞ্চমতঃ** স্থানীয় সরকারের লক্ষ্য সুশাসন, কিন্তু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের মূল **লক্ষ্য** হচ্ছে স্ব-শাসন।

স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য আধুনিক কালে কমে এসেছে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হবার ফলে স্থানীয় সরকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের পর্যায়ভুক্ত হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ, জেলা পর্যায়ের উন্নয়নমূলক কর্ম তদারকির জন্য জনপ্রতিনিধিদের বিভিন্ন কমিটি ও সংস্থা স্থানীয় সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে। অন্যদিকে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের উপর ন্যাস্ত হচ্ছে কর আদায়, পারিবার পরিকল্পনা প্রমুখ সরকারের বিভিন্ন দায়িত্ব। তাই বর্তমানে স্থানীয় সরকার রূপান্তরিত হচ্ছে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারে আর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার লাভ করছে স্থানীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে ক্ষমতার উত্তরোত্তর বিভাজনের ফলে ও প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ফলে তা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারে রূপ লাভ করছে। তাই উভয়ই বর্তমানে স্থানীয় সরকার নামে পরিচিত হচ্ছে।[৫]

স্থানীয় সরকারের পর্যালোচনায় দেখা যায়, কেন্দ্রীয় সরকারের একার পক্ষে দেশের যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের ভার লাঘব করার জন্য এবং স্থানীয় এলাকার জনগণকে তাদের প্রাপ্য অধিকার, ক্ষমতা, সম্পদ, সেবা ইত্যাদি বিষয়গুলো সহজে ভোগ করার লক্ষে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের সৃষ্টি। এই অর্থে শক্তিশালী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অর্থ হলো প্রয়োজনীয় সম্পদ, অর্থ ও জনবল সম্বলিত

দায়িত্বপ্রাপ্ত সত্যিকারের স্থানীয় গণতান্ত্রিক শাসন। এই স্থানীয় গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়ায় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকা পালন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ ১৮৭০ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত এর গঠন কাঠামোয় নানান পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু কখনই নারী প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় সরকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ১৯৯৭ সালে প্রথম নারীরা প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে ইউনিয়ন পরিষদে জনপ্রতিনিধিত্বের ব্যাপক দায়িত্ব লাভ করে। সে সময় নারীরা অনেক উৎসাহভরে এই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছিলেন। অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে সেই পরিস্থিতির অবসানের লক্ষে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার হিসেবে দরকার ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী

করা। স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করতে স্থানীয় সরকারের মূলশক্তি কেন্দ্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে নীতি, কৌশল ও লক্ষ নির্ধারণ করতে হবে।

শক্তিশালী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের অর্থ হলো প্রয়োজনীয় সম্পদ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সত্যিকারের অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার যার মাধ্যমে জনগণ সরাসরি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হলে চারটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার। যেমন ঃ functions (দায়-দায়িত্ব), finances (সম্পদ), freedom (স্বাধীনতা) এবং functionaries (জনবল)। অর্থাৎ শক্তিশালী ও কার্যকর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে এ সকল প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ দায়-দায়িত্ব, প্রয়োজনীয় সম্পদ, স্বায়ত্তশাসন ও আবশ্যকীয় কর্মকর্তা কর্মচারী প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যথাযথ দায়-দায়িত্ব না থাকলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা স্থানীয় সমস্যা সমাধানে অপারগ হবে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় সম্পদ না থাকলে এগুলোর পক্ষে কোনরূপ কার্যকারিতা প্রদর্শন সম্ভব নয়। কার্যকারিতা প্রদর্শনের জন্য আরো প্রয়োজন এগুলোর স্বায়ত্বশাসন। একই সাথে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজন জনবল বা কর্মকর্তা-কর্মচারী। প্রয়োজনীয় এ চারটি F এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে দায়-দায়িত্ব প্রদান করতে হবে আইন ও বিধি-বিধান এবং প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে।[৬]

কার্যকর ও শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থাকে। বৈশিষ্ট্যগুলো হলঃ

- এসব প্রতিষ্ঠান শুধু স্থানীয় সরকারের জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কর্তৃত্বে পরিচালিত হতে হবে;
- এগুলোতে জনগণের কার্যকর অংশগহণ থাকতে হবে;
- এসব প্রতিষ্ঠানে নারীসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তকরণের বিধান থাকতে হবে;
- এগুলোকে স্বায়ত্তশাসিত বা 'সেলফ গভর্ণিং' হতে হবে;
- এগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা, দায়-দায়িত্ব ও সম্পদ দিতে হবে;
- প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে এগুলোকে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ হতে হবে;
- প্রত্যেকটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে পরস্পরের নিয়ন্ত্রণমুক্ত ও স্বাধীন হতে হবে;

- এগুলোতে একক কর্তৃত্বের পরিবর্তে পরিষদের সদস্যদের যৌথ নেতৃত্বের সুযোগ থাকতে হবে ইত্যাদি।[৭]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে দেশে দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষে বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহ বাস্তবায়িত হতে থাকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আধুনিকায়ন তত্ত্ব (Modernisation Theory), মৌলিক চাহিদা তত্ত্ব (Basic Needs Theory), কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস কর্মসূচী (Structural Adjustment Policy), বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organisation- WTO), ইত্যাদি।

উল্লিখিত এসব নীতিমালার সীমবদ্ধতা হচ্ছে এসব উন্নয়ন নীতিমালায় নারীর অদৃশ্যমানতা। ৮০-দশকের আগে পর্যন্ত দাতাগোষ্ঠী ও সরকারসমূহ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে দারিদ্র্য চক্রকে মোকাবেলা করার মূল শক্তিস্বরূপ নারীর পুরোপুরি জড়িত না হওয়ার দরূন সাহায্যকৃত অর্থের প্রায় পুরোটাই অপচয় হচ্ছে।

২.৪ তাত্ত্বিক ধারণাঃ

বিংশ শতাব্দির শেষের দিকে "নারী উন্নয়ন" বা "উন্নয়নে নারী" ধারণাগুলো বিকাশ লাভ করে। নারী নির্যাতন ও নারীর বৈষম্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে এই ধারণাগুলো বিশ্বের নারীবাদিরা সৃষ্টি করেন। নারী উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনেক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উন্নয়নের সাথে নারীকে সম্পৃক্তকরণের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই বিশ্বব্যপী তিনটি পৃথক তাত্ত্বিক ধারার মাধ্যমে নারীকে উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল।

তত্ত্বগুলো হলঃ

১. উন্নয়নে নারী (Women in Development or WID).

২. নারী ও উন্নয়ন (Women and Development or WAD).

৩. জেন্ডার ও উন্নয়ন (Gender and Development, (GAD).

১. উন্নয়নে নারীঃ (WID)

৭০-এর দশকে আধুনিকায়ন তত্ত্বের সমালোচনার ধারায় উন্নয়নে নারী বা উইড (Women in Development -সংক্ষেপে WID) নীতিমালার উদ্ভব। এটি একটি অতি পুরানো ও জনপ্রিয় পদ্ধতি। আমেরিকার উদারনৈতিক নারীবাদিরা ও নারীর মর্যাদা বিষয়ক জাতিসংঘ কমিশন (The UN Commission on the Status of Women) এ পদ্ধতির উদ্ভাবক। প্রায় একই সময়ে ইস্টার বোসেরাপের (Ester Boserup) সাড়া জাগানো গ্রন্থ "অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকা" (Women's Role in Economic Development) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি প্রকাশের মধ্যদিয়ে এ পদ্ধতির তাত্ত্বিক ভিত্তি রচিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি প্রথম বারের মত কৃষি অর্থনীতিতে লিঙ্গ ভিত্তিক শ্রম বিভাগের বিষয়টি তুলে ধরেন এবং সমাজের আধুনিকীকরণের সঙ্গে প্রচলিত কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলি বিশ্লেষণ করেন। তিনি নারী ও পুরুষের কাজের উপর পরীক্ষা করে তথ্যসহ প্রমাণ করেন যে, ৬০-৭০ এর দশকের উন্নয়নের সুফল পুরুষের তুলনায় নারীর কাছে অনেক কম পৌঁছেছে। কারণ, দেখা গেছে আধুনিকীকরণের সুফল সমানভাবে বণ্টিত হয়ে আদৌ নারীর কাছে পৌঁছেনি, পুরুষ এবং নারী ভিন্ন ভিন্নভাবে উন্নয়নের অভিজ্ঞতা ও সুফল লাভ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান নিম্নগামী হয়েছে। নারীরা কেবল তাদের প্রজননমূলক ভূমিকায় আবদ্ধ এই প্রচলিত ধারণার বদলে নারীদের উৎপাদনশীলতার উপর তিনি দৃষ্টিপাত করেন এবং কৃষিতে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের উপর জোর দেন।

১৯৫০ থেকে ১৯৭০ এর দশকের আধুনিকীকরণ তত্ত্বে মনে করা হয়েছিল যে, জাতীয় উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির সুফল আপনা আপনিই চুঁইয়ে পড়ে নারীদের কাছে পৌঁছাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল আধুনিকীরণের সুফল নারীরা পায়না বরং যে কোন ভাবেই হোক তারা বঞ্চিত হয়।

আধুনিকীকরণ তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে উন্নয়নে নারী (WID) নামক নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণীত হয়, যেখানে ধরে নেওয়া হয় যে, নারীরা সম্পদ, দক্ষতা ও সুযোগের অভাবের দরূণ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত নয় এবং তাই তাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতে হবে। ধারণা করা হয় যে, নারীরা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অংশীদার হলে বিদ্যমান অসম বা বৈষম্যমূলক জেণ্ডার সম্পর্ক আপনাআপনি পরিবর্তিত হবে। উন্নয়নে নারী নীতিমালা তাই প্রয়োজনীয় আইনগত এবং প্রশাসনিক পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পর্কিত করার উপর জোর দেয়। নারীর উৎপাদন (Productive) ক্ষমতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে

এবং উৎপাদনশীল খাতে নারীর পশ্চাৎপদতা কাটানোর লক্ষ্যে কৌশল উদ্ভাবনের কথা বলে। WID পদ্ধতি মনে করে যে, সমাজে নারীদের উৎপাদনী ভূমিকা রয়েছে এবং তারা উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। এই উন্নয়নে নারী নীতিমালাটি পরবর্তীতে মার্কিন নারী উন্নয়নবিদরা গ্রহণ করায় সমগ্র উন্নয়নশীল বিশ্বে এই নীতিমালার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। প্রকৃত পক্ষে এই পদ্ধতিই প্রথম উন্নয়নে নারীর ভূমিকাকে সুস্পষ্ট করে তোলে।

নারী এবং উন্নয়নঃ (WAD)

১৯৭০ এর দশকের মাঝামাঝি আধুনিকীকরণ তত্ত্ব ও উন্নয়নে নারী নীতিমালার সমালোচনার পটভূমিতে নারী এবং উন্নয়ন বা Women and Development সংক্ষেপে-WAD পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। নির্ভরশীলতা তত্ত্ব (Dependency Theory) এই নারী এবং উন্নয়ন নীতির ভিত্তি। নারী এবং উন্নয়ন নীতি মনে করে যে, নারী সব সময় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশ। কাজেই তাদেরকে আর নতুন করে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন নেই। বরং এর চেয়ে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেটিই হল উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে নারীর প্রাপ্তি কতটুকু। নারী সব সময়ই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার নিজস্ব ভূমিকা পালন করে থাকে। তা সত্ত্বেও নারী উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে তার ন্যায্য প্রাপ্তিটুকু কখনই পায়না। নারী এবং উন্নয়ন তাত্ত্বিকদের মতে, এর মূল কারণ অসম বিশ্ব অর্থব্যবস্থার উদ্ভব এবং এতে সমতা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে নারীর অবস্থার উন্নতি ঘটবে বলে এই তাত্ত্বিকরা অভিমত ব্যক্ত করেন।

নারী এবং উন্নয়ন নীতি বিভিন্ন ধরণের সমাজ ব্যবস্থায় পিতৃতান্ত্রিকতা এবং নারীর অধীনতার মধ্যকার সম্পর্ককে গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যকার বিদ্যমান জেণ্ডার সম্পর্ককে এখানে উপেক্ষা করা হয়। পিতৃতান্ত্রিক আদর্শ ও সমাজ কাঠামোর বদলে নারীর হীন অবস্থানকে দেখা হয় আন্তর্জাতিক ও শ্রেণী বৈষম্যের কাঠামোর অংশরূপে। নারী এবং উন্নয়ন নীতির জেণ্ডার ভূমিকা সমূহের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলে না।

জেণ্ডার এবং উন্নয়নঃ (GAD)

১৯৮০ এর দশকে উন্নয়নে নারী, নারী এবং উন্নয়ন নীতিমালার সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে জেণ্ডার এবং উন্নয়ন বা Gender And Development- সংক্ষেপে- GAD নামক নারী উন্নয়ন তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। এই

পদ্ধতির প্রবক্তারা সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এবং সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ ছিল এর মূল ভিত্তি। এই পদ্ধতি নারীর চেয়ে জেণ্ডারের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। এই পদ্ধতি আরো মনে করে, নারীরা যেহেতু পুরুষের অধস্তন কাজেই নারীদের প্রকৃত সমস্যা অনুসন্ধান করতে হলে তা নারী পুরুষ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই করতে হবে। এই পদ্ধতি নারী মুক্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে রাষ্ট্রের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। কেননা, নারীরা এখানে রাজনৈতিক শক্তির দিক থেকে খুব দুর্বল এবং জাতীয়, আঞ্চলিক এমনকি স্থানীয় পর্যায়ে তাদের দরকষাকষি করার ক্ষমতা সীমিত। উন্নয়ন কর্মকৌশল অবশ্যই যেন নারীর অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে ছাড়িয়ে নারী রাজনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা পর্যন্ত প্রসারিত হয়, সে দিকে মনোযোগ দাবি করে জেণ্ডার এবং উন্নয়ন তত্ত্ব বা GAD। এই নীতিমালা কেবল নারীর উপরই নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যকার সামাজিক সম্পর্কের উপরও আলোকপাত করে। জেণ্ডার এবং উন্নয়ন পদ্ধতি তাই 'নারী' শব্দটির পরিবর্তে "জেণ্ডার" বা "জেণ্ডার সম্পর্ক" শব্দটি ব্যবহার করে।

নারী উন্নয়নে সাহায্য সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ভূমিকা পালনের উপর এই নীতিমালা জোর দিয়ে থাকে। নারীরা যেহেতু স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রায়শই পারিবারিক স্তরেই প্রথম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় সে জন্য জেণ্ডার এবং উন্নয়ন পদ্ধতি নারীর মুক্তির প্রশ্নে পরিবার ও এলাকার কাছ থেকেই প্রথম সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে।

জেণ্ডার এবং উন্নয়ন পদ্ধতির চূড়ান্ত লক্ষ নারীর ক্ষমতায়ন। তাদের এমন স্তরে উন্নীত করা যেখান থেকে তারা নিজেদের অধিকার, পছন্দ, অগ্রাধিকারের জন্য লড়াই করতে সক্ষম। এই পদ্ধতি এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলে যেখানে ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী বা লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলেই সমতার ভিত্তিতে বিবেচিত। তাছাড়া, এমন একটি সমাজ গড়ে উঠবে যেখানে নারী ও পুরুষ সমতার ভিত্তিতে কাজ করবে। একজনের কাজকে অন্যজনের কাজের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হবে এবং যেখানে শ্রম বিভাগ লিঙ্গীয় ভিত্তিতে নয়, সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে।

উন্নয়নে নারী সমাজের ভূমিকার স্বীকৃতি এবং দরিদ্র নারীদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের নারী উন্নয়ন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে। পদ্ধতিগুলো হলঃ

১. কল্যাণমূলক পদ্ধতি (Welfare Approach),

২. সমদর্শী বা ন্যায়ভিত্তিক পদ্ধতি (Equity Approach),

৩. দারিদ্র্য বিমোচন পদ্ধতি(Poverty alleviation Approach),

৪. দক্ষতা পদ্ধতি (Efficiency Approach),

৫. ক্ষমতায়ন পদ্ধতি (Empowerment Approach),

১. কল্যাণমূলক পদ্ধতিঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ৫০ ও ৬০ এর দশকে সমাজে নির্ভরশীল গ্রুপকে সাহায্য করার জন্য নারীর উন্নয়নের সবচেয়ে পুরাতন ও জনপ্রিয় পদ্ধতি হচ্ছে কল্যাণমূলক পদ্ধতি। একজন উত্তম মা হিসেবে নারীকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্তকরণই এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য। ধারণা করা হয় যে, মা হিসেবে ভূমিকা পালন করাটাই হল নারীর গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং সন্তান লালন পালন করার মাধ্যমেই নারীরা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর অবদান রাখতে পারে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে নারীদের কাছে পৌঁছানো সহজ হলেও তা নারীদের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের পরিবর্তে আরো পরনির্ভরশীল করে তোলে।

২. সমদর্শী বা ন্যায়ভিত্তিক পদ্ধতিঃ

আধুনিকীকরণ তত্ত্বের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘ নারী দশকে (১৯৭৬-৮৫) সমদর্শী বা ন্যায়ভিত্তিক পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। এই পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর জন্য সমদর্শিতা অর্জন। পুরুষের মত নারীদেরও জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার রয়েছে এবং সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে নারীদের জন্য পরিবেশ তৈরি ও সাহায্য করতে হবে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের উভয় ক্ষেত্রেই নারী পুরুষের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্যের উপর এই পদ্ধতি বেশি গুরুত্ব দেয়।

৩.দারিদ্র্য বিমোচন পদ্ধতিঃ

দারিদ্র্য বিমোচন পদ্ধতি ন্যায়ভিত্তিক পদ্ধতির খুব কাছাকাছি। এর মূল উদ্দেশ্য হল দরিদ্র নারীদের উৎপদনশীলতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা। নারীকে এখানে দেখা হয় অনুন্নয়নের একটি সমস্যারূপে কিন্তু অধস্থন হিসেবে

দেখা হয় না। নারীর হীন অবস্থান নয়, দারিদ্র্যই হচ্ছে নারী পুরুষের মধ্যকার অসমতার মূল কারণ। এই পদ্ধতি অনুযায়ী নারীরা হল দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম (Poorest of the poor) তাই দরিদ্র নারীদের পরিবারের চাহিদা পূরণের জন্য সাহায্য প্রয়োজন।

৪. দক্ষতা পদ্ধতিঃ

৮০ এর দশকে দক্ষতা পদ্ধতির উদ্ভব ঘটলেও এখনও খুবই জনপ্রিয় এই পদ্ধতিটি। দক্ষতা পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হল নারীর অর্থনৈতিক অবদানের মাধ্যমে উন্নয়নকে যেন আরো দক্ষ ও কার্যকর করে তোলা যায়, তা নিশ্চিত করা এবং নারীকে উন্নয়নের প্রান্ত থেকে উদ্ধার করে মূলধারায় নিয়ে আসা। নারীদেরই কেবল উন্নয়ন প্রয়োজন তা নয়, বরং উন্নয়নেরই এখন দরকার নারীদের।

৫. ক্ষমতায়ন পদ্ধতিঃ

১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে তৃতীয় বিশ্বের তৃণমূল সংগঠনের অভিজ্ঞতা থেকে এই পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে। ক্ষমতায়ন সবচেয়ে সাম্প্রতিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে মূলতঃ নিজেদের জীবনের উপর নারীদের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির উপর আলোকপাত করে। এর লক্ষ্য ব্যাপক আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন। নারীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা যাতে তাঁরা সমাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। গুরুত্বপূর্ণ বস্তুগত ও অ-বস্তুগত সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দিক নির্দেশনাকে প্রভাবিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। নারীরা নিজেরাই নিজেদের উন্নয়নের চালিকা শক্তি হবে। পুরুষের সাহায্য সহযোগিতা এখানে কাম্য নয়। আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের মাধ্যমে উৎপাদিত সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এই পদ্ধতির মূল কথা।

বিগত চল্লিশ বছরে অনেক ক্ষেত্রেই নারীর অগ্রগতি ঘটেছে। শিক্ষার হার বৃদ্ধি, মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস। তারপরও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী নারী অধস্তন। পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতায়নে নারী পিছিয়ে আছে। নারীবাদী বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্যে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি জড়িত।

২.৫ আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সনদে নারীর উন্নয়নঃ

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে নারী সমাজের উন্নয়নের জন্য বহুমুখী ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৭৫-৮৫ সালকে নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ৪টি বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে, ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে, ১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে এবং ১৯৯৫ সালে বেইজিং শহরে।

মেক্সিকো সম্মেলনঃ

১৯৭৫ সালে মেক্সিকো শহরে প্রথম নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নারী উন্নয়নের জন্য এই সম্মেলনে একটি বিশ্ব কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। মেক্সিকো সম্মেলনে গৃহীত পদক্ষেসমূহ নিম্নরূপঃ

- ১৯৭৫-৮৫ সময়কে আন্তর্জাতিক নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করা
- আন্তর্জাতিক নারী বর্ষের (১৯৭৫) লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ব কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করা
- নারী দশকের জন্য সেবামূলক তহবিল প্রতিষ্ঠা করা
- নারী প্রগতির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (INSTRAW) গঠন করা।[৯]

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ বা সিডো (CEDAW)ঃ

১৯৭৯ সালে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ বা সিডো (CEDAW) অনুমোদন করা হয়। রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে এই সনদ বা Convention of Elimination of All Forms of Discremination Against Women (CEDAW) গৃহীত হয়। ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ সালে তা কার্যকর করা হয়। নারীর জন্য আন্তর্জাতিক বিল অব রাইটস বলে চিহ্নিত এই দলিল নারী অধিকার সংরক্ষণের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত।

কোপেনহেগেন সম্মেলনঃ

১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নারী দশকের প্রথম পাঁচ বছরে ১৯৭৫-৮০ অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং আরো তিনটি লক্ষ্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১০]

কোপেনহেগেন সম্মেলনের মূল প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপঃ

- জাতিসংঘের নারী দশকের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে;
- পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্পে নারীর স্বার্থ নিশ্চিত করতে হবে;
- উন্নয়নে নারীকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথার্থ প্রশাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে;
- নারীর স্বার্থ রক্ষার জন্য দাতা এবং গ্রহীতা, দেশগুলো যাতে সতর্ক দৃষ্টি রাখে তা নিশ্চিত করতে হবে;
- জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে অর্থ সাহায্য বৃদ্ধি এবং অন্যান্য ইনপুট দিয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সমতা আনতে হবে;
- তথ্য, শিক্ষা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় উপায় যোগানের মাধ্যমে পারিবারিক আয়তন নির্ধারণ করার অধিকার দিতে হবে;
- নারীর বিরুদ্ধে সব ধরণের বৈষম্য দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।[১১]

নাইরোবি সম্মেলনঃ

১৯৮৫ সালের ১৫-২৬ জুলাই কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে তৃতীয় বিশ্বনারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে নারী সমাজের ভবিষ্যত অগ্রগতির লক্ষ্যে এ সম্মেলনে নিম্নোক্ত কর্মকৌশল গৃহীত হয়ঃ

নারী-পুরুষের সমতা

- নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরসন;

- আইনের সমান অধিকার;
- বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের সমান অধিকার;
- প্রতিটি দেশে সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অগ্রগতি নিরীক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য উচ্চ পর্যয়ে সরকারি কাঠামো গঠন করা।[১২]

চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্বে ১৯৯৪ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় নারী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে জাকার্তা ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই ঘোষণায় বলা হয় ক্ষমতা বণ্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মাঝে তীব্র অসমতা বিদ্যমান। এই অসমতা ও সীমাবদ্ধতা নিরসনের উদ্দেশ্যে সরকার সমূহকে উদ্যোগ নিতে তাগিদ দেয়া হয়।

বেইজিং সম্মেলনঃ

১৯৯৫ সালের ১৪-১৫ সেপ্টেম্বর চীনের রাজধানী বেইজিং-এ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনায় নারী-উন্নয়নের ১২ টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়।

ক্ষেত্রগুলো হলঃ

- নারীর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য
- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অসম সুযোগ;
- স্বাস্থ্য সেবার অসম সুযোগ;
- নারী নির্যাতন;
- সশস্ত্র সংঘর্ষের শিকার নারী;
- অর্থনৈতিক সম্পদে নারীর সীমিত অধিকার;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্ষমতায় অংশগ্রহণে অসমতা
- নারী উন্নয়নে অর্পযাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো;
- নারীর মানবাধিকার লংঘন;
- গণমাধ্যমে নারীর নেতিবাচক প্রতিফলন এবং অপ্রতুল অংশগ্রহণ;
- পরিবেশ সংরক্ষণে ও প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর সীমিত অধিকার; এবং

- মেয়ে শিশুর প্রতি বৈষম্য।

সকল আন্তর্জাতিক ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ।[১৩]

নারীর অধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সনদ এ স্বাক্ষর করলেই নারীর অধিকার নিশ্চিত হয়ে যাবে বিষয়টি এমন নয় কিন্তু এ ধরণের সনদ রাষ্ট্রপক্ষের ওপর এক ধরণের তাগিদ সৃষ্টি করে যা কিনা নারীর অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পক্ষকে জবাবদিহিতার মধ্য দিয়ে যেতে সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

তথ্য নির্দেশিকাঃ

১. এমাজউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন, অনন্যা প্রকাশ, ২০০০, পৃষ্ঠা-(৩৭৩-৩৭৪)।

২. Encyclopedia Britannica: Vol. No, 14. p. 179.

৩. Ali Ahmed, Administration of Local self-Government for Rural Areas in Bangladesh Dhaka, NILG, 1979, p.-2.

৪. Bhardwaj, R.K, Municipal Administration in India, (Jullander: Stering Publisher (P) Ltd, 1970), page 116.

৫. এমাজউদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৭৫।

৬. দৈনিক ইত্তেফাক, জানুয়ারি-২৪, ২০০৮, পৃষ্ঠা-৯।

৭. গণতান্তিক উত্তরণ, স্থানীয় শাসন ও দারিদ্র্য দূরিকরণ বদিউল আলম মজুমদার, আগামী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-(৩৬৭-৩৬৮)।

৮. উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট, ষষ্ঠ বর্ষ, বিংশ সংখ্যা, এপ্রিল- জুন ২০০০।

৯. ফারাহ দীবা চৌধুরী, "বিশ্ব নারী সম্মেলন ও বাংলাদেশের নারী", আল মাসুদ হাসানউজ্জামান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০২, পৃষ্ঠা-(২৬২-২৬৩)।

১০. সিরাজ উদদীন আহমেদ, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি মেক্সিকো থেকে বেইজিং, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃষ্ঠা-৯৩।

১১. ফারাহ দীবা চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৬৪।

১২. তাহমিনা আক্তার, মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১৫০।

১৩. সৈয়দা সুলতানা পারভীন, নারীর ক্ষমতায়ন, বাংলাদেশ এবং একটি সমীক্ষা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৭৬, জুন-২০০৩, পৃষ্ঠা-১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও নারী প্রতিনিধিত্ব

৩.১ ভূমিকাঃ

৩.২ ইউনিয়ন পরিষদের ক্রমবিকাঃ

ক) বৃটিশ আমল

খ) পাকিস্তান আমল

গ) বাংলাদেশ আমল

৩.৩ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামোর স্তরঃ

ক) জেলা পরিষদ

খ) উপজেলা পরিষদ

গ) ইউনিয়ন পরিষদ

ঘ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ

ঙ) সিটি কর্পোরেশন

চ) পৌর সভা

৩.৪ ইউনিয়ন পরিষদের গঠন ও কার্যাবলীঃ

২.১ ভূমিকাঃ

বাংলাদেশে আজকে আমরা যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার দেখতে পাই, তা একদিনে গড়ে ওঠে নি। এটি বিভিন্ন ক্রম-বিবর্তনের ফল। তাই এর পেছনে রয়েছে সুদূর প্রসারী ইতিহাস এবং বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে আজকের স্তরে এসে পৌঁছেছে।[১] আমাদের সংবিধানে স্থানীয় সরকারের কোন সংজ্ঞা নেই। তবে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিখ্যাত কুদরত-ই-ইলাহী পনির বনাম বাংলাদেশ [44DLR (AD) 1992] মামলার রায় অনুযায়ী স্থানীয় সরকারের লক্ষ্য হলো, স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যার সমাধান। "Local government is meant for management of local affairs by locally elected persons." অর্থ্যাৎ স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের সেলফ গভর্ণমেন্ট বা স্বশাসন প্রতিষ্ঠাই স্থানীয় সরকারের লক্ষ্য।[২] বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার স্থানীয় সরকার নামেই অধিক পরিচিত। আমাদের সংবিধানের ৯, ১১, ৫৯, ৬০ অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং অনুচ্ছেদ ৯ তে নারীদের বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের সুদীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য থাকলেও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ ও অবদান খুব বেশী দিনের নয়। জনগণের অর্ধেক অংশ নারী। তাই স্থানীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান গবেষণায় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার বলতে ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারকে বোঝানো হয়েছে। ১৯৯৭ সালে দেশে প্রথমবারের মত ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান চালু হওয়ায় তৃণমূলে হাজার হাজার নারী অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। এই অধ্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের ক্রমবিকাশের পাশাপাশি এর গঠন কাঠামো ও সদস্যদের কার্যপদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যম হিসেবে তৃণমূল পর্যায়ে যে ইউনিয়ন পরিষদকে বিবেচনা করা হয়েছে সেই ইউনিয়ন পরিষদ কতটুকু শক্তিশালী এবং পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় নারী সদস্যরা সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ইউনিয়ন পরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছেন সেই বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা হবে।

২.২ ইউনিয়ন পরিষদের ক্রমবিকাশঃ

বর্তমান কালের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার বৃটিশ মডেলে গড়ে উঠেছে, কারণ এদেশ প্রায় দুইশত বৎসর তাদের শাসনাধীন ছিল। অবশ্য ইংরেজগণ এদেশের শাসনভার গ্রহণের পুর্বেও স্বায়ত্তশাসনের অস্তিত্ব ছিল

না এমন নয়।[৩] ঐতিহাসিকদের মতে খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০-১০০ অব্দ (তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর) আগে 'সভা' বা 'মহাসভা' নামে পরিচিত গ্রাম পরিষদ নামক ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৪-১৮৩ অব্দে মৌর্য যুগে শক্তিশালী গ্রাম সরকার ছিল বলে জানা যায়। গুপ্ত শাসন আমলে (৩২০-৫৩৫) গ্রাম ও শহর উভয় ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের মাধ্যমে দেশ শাসন হতো। এ সময় বাংলার প্রশাসন বিভিন্ন স্তরে ও পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। মোঘল আমলে থানাকে মৌজায় এবং মৌজাকে মহল্লায় বিভক্ত করে যথাক্রমে চৌকিদার ও মুহুরি লক ও মল্লিকের দায়িত্ব ছিল পঞ্চায়েতের উপর। পরিষদ গ্রাম প্রধান নিযুক্ত করতেন।[৪] মধ্যযুগেও (১১০০-১৫০০ খ্রিঃ) গোটা মুসলিম শাসন আমলে নানা ধরণের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সুলতানী আমল ও পরবর্তী মোঘল আমলেও এক ধরণের সরকার ব্যবস্থা দেখা যায়। তখন নগর প্রাধান্য পাওয়ায় নগরেও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। উপমহাদেশে মোঘল শাসনের অবসান ও বৃটিশ শাসনের প্রবর্তনের ফলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ শাসকরাও ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা দখলের পর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দেশজ রূপটিকে আর গ্রহণ না করে তাদের নিজস্ব মডেল চাপিয়ে দেয়।[৫]

ক) বৃটিশ আমলঃ

আধুনিক ইউরোপীয় ধারণা অনুযায়ী লোকাল সেল্‌ফ গভর্ণমেন্ট বিষয়টি আমাদের চিন্তায় বিকশিত হয়েছে ইংরেজরা দেশ দখলের পরে।[৬]

১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে ক্ষমতা দখলের পর প্রথম একশত বছরে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেনি। তাদের মনোযোগ ছিল আর্থিক উন্নয়নের এবং খাজনা আদায়ের নামে লুটপাট আর নির্যাতনের কাজে। পরবর্তী একশত বছরে স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলোর কিছু কিছু সংস্কার সাধন করা হয়। বৃটিশরা এদেশে আসার পর ১৭৯৩ সালে শহর এলাকায় মিউনিসিপ্যালিটি এবং গ্রাম এলাকায় জমিদারী প্রথার সৃষ্টি হয়।[৭] লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে এদেশে চিরস্থায়ীভাবে একশ্রেণীর ভূস্বামী বা জমিদার সৃষ্টি করেন। এই জমিদারগণ জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন এবং স্থানীয় এলাকার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব এই জমিদার শ্রেণীর উপর অর্পিত হয়। কর আদায় করা ছাড়া এই জমিদার শ্রেণী এলাকার উন্নতি বিধানের জন্য বাস্তবে তেমন কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। মুঘল আমলের পতন ও বৃটিশ শাসনের শুরু এই অন্তবর্তীকালীন সময়ে নানা কারণে গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় দেশীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। তৎকালীন সময়ে দেশীয় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইন-

শৃংখলার ক্ষেত্রে নৈরাজ্য দেখা দেয়। বিশেষ করে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর সামাজিক বিশৃংখলা আরো বৃদ্ধি পায়।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর এদেশের অর্থনীতি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হলে ব্রিটিশ শাসকরা এদেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। প্রায় একশ বছর কোম্পানীর শাসনের পর ১৮৫৮ সালে বৃটিশ সরকার সরাসরি ক্ষমতা গ্রহণ করেন, ফলে কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটে। তখন থেকেই সরকার স্থানীয় এলাকার উন্নতি বিধানের জন্য কিছু কিছু নজর দিতে থাকেন।[৮]
১৮৭০ সালের পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার গ্রামাঞ্চলে কোন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গঠনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেননি। ১৮৭০ সালে সরকার গ্রাম চৌদিকারি আইন (The Bengal Village Chaukidari Act of 1870) প্রণয়ন করেন। এই আইনের ফলে ১০ বা ১২ বর্গমাইল ব্যাপী এলাকাকে ইউনিয়ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[৯]

১৮৭০ সালের এই আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এসব ইউনিয়নে ৫ সদস্য বিশিষ্ট পঞ্চায়েত কমিটি গঠন করা হয়। পঞ্চায়েতের প্রাথমিক কাজ ছিল 'চৌকিদার' নামে পাহারাদারদের নিয়োগ করা ও তাদের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করা। গ্রাম পর্যায়ে এই আইনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনিক সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ তৈরী হয়। কিন্তু জনসাধারণের জন্য কল্যাণকর তেমন কিছু করা সম্ভব হয়নি। সরকারের ধারণা ছিল এই ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণকে সরকারের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণ করানো সম্ভবপর হবে। চৌকিদারি পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দুটি প্রধান ত্রুটি ছিল। প্রথমত: এটা সম্পূর্ণভাবে একটি মনোনীত প্রতিষ্ঠান এবং যেসব সদস্যকে মনোনীত করা হতো সে সদস্যপদ গ্রহণে বাধ্য ছিল এবং সদস্যপদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তাকে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হতো। দ্বিতীয়ত: এ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করা এবং ব্রিটিশদের স্বার্থরক্ষা করা। এ কারণে জনকল্যাণ কার্যক্রম এ ব্যবস্থায় খুব একটা ছিল না।[১০]

১৮৮০ সনে "দুর্ভিক্ষ কমিশন" স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অভাব লক্ষ করে এবং দুঃস্থদের মধ্যে রিলিফ দেয়ার সুবিধার্থে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ১৮৮২ সনে লর্ড রিপন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের জন্য বিখ্যাত প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। এ প্রস্তাবে বলা হয় যে, গভর্ণর জেনারেল গ্রাম পর্যায়ে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী।[১১]

লর্ড রিপন ১৮৮২ সালের ১৮মে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের উপর ঐতিহাসিক রেজুলেশন বা প্রস্তাবনা ঘোষণা করেন। লর্ড রিপনের রেজুলেশনের উপর ভিত্তি করে ১৮৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে বাংলার বিধান সভায় একটি বিল উপস্থাপন করা হয়। তাঁর প্রস্তাবনার মধ্যে গ্রাম এলাকার জনসাধারণের কল্যাণের জন্য ইউনিয়ন কমিটি গঠনের সুপারিশ করেন। প্রস্তাবিত ইউনিয়ন কমিটির উপর প্রাইমারী স্কুল দেখাশুনা, স্থানীয় রাস্তা-ঘাট মেরামত, পুকুর খনন করা এবং এ ধরনের আরও জনহিতকর কার্যাবলী প্রদানের সুপারিশ করেন।[১২]

লর্ড রিপন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে জনসাধারণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। লর্ড রিপনই আমাদের দেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।[১৩] আজকে আমরা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের যে সুফল ভোগ করছি তা ১১০ বৎসর পূর্বে লর্ড রিপন প্রথমে সুপারিশ করেন এবং প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে রেজুলেশন গ্রহণের সময় তিনি যথার্থই বলেছিলেন, আমি এমন এক বৃক্ষ রোপন করছি যা ভবিষ্যতের মানুষকে আশ্রয় ও ফলদান করবে।[১৪]

১৮৮৫ সালে বৃটিশ শাসকরা বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন প্রবর্তন করেন। এই আইনে তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার পদ্ধতি চালু করা হয়। ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি, মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড, জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড। উর্ধ্বে নয়জন এবং কমপক্ষে ছয়জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করা হয় এর মধ্যে তিনজন ছিল সরকার কর্তৃক মনোনীত। মনোনয়ন প্রথা ১৯৪৬ সালে রহিত করা হয়।[১৫] ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। গ্রাম পর্যায়ে তা বিভিন্ন কারণে পরিপূর্ণ দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়। সরকারের আশানুযায়ী ফল লাভ না হওয়ায় এবং বিভিন্ন পর্যায়ের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিক কার্যক্ষম করার জন্য ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় গ্রাম স্বায়ত্তশাসন আইন প্রণীত হয়। এই আইনের দ্বারা দুই স্তর বিশিষ্ট গ্রাম স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। যথা ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ড। উক্ত আইনের দ্বারা ইউনিয়ন বোর্ডকে গ্রাম স্বায়ত্তশাসনের সর্বনিম্ন একক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সাধারণত ১০টি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠিত হয়। ইউনিয়নের গড় আয়তন ছিল ১০ থেকে ১৫ মাইলের মধ্যে এবং গড় জনসংখ্যা ছিল ১০,০০০ হাজার।[১৬] প্রতিটি ইউনিয়ন বোর্ড ৯ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। ৯ জনের মধ্যে ৬ জন হবেন নির্বাচিত ও ৩ জন হবেন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত। ৯ জনের মধ্য থেকে একজন প্রেসিডেন্ট ও একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতেন।[১৭]

লর্ড রিপন তার রেজুলেশনে স্থানীয় সরকারের প্রত্যেক স্তরে সদস্য নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তার প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে প্রণীত ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। পরবর্তীতে ১৯১৯ সালের এ্যাক্ট বলে প্রণীত ব্যবস্থায় এবং বিভিন্ন কমিটি বিশেষ করে লিভেঞ্জ কমিটির রিপোর্টেও স্থানীয় সরকারে নারীদের অংশগ্রহণের কোন সুযোগ রাখা হয়নি।[১৮]

নারীরা নিম্নবর্ণের মানুষের মতো রাজনৈতিক অধিকারহীন ছিলেন। ভারতীয় রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠনসমূহ স্থানীয় সরকার কাঠামোয় নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছেন কিন্তু নারীদের ভোটাধিকার প্রদান কিংবা স্থানীয় কাঠামোয় তাদের প্রতিনিধিত্ব রাখার কোন দাবি জানান নি। তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তীতে যখন স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সর্বপ্রথম ভারতীয় হিসেবে স্থানীয় সরকার বিষয়ক মন্ত্রী হলেন। তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হলেও নারীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে কিছু বলেন বলেছেন জানা যায় নি। ভারতীয়রা রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা চেয়েছেন। কিন্তু নারীদের বাদ রেখে, যা পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচায়ক।[১৯]

১৯১৯ সালের আইনের মাধ্যমে যে, ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয় তা অনেকাংশে জনকল্যাণকর ছিল। ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা টাউন হলে ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানদের একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনফারেন্সে ইউনিয়ন বোর্ডের সমস্যা এবং কিভাবে তা সমাধান করা যায় সে সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ১৯১৯ সালের আইনের পরিবর্তনের জন্য একটি বিল উত্থাপন করা হয় এবং ১৯৩৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী আইন সভায় ১৯৩৯ সালের আইনের সংশোধনী গৃহীত হয়। সে অনুসারে সর্বপ্রথম নির্বাচন ব্যবস্থাকে সহজ করার জন্য প্রতি ইউনিয়নকে ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। ১৯৩৫ সালে ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যকাল ৩ বৎসর থেকে ৪ বৎসর করা হয়।[২০]

স্থানীয় সরকারের ক্রমবিকাশের প্রেক্ষিতে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণের ও প্রতিনিধিত্ব করার কোন সুযোগ দেয় নি। গ্রাম পঞ্চায়েতের নিম্নবর্ণের পুরুষদের মতো নারীদেরও (যে কোন বর্ণের) অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়নি। কঠোর পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কারণে নারীরা রাজনীতিতে ছিলেন অস্পৃশ্যদের মতো।[২১]

খ) পাকিস্তান আমলঃ

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হলেও বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত আইন ও বিধি বিধান অনুসারে দেশের সকল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার পরিচালিত হতে থাকে।[২২]

১৯৫৭ সালে প্রাদেশিক সরকারের জারিকৃত এক অধ্যাদেশে ১৯১৯ সালের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন করা হয়। এতে সদস্য নির্বাচনে মনোনয়ন প্রথা বাতিল, ইউনিয়নের জনগণের ভোটে প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। তবে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হলো স্থানীয় সরকার সংস্থায় নারীদের ভোটদানের অধিকার প্রদান। সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রদান করায় মহিলারা ভোট প্রদান করতে সমর্থ হন।[২৩]

১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে জারিকৃত মৌলিক গণতন্ত্র আদেশের (The Basic Democracies Order 1959) বলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারগুলোকে নতুনভাবে সংগঠিত করার প্রচেষ্ঠা গৃহীত হয়। মৌলিক গণতন্ত্র পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকার শহর ও গ্রাম উভয় এলাকাতেই প্রবর্তিত ছিল। গ্রাম অঞ্চলের জন্য ৪ স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রবর্তন করা হয়। যথা ইউনিয়ন কাউন্সিল, থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল ও বিভাগীয় কাউন্সিল।[২৪] মৌলিক গণতন্ত্র আদেশে পূর্বের ইউনিয়ন বোর্ড ইউনিয়ন কাউন্সিল নামে পরিচিত হয়।

সারণি-৩.১

মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ অনুসারে পূর্ব পাকিস্তানের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

মৌলিক গণতন্ত্রের স্তর	সংখ্যা
গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার	
ইউনিয়ন কাউন্সিল	৪,০৩৬
থানা কাউন্সিল	৩৯৩
জেলা কাউন্সিল	১৭
বিভাগীয় কাউন্সিল	৪
শহর পর্যায়ে স্থানীয় সরকার	
ইউনিয়ন কমিটি	২১৬
টাউন কমিটি	৩৭
মিউনিসিপ্যাল কমিটি	২৯

সূত্রঃ কামাল সিদ্দিকী, বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার, এনআইএলজি, পৃষ্ঠা-৩৪ ।

১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র আদেশের অধীনে গঠিত ইউনিয়ন কাউন্সিলের গঠন, কার্যাবলী ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বেশ পরিবর্তন ঘটে। গড়ে ১০,০০০ (দশ হাজার) লোকের বসবাসকারী এলাকা নিয়ে ১০ থেকে ১৫ জন সদস্য সমন্বয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠন করা হয়। মোট সদস্য সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতেন এবং মহকুমা প্রশাসক সরকারের পক্ষ হতে অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ সদস্য মনোনয়ন দান করতেন। ১৯৬২ সালে শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের ফলে মনোনয়ন প্রথা রহিত করা হয়। সদস্যগণ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন করতেন। কিন্তু ১৯৬৩ সালে ভাইস চেয়ারম্যানের পদটি বিলুপ্ত করা হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিলের কার্যকাল ছিল ৫ বছর। এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা ছাড়াও এগুলোকে ৩৭টি কার্যাবলী পালনের দায়িত্ব দেয়া হয়। তন্মধ্যে কৃষি উন্নয়ন, পানি সরবরাহ, শিক্ষা, যোগাযোগ, সমাজকল্যাণ প্রভৃতি কার্যাবলী উল্লেখযোগ্য।[২৫]

মৌলিক গণতন্ত্রের কতকগুলো প্রশংসনীয় দিক থাকলেও তা অচিরে স্বার্থান্বেষী মহলের রাজনৈতিক হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয় ও কায়েমী স্বার্থের ধারক ও বাহক এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এ ব্যবস্থা স্বায়ত্তশাসিত ব্যবস্থা হিসেবে কার্যকর হয়নি। প্রেসিডেন্ট, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচনের জন্য তা নির্বাচক মন্ডলী বা নির্বাচনী সংস্থায় (Electroral College) রূপান্তরিত হয়। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা এমনভাবে সংগঠিত হয় যে, তার সর্বস্তরে সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে কালক্রমে তা দুর্নীতি ও অরাজকতার কেন্দ্ররূপে দেখা দেয়।[২৬] আর্থিক দূর্বলতা ও দুর্নীতি সরকারি কর্মকর্তাদের আধিপত্য এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলো বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। ফলে এগুলো ঠিকমত দায়িত্ব পালনে অধিকাংশ সময় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানে এ ব্যবস্থা পর্যূদস্ত হয়ে পড়ে।

নারীদের ভোটাধিকার প্রদান পিতৃতন্ত্রের নমনীয়তার পরিচায়ক নয়। মুসলিম লীগ একদিকে নিজেদের ভোট বাড়ানোর জন্য যেমন নারীদের ভোটাধিকার প্রয়োগের লক্ষ্যে গেছে আবার অন্যদিকে নারীর অবরোধকে যুক্তিযুক্ত করতে চেষ্টা করেছে।[২৭] পাকিস্তান শাসনামলে স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় নারীদের জন্য কোন আসন সংরক্ষিত ছিল না বিধায় রাজনীতিতে তাদের অংশগ্রহণ বা প্রতিনিধিত্ব করার কোন সুযোগ সৃষ্টি হয়নি।

খ) বাংলাদেশ আমল ঃ

১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭ দ্বারা ইউনিয়ন কাউন্সিল ভেঙ্গে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত গঠন করা হয়।[২৮] ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ইউনিয়ন পঞ্চায়েত। ইউনিয়ন পঞ্চায়েত ছিল একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুর্নগঠন এবং ভারত থেকে ফিরে আসা শরণার্থীদের মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে ত্রাণ বিতরণের জন্য পঞ্চায়েতের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। এটা ছিল স্থানীয় সরকার পরিচালনার জন্য তাৎক্ষনিকভাবে গঠিত সম্পূর্ণরূপে একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা। এই আইনে মহকুমা প্রশাসককে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১ জন চেয়ারম্যান ও কয়েকজন সদস্য মনোনীত হতেন।
রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও আইন পরিষদের সদস্যদের সাথে আলোচনা করে মহকুমা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত সদস্যদের মধ্য থেকে পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হতেন।

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকরী হওয়া নতুন সংবিধানে স্থানীয় সরকারের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৭৩ সালের জুন মাসে জাতীয় সংসদ কর্তৃক বিধি প্রণীত হয়। উক্ত আইন বলে ইউনিয়ন

পঞ্চায়েতের নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন পরিষদ রাখা হয়। ইউনিয়নকে তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত এবং প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য তিনজন সদস্য ছিলেন। পরিষদের একজন চেয়ারম্যান এবং একজন ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। সকলেই সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হতেন। পরিষদের কার্যকাল ছিল ৫ বৎসর।[২৯] বাংলাদেশের সংবিধানের ১০নং অনুচ্ছেদে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিধান থাকলেও এই পর্যায়ে নারীদের জন্য কোন সংরক্ষিত আসন বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। এ অধ্যাদেশে প্রতি ইউনিয়ন পরিষদে দু'জন নারী প্রতিনিধিকে মনোনীত করা হয়। ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে মনোনীত নারী প্রতিনিধির সংখ্যা ৩ জন করা হয় ।[৩০]

১৯৭৬ সালের ২০ নভেম্বর এই আদেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের গঠনে বেশ পরিবর্তন ঘটে। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন অধ্যাদেশ জারি করা হয়। তিন স্তর বিশিষ্ট এই স্থানীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ একক হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল ছিল ৫ বছর। ১৯৭৬ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদসমূহে ১৯৭৭ সালের ১৩ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এই আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ছিল নিম্নরূপঃ

- প্রতি ইউনিয়নকে ৩টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে প্রতি ওয়ার্ডে ৩ জন সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।
- ১ জন চেয়ারম্যান ও ৯ জন সদস্যের ক্ষেত্রে সরাসরি ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।
- প্রতি ইউনিয়ন পরিষদে ২ জন মনোনীত নারী সদস্য মনোনয়নের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। মহকুমা প্রশাসক তাদের মনোনয়ন দিতেন।
- ইউনিয়ন পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদটি বিলুপ্ত করা হয়।
- ইউনিয়ন পরিষদকে সুষ্ঠুভাবে কাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কমিটি ও সাব কমিটি গঠন করার সুযোগ দেয়া হয়।
- ১৯৭৬ সালে গ্রাম আদালত আইন (Village Courts Ordinance, 1976) জারি করা হয় এবং ইউনিয়ন পরিষদকে গ্রাম আদালতের দায়িত্ব দেয়া হয়।
- ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী ৪০ টিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

১৯৮০ সালে সরকার ১৯৭৬ সালের আইনের এক সংশোধনী এনে গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৮০ সালের ৩০ এপ্রিল ঢাকার সাভারে প্রথম স্বর্নিভর গ্রাম উদ্বোধন করা হয়। গ্রাম সরকারের সদস্য সংখ্যা ছিল ১১। এর মধ্যে ১ জন গ্রাম প্রধান, ২ জন নারী, ২ জন কৃষক, ২ জন যুবক, ২ জন জেলে ও বাকি ২ জন অন্য যেকোন পেশা থেকে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। গ্রাম সরকারের ১২টি দায়িত্ব ও কার্য পরিচালনার জন্য তহবিল ছিল। গ্রাম সরকার ও ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ক্ষমতার ব্যাপারে কোন নীতি নির্ধারিত হয়নি। ফলে দুই পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। পরে সরকার গ্রাম সরকার বিধিমালা বাতিল করে।[৩১] ১৯৮৬ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের গঠন ও এর নিজস্ব আয়ের উৎসের পরিবর্তন ঘটে। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান, ৯ জন সাধারণ সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনে ৩ জন মহিলা সদস্যসহ ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হয়। একে পৌর, রাজস্ব ও প্রশাসন, নিরাপত্তা এবং উন্নয়নমূলক কার্যাদি সম্পাদনসহ মোট ১০টি বাধ্যতামূলক ও ৩৮টি ঐচ্ছিক দায়িত্ব দেয়া হয়।[৩২]

তাছাড়া পরিষদের কার্যকাল ছিল ৩ বৎসর। ১৯৮৪ সালে কার্যকাল ৩ বৎসরের পরিবর্তে ৫ বৎসর বলে ঘোষণা দেয়া হয়। ৩ জন মনোনীত নারী প্রতিনিধিকে মনোনয়ন দিতেন উপজেলা পরিষদ। ১৯৯৩ সালে ইউনিয়ন পরিষদ (সংশোধনী) আইন পাশ করা হয়।

ইউনিয়ন পরিষদের সংশোধিত আইন অনুযায়ী একজন চেয়ারম্যান, ৯ জন নির্বাচিত সদস্য এবং ৩ জন মনোনীত মহিলা সদস্যের সমন্বয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হতো। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে একজন করে মোট ৯ জন সদস্য নির্বাচিত করার বিধান করা হয়। অন্যদিকে সংরক্ষিত তিনটি ওয়ার্ডে মোট তিনজন নারী সদস্যকে মনোনয়নের পরিবর্তে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত করার নিয়ম করা হয়।

১৯৮৪ সালে নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যানদের একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, ৬ জন মহিলা চেয়ারম্যানের মধ্যে ৫ জনই স্বামীর স্থলে সমাসীন হয়েছেন। এ থেকে বলা যায় যে, নির্বাচিত হওয়ার পেছনে পরিবার বা বংশধারা তাদেরকে প্রভাবিত করেছে। মহিলা চেয়ারম্যানগণ প্রত্যেকে তাদের কার্য পরিচালনায় বাধার বিষয় উল্লেখ করেছেন। কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় বাধা, গ্রামের টাউট ও দুর্নীতিবাজদের বাধা, নিরাপত্তার অভাব।[৩৩]

নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণে দেখা যাচ্ছে যে, ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রচুর বাধা বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও নারীদের অংশগ্রহণ ক্রমেই বৃদ্ধি পায়েছে। ১৯৯২ সালে ৩,৮১৯টি ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদের জন্য প্রার্থী ছিলেন ১৭,৪৪৪ জন এবং ৩৪,৮০১ সদস্য পদের প্রার্থী ছিলেন ১,৬৯,৬৪৩ জন। এর মধ্যে ১১৫ জন চেয়ারম্যান এবং ১১৩৫ জন মহিলা সদস্য পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, যদি বেশি সংখ্যক মহিলা নির্বাচনে দাঁড়ানোর সুযোগ পান এবং এলাকা থেকে নারী পুরুষের সহযোগিতা লাভ করেন তবে তাদের ক্ষমতায় আসা সহজ হয়।[৩৪] ১৯৮৭ সালে মনোনীত নারী সদস্যদের একটি সমীক্ষায় জানা যায় যে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং মনোনীত সদস্যগণ একটি বিশেষ গোষ্ঠী থেকে এসেছেন। মনোনীত সদস্যগণ বেশীরভাগই গৃহবধু এবং তাঁদের বয়স তুলনামূলকভাবে কম। অল্প সংখ্যক মহিলা সদস্যের সমিতি সংগঠন ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা রয়েছে। সমাজের উপরের শ্রেণী থেকে আসার কারণে তাঁরা শিক্ষায় গ্রামের অন্য মহিলাদের থেকে উন্নত। সাধারণত মহিলা সদস্যগণ সভায় উপস্থিত থাকলেও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন না। পুরুষ সদস্যের সিদ্ধান্তই তাঁরা সায় দিয়ে থাকেন। ইউনিয়ন পরিষদের বিশেষ কমিটিতে মাত্র ৩৭% মহিলা সদস্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, দুঃস্থ মাতাদের গম বণ্টন, রাস্তা ও কালভার্ট, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদিতে ছিলেন। মহিলা সদস্যগণ এসব কাজে সম্পূর্ণ নতুন। প্রশাসনিক কাজে তাঁদের কোন অভিজ্ঞতা নেই।[৩৫] পরোক্ষভাবে নির্বাচিত ৯২৭ জন সদস্যদের উপর পরিচালিত ১৯৯৬ সালের এক জরিপে দেখা যায়, ৪০% সদস্য চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের দ্বারা, ৪৮% আত্মীয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।[৩৬]

পরোক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিজস্ব চেষ্টা বা যোগ্যতার পরিবর্তে অন্যান্য নির্ধারক বিশেষত পুরুষদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা মুখ্য ভূমিকা পালন করতো, ফলে মনোনীত সদস্যরা পরিষদের সভায় আলোচনা কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্রিয় ভূমিকা পালন করার সুযোগ পেতেন না। এমনকি পরিষদের সভায় উপস্থিতও থাকতেন না।[৩৭]

তৃণমূল পর্যায়ে এই প্রেক্ষাপটে নারী সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসার প্রবণতা ক্রমেই জাগ্রত হতে থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদে কাঠামোগত পরিবর্তন আসে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময় ক্ষমতাসীন সরকার প্রচলিত আইন সংশোধন করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থায় (ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা) সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু সংরক্ষিত আসনগুলোতে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নারী প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিলনা। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থায় নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া বিকাশের লক্ষ্যে

আওয়ামী লীগ সরকার (১৯৯৬-২০০১) ইউনিয়ন পরিষদ আইন ও বিধিমালা, ১৯৮৩, সংশোধন (১৯৯৭ সালের ২০ নং আইন) এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত তিনটি মহিলা আসনের স্থলে জনগণের প্রত্যক্ষভোটে তিনজন মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করে।[৩৮]

তৃণমূল পর্যায়ে এই আইন নারীকে ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসে। এতে বলা হয় প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ৯ ওয়ার্ডে ৯ জন নির্বাচিত সাধারণ সদস্য এবং প্রতি ৩ ওয়ার্ডে ১ জন করে মোট ৩ জন নারী সদস্য জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। এই আইনটি বাংলাদেশের নারী সমাজকে ক্ষমতায়ন ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণের একটি ইতিবাচক আশাব্যাঞ্জক ও নতুন জাগরণের সৃষ্টি করে। এই আইন পাস ও তার ভিত্তিতে ১৯৯৭ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর ইউনিয়ন পরিষদে নারী অংশগ্রহণ শুরু হলে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা পুরুষপ্রধান সমাজের বিরোধিতার মুখে পড়ে। নারী সদস্যদের দাবির প্রেক্ষিতে ২০০৩ সালে এই আইনের ভিত্তিতে পরবর্তী নির্বাচনের পর সরকার পরিপত্র জারি করে নারী সদস্যদের দায়দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেয়।

২০০৭ সালের জুন মাসে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গতিশীল ও শক্তিশালীকরণ কমিটি গঠন করা হয়। ড. এ.এস.এম শওকত আলীর নেতৃত্বাধীন এই কমিটি মাত্র ৬ মাসের মধ্যে ২০০৭ সালের নভেম্বরে চারখন্ডের রিপোর্ট প্রকাশ করেন। কমিটি ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ নামে তিনস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সুপারিশ করেন।[৩৯]

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৮ সালের অধ্যাদেশে আগের মতোই তিনটি সাধারণ আসনের সমন্বয়ে একটি সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান করে। পাঁচ বছর মেয়াদী ইউনিয়ন পরিষদে ৯টি সাধারণ আসন ও ৩টি সংরক্ষিত আসনের সদস্য এবং একজন চেয়ারম্যান থাকবেন। একইভাবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল প্রতিষ্ঠানের এক তৃতীয়াংশ নারী প্রতিনিধির আসন সংরক্ষিত থাকবে। এর পাশাপাশি প্রতিটি জেলা এবং উপজেলা পরিষদে দুইজন করে ভাইস চেয়ারম্যান নিয়োগের বিধান করা ছিল। যাঁদের একজন হবেন নারী।[৪০]

১৯৯৭ সালে দেশে প্রথমবারের মতো স্থানীয় সরকার পরিষদে সংরক্ষিত আসনে নারীদের সরাসরি নির্বাচনের বিধান চালুর পর থেকে স্থানীয় সরকারে তৃণমূলের হাজার হাজার নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের

সুযোগ সৃষ্টি হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালের শেষের দিকে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন করেন।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশে যতবার সরকার বদল হয়েছে প্রায় ততবার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। স্বাধীনতার পর প্রতিটি সরকার স্থানীয় সরকার গঠন সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতামত ও নীতি গ্রহণ করেছে। এক সরকারের আমলে গৃহীত নীতি পরবর্তী সরকারের আমলে গুরুত্ব হারিয়েছে।[৪১]

বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা ও পরিধি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। তারপরও স্বাধীনতার পর গত ৪২ বছরে বিষয়টিকে উপেক্ষা করেছে প্রায় সব সরকারই। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারকে জনকল্যাণমুখী করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হলেও সেটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। বরং আইন ও বিধানের পাশ কাটিয়ে দেশের শাসন ব্যবস্থাকে অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত করার প্রবণতাটাই জোরালো ছিল সব সরকারের আমলে। তাবে আশার কথা এই যে, নারীরা ক্রমেই সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন হচ্ছেন। তৃণমূলপর্যায়ে এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নারীরা তাদের দাবী ও চাহিদা জানাতে পারেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারেন। যেহেতু স্থানীয় সরকার স্থানীয় চাহিদা পূরণে ও সেবা প্রদানকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান সেই কারণে নারী প্রতিনিধিগণ এই প্রতিষ্ঠানে সম্পৃক্ত থেকে এলাকার উন্নয়নে অবদান রাখতে পারেন। এছাড়া, অধিকহারে ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে নারীদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায় থেকে নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলা সম্ভব।

সাধারণত স্থানীয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সংস্থাকে স্থানীয় সরকার বলা হয়। জাতীয় সরকারের মত স্থানীয় সরকার সার্বভৌম কোন প্রতিষ্ঠান নয়। স্থানীয় সরকারের গঠন, কার্যপরিধি ও আর্থিক ক্ষমতা জাতীয় সরকার আইন ও বিধির মাধ্যমে নির্ধারণ করেন। এছাড়াও জাতীয় সরকার বিভিন্ন সার্কুলার ও নির্দেশের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। স্থানীয় সরকার নির্দিষ্ট এলাকার কর, রেট, ফী, টোল প্রভৃতি নির্ধারণ ও আদায়ের ব্যাপারে জাতীয় সরকারের নির্দেশ অনুসরণ করে থাকে।[৪২]

গ্রামীণ উন্নয়নকে সফল করার জন্য স্থানীয় সরকারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। গ্রামের উন্নয়ন করতে হলে স্থানীয় সরকারকে মূল ভূমিকা পালন করতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম পর্যায়ে একাধিকবার স্থানীয় সরকার গঠনের চেষ্টা করা হয় এবং থানা পর্যায়ে উপজেলা পরিষদ গঠনের পরিকল্পনা করা হয়। জিয়াউর রহমানের

আমলে গ্রাম পর্যায়ে 'গ্রাম সরকার' এবং হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের আমলে 'পল্লী পরিষদ' গঠনের চেষ্টা করা হয় কিন্তু দুটি পরিকল্পনাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। চারদলীয় সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে আবার গ্রাম সরকার ব্যবস্থার প্রচলন করে। ৩০ জুন, ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে গ্রাম সরকার (রহিত করণ) অধ্যাদেশ ২০০৮ জারির মাধ্যমে গ্রাম সরকার ব্যবস্থা বাদ দিয়ে বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে তিন স্তর এবং শহরাঞ্চলে দুই স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু হয়। নিম্নে ছকের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার কাঠামো দেখানো হলোঃ

সারণি-৩.২

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ঃ

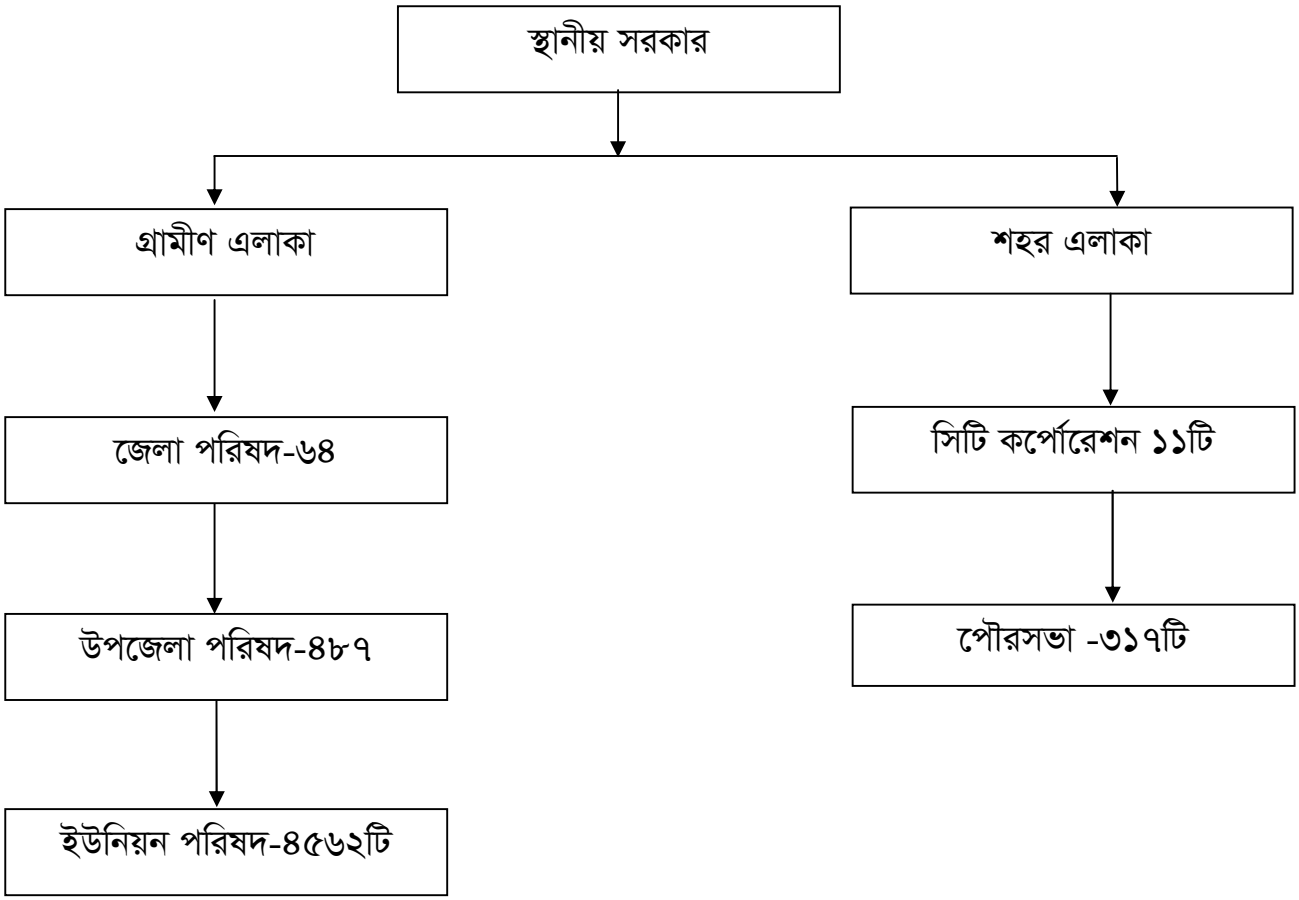

১৯৮০ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে এর মাধ্যমে ১৯৭৬ সালে অধ্যাদেশ সংশোধনীর মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ বিধি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে প্রতিটি গ্রামে একজন গ্রাম প্রধান ও দু'জন মহিলা সহ মোট ১১ জন সদস্য নিয়ে গ্রাম সরকার গঠন করা হয়।[৪৩] গ্রাম সরকারকে যথেষ্ট দায়িত্ব দেয়া হয় কিন্তু কোন আর্থিক সাহায্য বা কর ধার্যের ক্ষমতা দেয়া হয়নি। আর্থিক অসুবিধা ও ক্ষমতার অভাবে গ্রাম সরকার ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। ১৯৮২ সালে স্বনির্ভর গ্রাম সরকারের বিলুপ্তি ঘটে।

৩.৩ স্থানীয় সরকার কাঠামোর স্তরঃ

দেশের সামগ্রিক শাসন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। বর্তমানে দেশে গ্রামাঞ্চলে তিন স্তর বিশিষ্ট (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ) এবং শহরাঞ্চলে দুই স্তর বিশিষ্ট (পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) স্থানীয় সরকার বিদ্যমান। তাছাড়া এলাকা ভিত্তিক বিশেষ স্থানীয় সরকার যেমন দেশের তিনটি পার্বত্য জেলা বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটির জন্য বিশেষ ধরণের জেলা পরিষদ, পার্বত্য সার্কেল প্রধান বা পার্বত্য রাজাদের অধীনে বিশেষ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

ক) জেলা পরিষদঃ

স্থানীয় সরকার কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তর জেলা পরিষদ। সংক্ষেপে, শত বছরের গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বৃটিশ আমলে জেলা পরিষদই ছিল স্থানীয় সরকারের অত্যন্ত শক্তিশালী একক। জেলা পরিষদ বৃটিশ আমলে সীমিতভাবে হলেও যতটুকু প্রতিনিধিত্বশীল ছিল পাকিস্তান আর বাংলাদেশের বর্তমান সময় পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি। পাকিস্তান আমলের শেষ দশকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে এবং মৌলিক গণতান্ত্রিক কাঠামোর অধীনে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পর্যায়টা একটি শক্তিশালী স্তর বা কাঠামো হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৮৮৫ সালের পর থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কাঠামো একটি স্থায়ী একক হিসেবে গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর নতুন সরকার মৌলিক গণতান্ত্রিক কাঠামোকে বাতিল করলেও ইউনিয়ন পরিষদ কাঠামোকে অগ্রাহ্য করেনি। স্বাধীনতার প্রথম এক দশক (১৯৭১-১৯৮১) গ্রামীণ স্থানীয় সরকার বলতে শুধুমাত্র ইউনিয়ন পরিষদই কার্যকর ছিল। থানা বা জেলা কোথাও কার্যকর স্থানীয় সরকার ছিল না। ১৯৮২ সনে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পর জেনারেল এরশাদ থানা পর্যায়ে একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। সে ব্যবস্থা বিতর্কিত হলেও শেষ পর্যন্ত একটি সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে যায়। বৃটিশ আমলের পর

থেকে জেলা পরিষদ আর কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে উঠে না দাঁড়ালেও মাঝে মাঝে জেলা গভর্ণর ব্যবস্থা, জিয়া আমলে জেলা উন্নয়ন সমন্বয়কারী, এরশাদ আমলে মনোনীত সভাপতির মাধ্যমে একটি স্বল্পকালীন জেলা পরিষদ গঠিত হলেও কোনটাই শেষ পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।[৪৪]

খ) উপজেলা পরিষদঃ

বাংলাদেশের গ্রামীণ স্থানীয় সরকার কাঠামোর একটি মধ্যবর্তী ইউনিট হলো উপজেলা পরিষদ যা কিনা জেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে দেশে ৪৮৭টি উপজেলা পরিষদ রয়েছে (পরিসংখ্যান পাকেট বই-২০১২)। রাষ্ট্রপতি হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালে প্রাশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে তৎকালীন থানাগুলোকে উপজেলায় উন্নীত করেন। মূলত ৪টি মৌল উদ্দেশ্যের জন্য উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল। এগুলো হলো:

- জনগণকে জাতীয় সরকারের উপর সবসময় মুখাপেক্ষী না করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভরশীল করে তোলা;
- স্থানীয় সম্পদ সৃষ্টি, সংগ্রহ ও একত্রীকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের প্রচেষ্টা;
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং এর বাস্তবায়নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত করা যাতে জাতীয় সরকারের প্রতি নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়; এবং
- আন্তবিভাগীয় সমন্বয় প্রক্রিয়াকে কার্যকর ও দ্রুত ত্বরান্বিত করার সর্বোচ্চ কর্মপ্রচেষ্টা ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা।[৪৫]

উপজেলা ব্যবস্থা চালুর পশ্চাতে তৎকালীন সরকারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যাই থাকুক না কেন, বাস্তবে এর দ্বারা উন্মেষ ঘটেছিল উন্নয়নের একটি নবতর ধারার। উপজেলা হওয়ায় নানা পর্যায়ে স্থাপিত হয় অনেক নতুন অফিস। সরকারি অফিসগুলোর ক্ষমতা ও কাজের পরিধি বৃদ্ধি পায়। থানায় থানায় স্থাপন করা হয় ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট। গ্রামের মানুষ মামলা নিয়ে জেলা সদরে দৌড় ঝাপ থেকে রেহাই পান। উপজেলাই হয়ে ওঠে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। উপজেলা সদরগুলো রূপান্তরিত হয় ছোট ছোট শহরে। পাকিস্তান আমলে মহকুমা সদরের ন্যায় উপজেলাগুলো টাউনে পরিণত হয়। সঙ্গত কারণে বেড়ে যায় পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য, প্রসার ঘটে ব্যবসা বাণিজ্যের। মোট কথা, উপজেলা পদ্ধতি প্রসারিত কর দেয় স্থানীয় উন্নয়নের পথ।[৪৬]

১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় এসে উপজেলা পদ্ধতি বাতিল করে দেয়। উপজেলার পরিবর্তে পুণরায় থানা নাম প্রবর্তন করা হয়। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে একটি টেকসই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে গঠন করে স্থানীয় সরকার কমিশন। সেই কমিশন চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামোর সুপারিশ করে। স্তরগুলো হল গ্রাম পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদ। সেই অনুযায়ি উপজেলা পরিষদ পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। থানাগুলো উপজেলায় রূপান্তরিত হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া, এই প্রথমবার উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যানের পাশাপাশি দুটি ভাইস চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে যার একটি পদ অবশ্যই নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয় এবং তারা সকলে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন।

গ) ইউনিয়ন পরিষদঃ

গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের নানা টানাপোড়নের মধ্যেও ১৮৭০ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে একটি মাত্র স্তর নিজস্ব শক্তিতে প্রতিষ্ঠান হিসাবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে সেটি হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। এদেশের স্থানীয় সরকারের বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার সার-সংক্ষেপ দেখা যায় যে, স্থানীয় সরকারের স্তর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলে প্রতিটি স্তরের ক্ষমতা, কার্যাবলী, আওতা, জনবল, অর্থ সম্পদ, নেতৃত্ব ইত্যাদির ক্ষেত্রে অহেতুক সমস্যা সৃষ্টি হয়। ধরা যাক, একটি ইউনিয়নে ১০ থেকে ৩০/৪০টি পর্যন্ত গ্রাম থাকে। সবক'টি গ্রামে যদি পৃথক পৃথক পরিষদ গঠিত হয় এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা থাকে তাহলে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত করতে হবে। নতুবা একই কাজ নিয়ে দু'সংস্থার মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হতে পারে। অথবা একই কাজ দুই সংগঠন দু'ভাবে করে মূল্যবান সম্পদের অপচয়ও করতে পারে। গ্রাম পরিষদ আইন ১৯৯৭ এ বর্ণিত গ্রাম পরিষদের ক্ষমতা, কার্যাবলী ও গঠন প্রণালী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বস্তুত এ পরিষদের হাতে কার্যকর কোন ক্ষমতা, সম্পদ জনবল কিছুই নেই। কোন কাজের সুনির্দিষ্ট কোন দায়িত্বও নেই। প্রতিষ্ঠান হিসেবে তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদকেই পর্যাপ্ত বরাদ্দ, প্রশিক্ষণ জনবল সম্পদ ও ক্ষমতা প্রদান করলে দেশের গ্রামাঞ্চলে শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের ভিত তৈরি করা সম্ভব।[৪৭]

ঘ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদঃ

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ দ্বারা তিনটি পৃথক পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ সৃষ্টি করা হয়। প্রত্যেকটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ উপজাতীয় চেয়ারম্যান এবং উপজাতীয় ও অউপজাতীয় সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়। পরিষদগুলোর প্রধান প্রধান কাজ হচ্ছে জেলার আইন শৃংখলা রক্ষা, উন্নয়ন কর্মকান্ড গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বন, মৎস সমবায়, শিল্প ও বাণিজ্য, সমাজকল্যাণ ও সংস্কৃতি, কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ, খেয়াঘাট নিয়ন্ত্রণ, উদ্যান ও খেলার মাঠ, ডাকবাংলো রক্ষণাবেক্ষণ, স্থানীয় এলাকার উন্নয়নকল্পে নকশা প্রণয়ন এবং এলাকার অধিবাসীদের ধর্মীয়, নৈতিক ও আর্থিক উন্নয়ন সাধন।[৪৮]

ঙ) সিটি কর্পোরেশনঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে ১১টি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে (পরিসংখ্যান পকেট বই-২০১২)। প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশনে ১ জন মেয়র, নির্ধারিত সংখ্যক কমিশনার থাকবেন। মেয়র কমিশনার ও সংরক্ষিত আসনের মহিলা কমিশনারগণ প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। ২০০২ সালে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ইউনিয়ন পরিষদের মতো নারী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। ২০০২ সালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে ৩০ জন, চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে ১৪ জন, খুলনা, বরিশাল ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে ১০ জন করে এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশনে ৯ জন নারী কমিশনার নির্বাচিত হন। ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে দলীয় সমর্থন বঞ্চিত হয়েও জনগণের রায়ে বিজয়ী হয়ে দেশের প্রথম নির্বাচিত নারী মেয়র হন ডা: সেলিনা হায়াৎ আইভী। তার এ বিজয় প্রমাণ করে দিয়েছে সততা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করলে দলীয় পৃষ্ঠপোষকতা না পেলেও এবং পেশী শক্তির সহায়তা ছাড়াও নারীরা রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ বিজয়ী হতে পারে। এই ঘটনাটি দেশে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।[৪৯]

চ) পৌরসভাঃ

পৌরসভা একটি নগর ভিত্তিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। একমাত্র সরকারই ক্যান্টনমেন্ট এর বহির্ভূত যে কোন নগর এলাকাকে পৌর এলাকা ঘোষণা করতে পারে। তবে এলাকার জনসংখ্যা কমপক্ষে ১৫,০০০ (পনের হাজার) হতে হবে এবং প্রতি বর্গমাইল এলাকায় গড়ে কমপক্ষে ২০০০ (দুই হাজার) অধিবাসী থাকতে হয়। এলাকার তিন চতুর্থাংশ প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যাকে অকৃষি পেশায় নিয়োজিত থাকতে হয়। পৌরসভা অধ্যাদেশ ১৯৭৭, অনুযায়ী নিম্নরূপ সদস্যদের নিয়ে পৌরসভা গঠিতঃ

একজন চেয়ারম্যান- পৌর এলাকার ভোটার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত।
কমিশনার- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের জনগণের প্রত্যেক্ষ ভোটে নির্বাচিত।
মহিলা সদস্য- প্রতি তিনটি ওয়ার্ডের জন্য সংরক্ষিত আসনে একজন মহিলা সদস্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সমূহের জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

২০০৪ সালে পৌরসভা নির্বাচনেও ইউনিয়ন পরিষদের মত নারী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৫০ টি পৌরসভার সংরক্ষিত আসনে ২৭২ জন নারী কমিশনার নির্বাচিত হন। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট পৌরসভার সংখ্যা ৩১৭ টি। (পরিসংখ্যান পকেট বই ২০১২) সালের পৌরসভা নির্বাচনে ১ জন নারী (রাজশাহীতে) মেয়র নির্বাচিত হন এবং ২১২টি পৌরসভায় ৬৩৬ জন নারী সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হন।

জাতীয় সংসদঃ

স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে নারীদের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য ৬৫ (৩) ধারার মাধ্যমে সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭৩ সালে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ছিল ১৫, যা পরবর্তী দশ বছরের জন্য সংরক্ষিত হয়। ১৯৭৯ সালে নারী দশকের প্রভাবে এ সংখ্যা ৩০-এ উন্নীত করা হয়। ১৯৯১ সালের দশম সংশোধনীর মাধ্যমে ১০ বছরের জন্য আবার এ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ২০০১ সালের এপ্রিলে সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ শেষ হয়।[৫০] ২০০১ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত সংরক্ষিত আসনে কোন নারী প্রতিনিধি ছিলেন না।

সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে ২০০৪ সালে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৩০ থেকে ৪৫-এ উন্নীত করা হয়, যার ফলে জাতীয় সংসদে মোট আসন সংখ্যা ৩৩০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪৫ এ দাড়ায়। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ২০১১ সালে সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা ৪৫ থেকে ৫০ এ বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ৩০০টি সাধারণ আসন এবং ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসন রয়েছে।

সংবিধানে বলা হয়েছে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে। এজন্য আপাতত পাঁচটি আসন বাড়ানো হয়েছে। নতুন পাঁচটি আসন যুক্ত হওয়ায় বর্তমানে সংসদে নারীদের অংশগ্রহণ মোট আসনের প্রায় ২০ শতাংশ ভাগে দাঁড়াল। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১-তে বলা হয়েছে, নারী সাংসদদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে সংসদে মোট আসনের ৩৩ শতাংশ ভাগ করা হবে এবং সরাসরি ভোটের মাধ্যমে এ আসনগুলো চালু করা হবে।[৫১]

রাজনীতি ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থানের অনেক উন্নতি ঘটেছে। ১৯৭৯ সালে জাতীয় সংসদে প্রথম বারের মত নারী প্রতিনিধি সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৮৬ সালে ৫ জন নারী সরাসরি নির্বাচিত হন। ১৯৯১ সালে ৪ জন, ১৯৯৬ সালে ১১ জন, ২০০১ সালে ৬ জন, ২০০৮ সালের নির্বাচনে ১৯ জন। এছাড়া জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন রয়েছে। ১৯৭৯ সালে আসনের সংখ্যা ছিল ৩০ বর্তমানে তা বেড়ে দাড়িয়েছে ৫০ এ। লক্ষ্যণীয় যে, ২০০৮ সালের নির্বাচনে বেশি সংখ্যক নারী সরাসরি আসনে নির্বাচন করেন এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নির্বাচনে জয়লাভ করেন।[৫২]

প্রধানত দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব জরুরি। প্রথমত: নারীর জন্য সমতা ও সম-সুযোগের নিশ্চয়তা তথা তাদের মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার জন্য সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত: দারিদ্র্য ও দারিদ্র্যের ভয়াবহ পরিণতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব তথা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন জরুরি। আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক দরিদ্র। নারীরা দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম। দুর্ভাগ্যবশত নারীদের মধ্যে বিরাজমান দারিদ্র্যই সার্বিক জাতীয় দারিদ্র্যের উৎস।[৫৩] ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সংসদে সরাসরি নির্বাচিত নারী সদস্যের সংখ্যা কখনোই শতকরা ২ ভাগের বেশি ছিলো না। কিন্তু ২০০৮ সালে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভায় ছিলেন ৬ জন নারী সদস্য, তাঁদের মধ্যে

প্রধানমন্ত্রীসহ স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, কৃষি, নারী শিশু ও শ্রম এবং জনশক্তি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন নারীরা। এদের তিনজন পূর্ণ মন্ত্রী আর বাকিরা প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার। জাতীয় সংসদের স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন শিরীন শারমীন চৌধুরী এমপি। নবম সংসদে নারীদের মধ্যে একজন সংসদ উপনেতা, একজন হুইপ এবং দু'জন সংসদীয় স্থায়ী বা স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি ছিলেন।

বিভিন্ন সংসদীয় কমিটিতে নারী সদস্য ছিলেন মোট ৫৭ জন। একে একটি ইতিবাচক সূচনা বলা যায়। কারণ অষ্টম সংসদে কোন নারীই কোন সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হননি এবং কেউ হুইপও নির্বাচিত হননি । বস্তুতঃ ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীর অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে।[৫৪]

সারণিঃ ৩.৩ জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব

নির্বাচনের বছর	সংসদে মোট সাধারণ আসন সংখ্যা	নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা	সাধারণ আসনে নির্বাচিত মোট নারী	সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের হার
১৯৭৩	৩০০	১৫	০	৪.৭৬
১৯৭৯	৩০০	৩০	২	৯.৬৯
১৯৮৬	৩০০	৩০	৫	১০.৬০
১৯৮৮	৩০০	০	৪	১.৩
১৯৯১	৩০০	৩০	৪	১০.৩
১৯৯৬	৩০০	৩০	৬	১০.৯
২০০১	৩০০	০	৫	১.৬
২০০৮	৩০০	৪৫*	১৯	১৮.৫৫

সূত্র : উন্নয়ন পদক্ষেপ, উনবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুন ২০১৩, পৃষ্ঠা -১৭।

উল্লেখ্য যে, ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা ৪৫ থেকে ৫০-এ উন্নীত করা হয়। ফলে বর্তমানে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারীদের প্রতিনিধিত্বের হার ১৯.৭১ শতাংশ, যা এ যাবতকালের সর্বোচ্চ।

৩.৪ ইউনিয়ন পরিষদের গঠন দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

ইউনিয়ন পরিষদ হচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বকারী স্থানীয় সরকার যা নির্বাচিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে এবং প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করে থাকে। স্থানীয় পর্যায়ের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি সরকার ও জনগণের মধ্যে সার্বিক যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে কাজ করে থাকে। ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। এরপর বিভিন্ন শাসন আমলে ইউনিয়ন পরিষদের নামকরণ, গঠন, প্রকৃতি, কার্যাবলী ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর সর্বশেষ সংশোধনী অনুযায়ী প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান, ৯ জন সাধারণ সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনে ৩ জন মহিলা সদস্যসহ ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হয়। একে পৌর, রাজস্ব ও প্রশাসন নিরাপত্তা এবং উন্নয়নমূলক কার্যাদি সম্পাদনসহ মোট ১০টি বাধ্যতামূলক ও ৩৮টি ঐচ্ছিক কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া, ৬টি থেকে উৎস থেকে কর আরোপ ও আদায়ের ক্ষমতা দেয়া হয়।[৫৫]

বর্তমানে সকল ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ আইন, ২০০৯ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এই আইনে মোট ১০৮টি ধারা, ১৭টি অধ্যায় এবং ৫টি তফসিল রয়েছে। স্থানীয় ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান, ৯ জন সাধারণ সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনে ৩ জন মহিলা সদস্যসহ ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হয়। এ আইনে প্রথমবারের মত ওয়ার্ড পর্যায়ে বছরে দুটি ওয়ার্ড সভা আয়োজনের বিধান রয়েছে। উন্মুক্ত ওয়ার্ড সভায় জন অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন করা এবং ওয়ার্ড সভায় অডিট রিপোর্ট উপস্থাপন ও আলোচনা করার নির্দেশ রয়েছে। এছাড়া নাগরিক সনদ প্রদান, উন্নত তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও তথ্য প্রাপ্তির অধিকার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৫৬]

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামোঃ

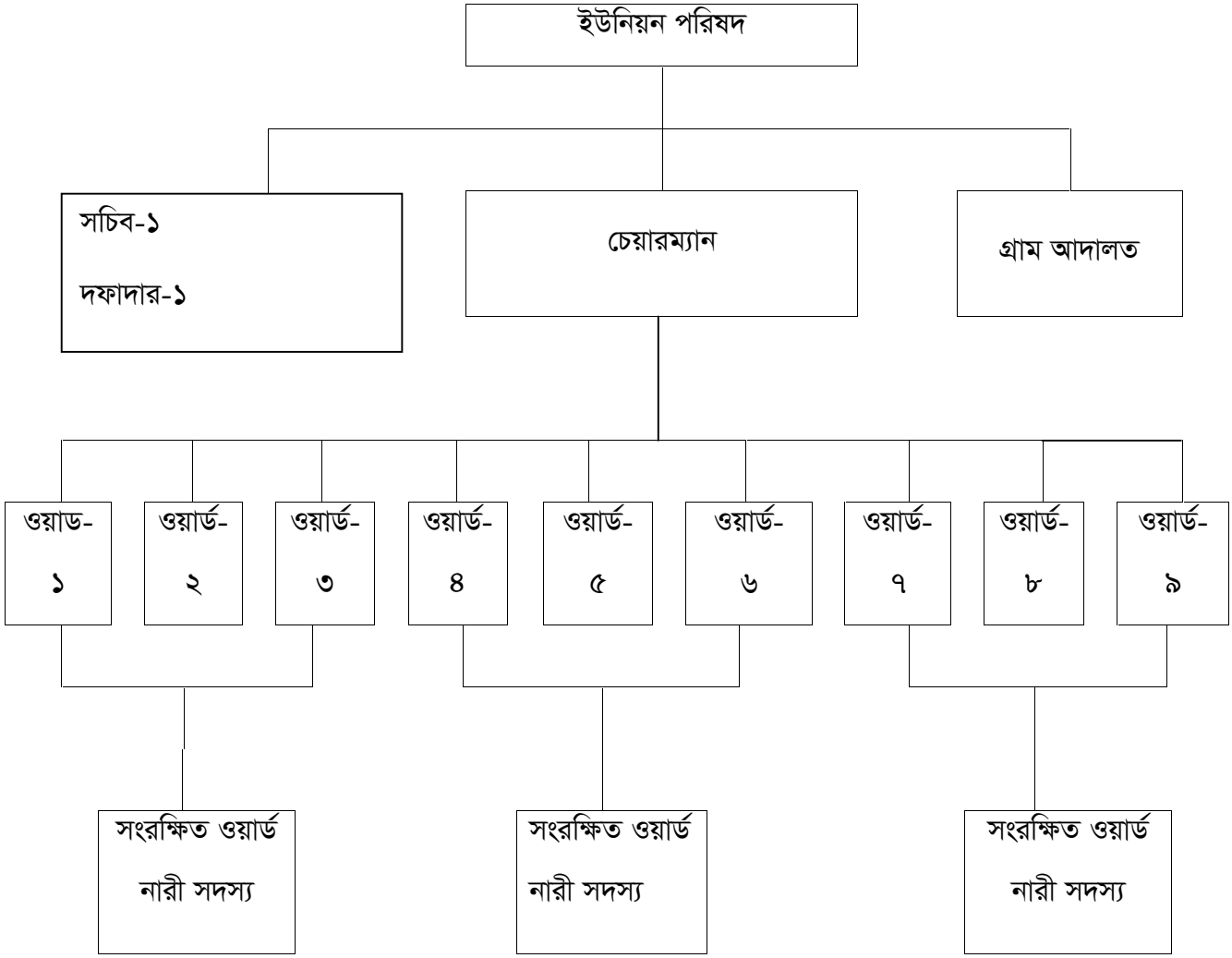

সূত্রঃ ইউনিয়ন পরিষদের "সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা" বিষয়ক হান্ডবুক USAID, বিইউপিএফ, নভেম্বর ২০১০ পৃষ্ঠা-৮।

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯ অনুসারে প্রত্যেকটি ইউনিয়ন প্রশাসনের একাংশ হবে। সাধারণত ১৫-২০ হাজার লোক অধ্যুষিত একটি পল্লী এলাকা নিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠিত হতে পারে। প্রতিটি ইউনিয়ন ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত থাকবে। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত ১ জন চেয়ারম্যান ও ১২ জন সদস্যের সমন্বয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হবে। ১২ জন সদস্যের মধ্যে তিনজন সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য এবং ৯ জন সাধারণ সদস্য। সুষ্ঠুভাবে প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত ১ জন সচিব থাকবেন। বর্তমান আইনে সচিবের পাশাপাশি একজন হিসাব সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর নিয়োগের বিধান করা হয়েছে।

প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ পরিষদ গঠিত হবার পর প্রথম সভার তারিখ হতে ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত। চেয়ারম্যান ও সদস্যের নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ হতে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে প্রথম সভা আহবান করতে হবে। প্রত্যেক চেয়ারম্যান ও সদস্য নির্বাচিত পদ্ধতিতে তার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নির্দিষ্ট সময়েরমধ্যে নির্ধারিত ফরমে শপথ গ্রহণ করবেন।[৫৭]

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী ঃ

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী আগের মতো বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক কার্যাবলী পৃথকভাবে না রেখে এই আইনের দ্বিতীয় তফসিলে ৩৯টি কাজের উল্লেখ রয়েছে।

১) পরিষদের প্রধান কার্যাবলী হবে নিম্নরূপ, যথাঃ

- প্রশাসন ও সংস্থাপন বিষয়াদি;
- জনশৃংখলা রক্ষা;
- জনকল্যাণমূলক কার্য সম্পর্কিত সেবা; এবং
- স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রধান কার্যাবলীর উপর ভিত্তি করে পরিষদের কার্যাবলী আইনের দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত আছে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাই থাকুক না কেন, বিশেষ করে এবং উক্তরূপ উপ-ধারাসমূহের সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করে, সরকার সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিধি দ্বারা নির্ধারণ করতে পারে। তবে ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পের (টি,আর, কাবিখা, থোক বরাদ্দ ও অন্যান্য) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের এক তৃতীয়াংশ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যকে অর্পণ করতে হবে।

দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলীঃ

- পাঁচশালা ও বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি।
- পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত।
- স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- কৃষি, মৎস ও পশুসম্পদ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।
- মহামারী নিয়ন্ত্রণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।
- কর, ফি, টোল, ফিস ইত্যাদি ধার্যকরণ ও আদায়।
- পারিবারিক বিরোধ নিরসন, নারী ও শিশু কল্যাণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন।
- খেলাধুলা, সামাজিক উন্নতি সংস্কৃতি ইত্যাদি কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও সহযোগিতা প্রদান।
- পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- আইন শৃংখলা রক্ষায় সরকারের অর্পিত দায়িত্ব পালন ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।
- জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ।
- সরকারি স্থান, উন্মুক্ত জায়গা, উদ্যান ও খেলার মাঠের হেফাজত করণ।
- ইউনিয়ন পরিষদের রাস্তায় ও সরকারি স্থানে বাতি জ্বালানো।
- বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষণ এবং বৃক্ষসম্পদ চুরি ও ধ্বংস প্রতিরোধ।
- কবরস্থান, শ্মাশান, জনসাধারণের সভার স্থান ও অন্যান্য সরকারি সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা।
- জনপথ, রাজপথ ও সরকারি স্থানে অনধিকার প্রবেশ রোধ এবং এসব স্থানে উৎপাত ও তার কারণ বন্ধ করা।

- জনপথ ও রাজপথের ক্ষতি, বিনষ্ট বা ধ্বংস প্রতিরোধ করা।
- গোবর ও রাস্তার আবর্জনা সংগ্রহ, অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- অপরাধমূলক ও বিপজ্জনক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ।
- মৃত পশুর দেহ অপসারণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ।
- ইউনিয়নে নতুন বাড়ি, দালান নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ এবং বিপজ্জনক দালান নিয়ন্ত্রণ।
- কূয়া, পানি তোলার কল, জলাধার, পুকুর এবং পানি সরবরাহের অন্যান্য উৎসের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ।
- খাবার পানির উৎসের দূষণ রোধ এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সন্দেহযুক্ত কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানের পানি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।
- খাবার পানির জন্য সংরক্ষিত কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানে বা নিকটবর্তী স্থানে গোসল, কাপড় কাঁচা বা পশু গোসল করানো নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা।
- পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানে বা নিকটবর্তী স্থানে শন, পাট বা অন্যান্য গাছ ভিজানো নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা।
- আবাসিক এলাকার মধ্যে চামড়া রং করা বা পাকা করা নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা।
- আবাসিক এলাকার মাটি খনন করে পাথর বা অন্যান্য বস্তু উত্তোলন নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা।
- আবাসিক এলাকায় ইট, মাটির পাত্র বা অন্যান্য ভাটা নির্মাণ নিষিদ্ধ করা।
- অগ্নি, বন্যা, শিলাবৃষ্টিসহ ঝড়, ভূমিকম্প বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় তৎপরতা গ্রহণ ও সরকারকে সার্বক্ষণিক সাহায়তা প্রদান।
- বিধবা, এতিম, গরীব ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের তালিকা সংরক্ষণ ও সাহায্য করা।
- সমবায় আন্দোলন ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন ও উৎসাহ প্রদান।
- বাড়তি খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- গবাদিপশুর খোয়াড় নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা।

- ইউনিয়নের বাসিন্দাদের নিরাপত্তা, আরাম-আয়েশ বা সুযোগ সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ই-গভর্ণেন্স চালু ও উৎসাহিতকরণ।
- ইউনিয়ন পরিষদের মত সদৃশ কাজে নিয়োজিত অন্যান্য সংস্থার সাথে সহযোগিতা সম্প্রসারণ।
- সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে আরোপিত দায়িত্বাবলী।

উপরোক্ত কার্যাবলী পালনে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা চেয়ারম্যানের প্রধান দায়িত্ব। পরিষদের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। তিনিই পরিষদের প্রধান নির্বাহী এবং সকল কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান করে থাকেন। ইউনিয়ন পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ইউনিয়ন পরিষদের সভায়। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৪২ ধারা অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের কর আরোপ, বাজেট, কৃষি শিল্প ও সমাজ উন্নয়ন, উন্নয়ন পরিকল্পনা, চুক্তি প্রণয়নের পদ্ধতি ব্যয় অনুমোদন ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া, ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্থায়ী (স্ট্যান্ডিং) কমিটি/অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করার ক্ষমতা ইউনিয়ন পরিষদকে দেয়া হয়েছে। ১৯৮৩ সলের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ এর অনুচ্ছেদ ৩৮ এ বলা হয়েছে যে, ইউনিয়ন পরিষদ প্রয়োজনবোধে কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে যে কোন কমিটি গঠন করতে পারবে। ১৯৯৩ সলের স্থানীয় সরকার (ইউপি) সংশোধনী আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ স্থায়ী কমিটি প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করতে পারবে। স্থানীয় সরকার (ইউপি) আইন-২০০৯ এ-ও অনুরূপ কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদ নিম্নোক্ত বিষয়ে স্ট্যান্ডিং/স্থানীয় কমিটিসমূহ গঠন করবে যথাঃ

- অর্থ ও সংস্থাপন;
- হিসাব নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ;
- কর নিরুপন ও আদায়;
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা;

- কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কাজ;
- পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষন, ইত্যাদি;
- আইন-শৃংখলা রক্ষা;
- জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন;
- স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন;
- সমাজকল্যাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা;
- পরিবেশ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ;
- পারিবারিক বিরোধ নিরসন, নারী ও শিশু কল্যাণ (পাবর্ত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য হবে না);
- সংস্কৃতি ও খেলাধুলা।

স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং-প্রজেই-৩/বিবিধ-১৪/২০০১/৮০১ তারিখ: ১০-০৯-২০০২ এর প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটিগুলোর প্রতিটিতে মোট সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ সদস্য হবে সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য। মোট স্থায়ী কমিটির এক তৃতীয়াংশের চেয়ারম্যান হবেন সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য। তবে অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান হবেন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান।

এ ছাড়া মহিলা সদস্যগণ নিম্নলিখিত দায়িত্বাবলি পালন করবেনঃ

- ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক সভায় নিয়মিত উপস্থিতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতামত প্রদান;
- ইউনিয়নের উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির জন্য স্ব স্ব ওয়ার্ডের উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন;
- বাজেট প্রণয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন;
- পরিষদের স্থায়ী কমিটিতে এক তৃতীয়াংশ চেয়ারম্যান/আহবায়ক ও মোট প্রকল্প কমিটির এক-তৃতীয়াংশের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- গ্রাম আদালতের মনোনীত সদস্য হিসেবে বিচারকার্য পরিচালনায় সহায়তা প্রদান;
- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকার আদমশুমারীসহ সকল ধরণের শুমারী পরিচালনায় কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা;
- স্ব স্ব ওয়ার্ডের শান্তি-শৃংখলা রক্ষায় গ্রাম পুলিশকে সহায়তা করা;

- এলাকায় বণ্যা, ঘুর্ণিঝড় বা অন্য যে কোন দুর্যোগের সময়ে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা প্রস্তুত ও ত্রাণ সামগ্রী বন্টন;
- স্ব স্ব ওয়ার্ডে জন্ম-মৃত্যু, অন্ধ, ভিক্ষুক, দুঃস্থ ও অসহায় বিধবা, এতিম, গরীব প্রতিবন্ধী ইত্যাদি জনগণের নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা;
- ওয়ার্ডে কমিটি গঠনের মাধ্যমে অপরাধ দমন, বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, চোরাচালান, দমন, অপরাধমূলক ও বিপজ্জনক ব্যবস্থা সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদকে অবহিত করা;
- প্রাথমিক ইউনিয়ন পরিষদ মনিটর (ইউনিয়ন পরিষদ সচিব) মাঠ পর্যায়ে আরএমপি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা সদস্যগণের পরামর্শ গ্রহণ করবেন এবং প্রয়োজনে যথাযথ ব্যবস্থা নিবেন;
- ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা সদস্যগণ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সাথে দুঃস্থ মহিলাকর্মী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করবেন;
- সরকার ও ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন করবেন।

ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক নারীর ক্ষমতায়ন কতটুকু সম্ভব অথবা শক্তিশালী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠায় তারা কি ভূমিকা পালন করবে সে বিষয়টি বিশ্লেষণ করার পূর্বে লক্ষ্য রাখতে হবে ইউনিয়ন পরিষদ নিজে কতটুকু শক্তিশালী। ইউনিয়ন পরিষদ শক্তিশালী হলেই নারীর ভূমিকা পালন সহজতর হবে। স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও ইউনিয়ন পরিষদের নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদ দেশের গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। স্থানীয় সরকারের কর্ম পরিধি আর্থিক ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়গুলো আইন ও বিধি বিধানের মাধ্যমে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। অনেক সময় দেখা যায় এসব বিষয়গুলো সম্পর্কে চেয়ারম্যান, সদস্য এবং অন্যরা যথাযথ অনুধাবন ও প্রয়োগের সীমাবদ্ধতার কারণে ইউনিয়ন পরিষদের কাজ সুষ্টুভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হন না।

স্থানীয় উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী হলে জনগণের কল্যাণ যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি তাদের অংশগ্রহণও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু অধিকাংশ সময় কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে এর উপর কর্তৃত্ব করে থাকে। স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ ছাড়া স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করা সম্ভব নয়। কিন্তু বাস্তবে স্থানীয়

সরকার ব্যবস্থার প্রায় প্রত্যেকটি স্তরে স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহের হার অত্যন্ত সীমিত এবং অধিকাংশই কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের উপর নির্ভরশীল। অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর স্থানীয় সংস্থাগুলোর নির্ভরশীলতার কারণে স্থানীয় সংস্থাগুলো তাদের স্বায়ত্তশাসন হারাচ্ছে।

ইউনিয়ন পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল গ্রাম আদালত পরিচালনা করা। এই আদালত ছোট খাটো মারামারি, দ্বন্দ্ব কলহ, ভয়ভীতি প্রদর্শন, চুরি, পবাদি পশু চুরি ইত্যাদি অপরাধের বিচার করতে পারে। কিন্তু অনেক সময় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ তাদের অর্পিত দায়িত্ব কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করেন না। ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটিকে ক্ষমতায়িত করা হলে জনগণের সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। স্থানীয় উন্নয়নে জড়িত হওয়ার কারণে অনেক সংসদ সদস্য বহু অনাকাঙ্খিত কাজের সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। তাদের পরিবারের সদস্যরা স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে অনেক সময় নিজেরা অবৈধ কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী হলে সংসদ সদস্যগণকে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর অনাকাঙ্খিত হস্তক্ষেপ ও কর্তৃত্ব করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল আইনকে যুগোপযোগী করতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় সরকারের আইনগুলোকে সংশোধন করতে হবে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে শক্তিশালী ও কার্যকর করে তোলার ব্যপারে প্রধান অন্তরায় হিসেবে অর্থ বা তহবিলের বিষয়টি দীর্ঘদিন যাবত বিবেচিত হয়ে আসছে। ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব কিছু আয় থাকলেও আর্থিক দিক থেকে তারা প্রায়ই সম্পূর্ণরূপে সরকারের উপর নির্ভরশীল। নিজস্ব আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে নিজের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। নিজস্ব আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে বা সরকার থেকে অর্থ বরাদ্দ পেলেই যে ইউনিয়ন পরিষদ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে একথা বলা যায়না। অর্থের সদ্ব্যবহার করতে হবে এবং প্রয়োজন সমন্বয়ের।

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী আলোচনা করলে দেখা যায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি সহ বেশ কিছু মন্ত্রনালয়ের কাজ ইউনিয়ন পর্যায় বিস্তৃত। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব বরাদ্দ আছে, সামাজিক নিরাপত্তামূলক বিভিন্ন কর্মসূচির জন্য আছে পৃথক বরাদ্দ। সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক বরাদ্দগুলো দেওয়া হয়। এনজিও পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি সহ বিভিন্ন কার্যক্রমও নির্ধারিত করা আছে। তাছাড়া বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ করে ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে সরকার নিয়মিত অর্থ প্রদান করে থাকে। কাজেই ইউনিয়ন পরিষদের অর্থ বরাদ্দ এখনও একেবারে

কম নয়। কিন্তু বাস্তবতা হল সেই অর্থের সদ্ব্যবহার কতখানি করা হচ্ছে সে বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে। অর্থ এখন আর বড় সমস্যা নয়। বড় সমস্যা সমন্বয়হীনতা এবং সরকারের তদারকির অভাব। কাজেই কেবল অর্থ বরাদ্দ বাড়ালেই সুফল আশা করা যায় না। ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হলে শক্তি, সামর্থ্য ও সক্ষমতা বাড়াতে হবে। কর আদায়ের আওতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে এবং তার তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে।

ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকা পালন করার আগে দেখতে হবে যে প্রতিষ্ঠানটিকে (ইউনিয়ন পরিষদ) নারীর ভূমিকা পালনের মাধ্যম হিসেবে ধরা হয়েছে, সেই প্রতিষ্ঠানটি নিজে কতটুকু শক্তিশালী বা তার ক্ষমতা কতটুকু। ইউনিয়ন পরিষদকে অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। অবশ্য সরকার ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ এর ক্ষমতা বলে প্রণীত কর আদায়ের বিস্তারিত পদ্ধতি প্রয়োগ সম্পর্কিত ৪৬ টি বিধি সংযুক্ত করেছে।[৫৮]

প্রস্তাবিত এই বিধিমালা অনুযায়ি ইউনিয়ন পরিষদ তার আওতাভুক্ত এলাকার প্রতিটি পাকা, আধপাকা বাড়ি, হাট, বাজার , ঘাট ছাড়াও কিণ্ডারগার্টেন স্কুল, কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেট হাসপাতালসহ অনুরূপ প্রতিষ্ঠান থেকে নির্ধারিত হারে বার্ষিক কর আদায় করতে পারবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ইউনিয়ন পরিষদে লাইসেন্স গ্রহণ এবং বাৎসরিক ভিত্তিতে এর নবায়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সেই সাথে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর পরিশোধে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদকে। সরকারের গৃহীত এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয় বৃদ্ধি করে ইউনিয়র পরিষদকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। ইউনিয়ন পরিষদ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরাও পরিষদে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

তথ্য নির্দেশিকাঃ

১. মোঃ মকসুদুর রহমান, বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-২৭।

২. দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ মে- ২০০৯, পৃষ্ঠা- ২।

৩. মোঃ মকসুদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৮।

৪. ইউনিয়ন পরিষদের সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ফোরাম বিইউপিএফ, নভেম্বর, ২০১০, পৃষ্ঠা-৯।

৫. উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৯ ম বর্ষ, অষ্টবিংশ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৮।

৬. জ্যোতি চট্রোপাধ্যায়, ইউনিয়ন পরিষদ ও জন উদ্যোগের সংস্কৃতি, ইনষ্টিটিউট ফর এনভায়রণমেন্ট এ্যন্ড ডেভেলপমেন্ট, নারী প্রগতি সংঘ, পৃষ্ঠা-২৪।

৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ -ফেব্রুয়ারী, ২০১১, পৃষ্ঠা-১।

৮. মোঃ মকসুদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯।

৯. এমাজউদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন, অনন্যা প্রকাশ, ২০০০, পৃষ্ঠা-৩৮৫।

১০. কামাল সিদ্দিকী, বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার এনআইএলজি, ২০০৯, পৃষ্ঠা-১২।

১১. কামাল সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২।

১২. মোঃ মকসুদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা (৩১-৩২)।

13. Najmul Abedin, Local Administration and Public Modernizing Societies Bangladesh and Pakistan (Dhaka, NIPA, 1973). P-42).

14. Shaifullah Bhuiyan, Foundation of Rual self Government in Bengal, The Dhaka University Studies, vol xx viii, part A 1978P-45.

১৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০১১, পৃষ্ঠা-১৯।

১৬. মো: মকসুদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৩।

১৭. এমাজউদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৮৭।

১৮. মো: মকসুদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫।

১৯. আল-মাসুদ হাসানউজ্জামান, বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা- (১৭৮-১৭৯)।

২০. মোঃ মকসুদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- (৫৪-৫৫)।

২১. আলমাসুদ হাসানুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৭৮।

২২. মালেকা বেগম সংরক্ষিত মহিলা আসন সরাসরি নির্বাচন অন্যপ্রকাশ, ২০০০, পৃষ্ঠা-১৮।

২৩. মোঃ মকসুদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৬।

২৪. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০১১, পৃষ্ঠা-১৯।

২৫. এ,কে শাসছুল হক, ইউনিয়ন পরিষদ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, এনআইএলজি, পৃষ্ঠা-৫।

২৬. এমাজউদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৯০।

২৭. আনু মুহাম্মদ, নারী পুরুষ ও সমাজ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৩১।

২৮. দিলীপ কুমার সাহা, স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা, মৈত্রী সাহা, নভেম্বর ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৩।

২৯. মো: মকসুদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১৭।

৩০. সৈয়দা রওশন কাদের, ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা সদস্যদের ভূমিকা, ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রেক্ষিত রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-২০।

৩১. জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, ইউনিয়ন পরিষদ ও জন উদ্যোগের সংস্কৃতি, ইউন্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট, পৃষ্ঠা-৪১।

৩২. একে শামসুল হক, ইউনিয়ন পরিষদ প্রশিক্ষন ম্যানুয়েল, এনআইএলজি, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৬।

৩৩. সৈয়দা রওশন কাদের, ১৯৯৭, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১।

৩৪. সৈয়দা রওশন কাদের, ১৯৯৭, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১।

৩৫. সৈয়দা রওশন কাদের প্রাগুক্ত-পৃষ্ঠা-২১।

৩৬. সৈয়দা রওশন কাদের "স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের ভূমিকা ও কার্যাবলী, স্থানীয় সরকার ও নারী সদস্যঃ ইউনিয়ন পরিষদ শীর্ষক উইমেন ফর উইমেন এর বার্ষিক জাতীয় সম্মেলন ১৯৯৮ এ উপস্থাপিত প্রবন্ধ।"

৩৭. মো: মকসুদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৫৮।

৩৮. মোঃ আলেকউদ্দিন শেখ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থায় নারীর ক্ষমতায়নঃ ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ওপর একটি সমীক্ষা, ক্ষমতায়ন, ২০০৪, সংখ্যা-৬, পৃষ্ঠা-৫৪।

৩৯. মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম তালুকদার, স্থানীয় শাসনের রাজনীতি, এএইচ ডেভেলপমেন্ট, ২০১২, পৃষ্ঠা-৪৬।

৪০. উন্নয়ন পদক্ষেপ, চর্তুদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, (মে-জুলাই), ২০০৮, পৃষ্ঠা-৪।

৪১. দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ ডিসেম্বর, ২০০৭, পৃষ্ঠা-৩।

৪২. এ,কে শামছুল হক, ইউনিয়ন পরিষদের মৌলিক বিষয় জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি ১৯৯৯), পৃষ্ঠা-১।

৪৩. ইউনিয়ন পরিষদ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, এনআইএলজি, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৬।

৪৪. তোফায়েল আহমেদ, স্থানীয় সরকারের সংস্কার ভাবনার দুই দশক, কোষ্ট ট্রাষ্ট, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-(৮১-৮২)।

৪৫. উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ২০০৯ একটি পর্যালোচনা পল্লী উন্নয়ন, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), মে - ২০১৩, পৃষ্ঠা (৩-৪)।

৪৬. দৈনিক ইত্তেফাক, ২০১১, পৃষ্ঠা-২।

৪৭. তোফায়েল আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮২।

৪৮. ইউনিয়ন পরিষদ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, পৃষ্ঠা-১৮।

৪৯. উন্নয়ন পদক্ষেপ, ঊনবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুন ২০১৩, স্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট, পৃষ্ঠা- (১৭-১৮)।

৫০. মোঃ আব্দুল মান্নান, সামছুন্নাহার খান মেরী, নারী ও রাজনীতি, পৃষ্ঠা-৮৩।

৫১. দৈনিক প্রথম আলো, ১ জুলাই ২০১১, পৃষ্ঠা-৩।

৫২. দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ মার্চ, ২০১২, পৃষ্ঠা-১১।

৫৩. বদিউল আলম মজুমদার,গণতান্ত্রিক উত্তরণ, স্থানীয় শাসন ও দারদ্র্য দূরীকরণ, আগামী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-৪৩৫।

৫৪. উন্নয়ন পদক্ষেপ, ঊনবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুন ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৭।

৫৫. মো: নাজিমউদ্দিন, স্থানীয় সরকার আইন ও বিধিমালা গুরুত্বপূর্ণ পরিপত্রের সংকলন, মাতৃভাষা প্রকাশ, ২০১২, পৃষ্ঠা-৬।

৫৬. ইউনিয়ন পরিষদের "সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা" বিষয়ক হ্যান্ডবুক, বিইউপিএফ, ২০১০, পৃষ্ঠা-১০।

৫৭. ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ সহায়িকা, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কুমিল্লা, জুলাই-২০১১, পৃষ্ঠা-১৫।

৫৮. দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ আগষ্ট, ২০১১, পৃষ্ঠা-১০।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থায় (ইউনিয়ন পরিষদ) নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন।

৪.১ ভূমিকাঃ

৪.২ রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণঃ

৪.৩ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালাঃ

৪.৪ ইউনিয়ন পরিষদ ও নারীর ক্ষমতায়নঃ

৪.৫ রাজনৈতিক দলের ঘোষণাপত্র ও নির্বাচনী ইশতেহারে স্থানীয় সরকার ও নারীঃ

৪.৬ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নারী প্রতিনিধিত্বঃ

৪.১ ভূমিকাঃ

তৃণমূল পর্যায়ে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় একটি গুরুত্বপূর্ণ একক হচ্ছে ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য রাজনীতি হচ্ছে প্রধান মাধ্যম। কিন্তু রাজনৈতিক প্রক্রিয়া আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। বরং আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়া রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদি উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীদের সংযুক্ত করা না হয় তাহলে রাষ্ট্র বৃহৎ উৎপাদনমুখী অবদান থেকে বঞ্চিত হবে। বাংলাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রম ও পরিকল্পনা, বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালাসমূহ পর্যালোচনা করলে নারীর প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। এই অধ্যায়ে নারীর উন্নয়নে রাষ্ট্র কী ভূমিকা পালন করে তা বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রেক্ষাপটে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী ইশতেহারে নারী উন্নয়নে রাজনৈতিক দলগুলোর মনোভাব বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ ১৯৯৭ সালে ও পরবর্তী নির্বাচনগুলোর আলোকে তুলে ধরা হয়েছে।

৪.২ রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণঃ

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। সর্বমোট নারী জনসংখ্যা বেশির ভাগই গ্রামে বসবাস করে। এদের মধ্যে দরিদ্র, তালাকপ্রাপ্ত, দুঃস্থ, নির্যাতিত নারীর সংখ্যা কম নয়। স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে হলে এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ করতে হলে এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজনীতিতে নারীদের ভূমিকা পালন ও অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ সংগ্রহ, সম্পদ বিতরণ, মূল্যবোধ সৃষ্টি, জনমত সৃষ্টি ইত্যাদি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান নারী সমাজে অনগ্রসরতা, পশ্চাদপদতা ও ব্যাপক দারিদ্র্যের প্রেক্ষাপটে পরিবার ও সমাজে নারীর বৈষম্যমূলক ও অসমতার অবস্থান ও অস্তিত্বের ধারণা রাজনীতির মূল ধারায় অনুপস্থিত। সে কারণেই জনমত গঠনে এবং সমাজ ও অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর সক্রিয় ও ফলপ্রসু অংশগ্রহণ নিশ্চিত না হলে রাষ্ট্রীয় নীতিমালাই নারীর সমস্যার স্বরূপ সমাধানের বিষয়টি ও অনুপস্থিত থাকবে। আর এ কারণে রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও রাজনৈতিক দলসমূহে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু এ দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

বস্তুতঃ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বস্তরে নারীরা এত উপেক্ষার শিকার হয়েছে যে, নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়টিকে অনেকে পুরুষের স্থান বলে ভুল করেন, কিন্তু নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন নিছক স্থান দখলের স্বার্থে নয় বরং রাজনৈতিক জীবনে জেণ্ডার সমতা নিশ্চিত করাটাই এখানে মূল যৌক্তিক অবস্থান। নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে যুক্তিগুলো হলঃ

রাজনীতিতে জনগোষ্টীর অর্ধেক অংশ নারী। সমাজের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যাতিরেকে এবং ক্ষমতা কাঠামো থেকে নারীদের বাদ দিয়ে কখনো সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়না। রাজনীতিতে নারীদের প্রতিনিধিত্বহীনতা বা নূন্যতম প্রতিনিধিত্ব কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বৈধতা দান করেনা। জনসংখ্যার উভয় অংশের স্বার্থকে সমান ভাবে বিবেচনা করে নারী পুরুষ যৌথ ভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে গণতন্ত্র সত্যিকার অর্থে গতিশীলতা ও গুণগত মান অর্জন করতে সক্ষম হবে; প্রকৃতি ও জীবনের রক্ষনাবেক্ষনের ঐতিহ্যের দরুন নারীরা রাজনীতির পরিধি বিস্তৃত করার পাশাপাশি প্রচলিত রাজনীতির গতি প্রকৃতিকে আরো অনেক মানব কল্যাণমুখী করতে সক্ষম হবে; বিশ্বের মেধা, দক্ষতা, প্রতিভার অর্ধেক ভাণ্ডার সঞ্চিত আছে নারীদের কাছে। তাই এই অব্যবহৃত বা স্বল্প ব্যবহৃত মানব সম্পদের সদ্ব্যবহার গোটা মানব জাতির স্বার্থেই জরুরি; ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত রাজনৈতিক কাঠামো থেকে নারীদের বাইরে ফেলে রাখলে তা গোটা জাতীয় জীবনকে অনুন্নত করে রাখে যা কখনই সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না; রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে নারীর পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ ছাড়া কোন গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া কার্যকর হতে পারে না; নারীর সমস্যার কারণ নয় বরং সমস্যা সমাধানের যোগ্য অংশিদার।[১]

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ দলিল সংবিধানেও নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিটি নাগরিক কর্মক্ষেত্রে ও রাষ্ট্রে সমান সুযোগ পাবে এবং জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর সরব পদচারণা ক্রমবর্ধমান বাস্তবতা হয়ে উঠলেও এখনও বিশ্বজুড়ে প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক সম্পদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রন খুবই নগন্য। আজও দুনিয়ার কোথাও নারীরা একজন পুরুষের মত পরিপূর্ণ রাজনৈতিক মর্যাদা উপভোগ করে না।[২] তাছাড়া বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই জাতীয় ও স্থানীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ এখনো খুব নিম্ন পর্যায়েই রয়ে গেছে। জাতীয় সংসদ, মন্ত্রিসভা, জনপ্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ খুব কমই পরিলক্ষিত হয়।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ থেকে নারী দূরে থাকার বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে। একটি দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি ও শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। অর্থনৈতিক মুক্তি ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় আবার দেশটির রাজনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব। সেই সাথে দেশের সামগ্রিক ও পূর্ণ বিকাশ সারা বিশ্বের কল্যাণ ও শান্তির জন্য প্রয়োজন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ।[৩] কাজেই একথা বলা যায় যে, কোন দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থানের সাথে নারীদের রাজনৈতিক অবস্থানের প্রশ্নটিও জড়িত। তবে আর্থ-সামাজিক অবস্থা যাই হোক না কেন নারীদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে সারা দেশে খারাপই দেখা যায়। বরাবরই আমরা দেখেছি যে, একই পরিবেশে বসবাসরত পুরুষদের চেয়ে নারীদের অবস্থা বেশি খারাপ।[৪]

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এর ব্যাতিক্রম পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সমাজে নারীর সামাজিক অবস্থান তথা রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিষয়টি অনেকাংশে নির্ভর করে আর্থ-সামাজিক কাঠামো উপর। সমাজে নারীর সামাজিক মর্যাদা, প্রকৃত মুক্তি তথা রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য সমাজ কাঠামো অনেকটা দায়ী। তাই এই সমাজ কাঠামোর ইতিহাস আমাদের জানা প্রয়োজন। কোন সমাজে নারীর কি অবস্থা ছিল এবং কোন সমাজ কাঠামোতে নারীর সামাজিক মর্যাদা ও প্রকৃত মুক্তি পেয়ে রাজনীতিতে তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে পরিপূর্ণ মুক্ত সমাজের জীবন পেতে পারে সে বিষয়ে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হলোঃ

সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ বিজ্ঞানীরা যেভাবে মানব সমাজের ইতিহাস ও তার বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করেছেন তাতে বলা যায়, ইতিহাসের সকল স্তরে নারীর অবস্থান কখনই এক রকম ছিল না। মানুষের জীবন ধারণের জন্য, মানব সমাজের অস্তিত্বের জন্য, প্রয়োজনীয় বৈষয়িক সম্পদের উৎপাদনই সকল সামাজিক জীবনের ভিত্তি। একটি বিশেষ যুগের উৎপাদন ব্যবস্থা হচ্ছে সমাজের মূল কাঠামো, আর তার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠে একটা বিশেষ সমাজ কাঠামো। এই উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের সমাজ গড়ে উঠে।[৫]

নারী ও পুরুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদার মাত্রা নির্ধারণের জন্য জন্মলগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানব সভ্যতার ইতিহাসকে মূলত ৫টি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। আদিম সাম্যবাদি সমাজ, দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ এবং সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদী সমাজ। এই ৫টি পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন আর্থ সামাজিক

কাঠামোর সাথে নারীর অবস্থানকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব যে, সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের সাথে সাথে নারীর ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আদিম সমাজের বিবাহ পথা না থাকায় মা-ই ছিল পরিবারের প্রধান। সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। মানুষে মানুষে নারী পুরুষে কোন বৈষম্য ছিল না। তাদের সম্পর্ক ছিল সম মর্যাদার। উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সহজ। খাদ্য ছিল কাঁচা ফলমূল, কাঁচা মাংশ। পরবর্তী কালে উৎপাদনী শক্তিগুলোর পরিবর্তন বিকাশের ফলে নারী ও পুরুষের মধ্যে নতুন ধরণের শ্রমবিভাগ দেখা দিল। কৃষি কাজের আবির্ভাবের পরে সমাজে মানুষে মানুষে সম্পর্ক পরিবর্তীত হতে শুরু করল। উৎপাদনের উপকরণগুলো পুরুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হতে লাগল। এই পর্যায় থেকে পুরুষ হয়ে উঠল পরিবারের প্রধান। পরিবারের প্রধান যেহেতু পুরুষ সেহেতু সকল সম্পত্তির মালিক হল পুরুষ এবং উত্তরাধিকার পুরুষের নামে হতে থাকল। ইতিহাসে প্রথম এভাবে পরাজয় বরণ করল নারীরা।[৬] এর পর এলো দাস সমাজ। দাস সমাজে নারী হল পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের শৃংখ্যল বন্দী। দাস সমাজে মাতৃসূত্রীয় পরিবারের স্থান দখল করলেন পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। এই সময় থেকে নারীর মর্যাদা ক্ষুন্ন হতে লাগল। নারী পরিণত হল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে। আর পুরুষ শুধু পশু, সম্পদ ও জমির মালিকই হলেন না সে একই সাথে মালিক হলেন এক জন নারীরও।

দাস সমাজে নারীর অবস্থা যেমন ছিল সামন্ত সমাজে এসে তার অবস্থার তেমন উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হল না। এই সমাজে এসে শোষণ ও নির্যাতনের ধরণ কিছুটা বদলে যায়। মৌলবাদীদের দৌরাত্ম এই যুগে বৃদ্ধি পায়। ধর্মের নামে অনেক কুসংস্কার প্রবর্তিত হয়। শিক্ষার অধিকার থেকে মেয়েদেরকে বঞ্চিত করা হয়। ফলে নারী জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। হিন্দু সমাজের বিভিন্ন প্রথা যেমন সতিদাহ ইত্যাদি নারীদেরকে পুরুষের পদতলে সমর্পিত করেছিল। মুসলিম সমাজেও সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি বিধান নারীদেরকে পুরুষের অনুসংগ বলে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ফলে পিতৃতন্ত্র, শ্রম বিভাজন ও ধর্ম মিলিত ভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের নারীদেরকে শৃংখলিত করেছে ব্যাপক মাত্রায়। ঔপনিবেশক যুগে পাশ্চাত্তের উপর নৈতিক নারীবাদী ধারণার আলোকে যেসব বিধি বিধান প্রণীত হয় তা উপনিবেস-পূর্ব কালের অনেক সনাতন ধ্যান ধারণার পরিবর্তন সাধন করে নারীদেরকে সামাজ অবস্থানে অনেক সামনে নিয়ে আসে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির বাজার কেন্দ্রীকতা ভারতীয় সমাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি করে। ফলে সমাজ পরিসরে নারীরা সনাতন সমাজের অমানবিকতা হতে কোন কোন ক্ষেত্রে মুক্তি লাভ করে। কিন্তু উপনিবেশিকতা ভারতীয় সমাজে আধুনিকতার উপাদানের যোগান দিলেও ধর্মের মূল ভিত্তি এবং সামন্ত সম্পর্কের

সামাজিক শর্তগুলোকে উৎপাটিত করতে পারেনি। ফলে সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী নারী পুরুষের সম্পর্কের প্রশ্নে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টিকে থাকছে।

উপরন্ত, ঔপনিবেশিক উৎপাদন ব্যবস্থা যে শ্রম বিভাগের সূত্রপাত ঘটায় তার মধ্যেও নারীরা বঞ্চিত হয় ব্যাপক মাত্রায়। এক দিকে উৎপাদন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক আয় উপার্জন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অনুপস্থিতি, অন্যদিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক অবয়বে নারী শ্রমের সামাজিক স্বীকৃতিহীনতা নারীদেরকে মজুরী শ্রমিক হিসেবেও উৎপাদিকা শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেনি। কিন্তু উপনিবেশের আইনগত কাঠামো নারীদের জন্যে কতিপয় অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিল। ফলে উপনিবেশোত্তর যুগে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায় যদিও তা ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিসরে সীমাবদ্ধ।[৭]

পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদন কাঠামোর উপর ভিত্তি করে নারীর অবস্থান ও কর্মপরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজে এসেও নারীর অবস্থার উন্নয়ন ঘটেনি। দাস ব্যবস্থায় নারী ঘরে বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই দাসত্ব করেছে। সামন্ত সমাজে তাকে করা হয়েছে কর্মবিমুখ, অবরোধবাসিনী। পুঁজিবাদি সমাজে নারীকে কাজের অধিকার দিলেও শোষণের হাত থেকে তাকে মুক্ত করা হয়নি। নারী পুরুষের দৈহিক ভিন্নতার উপর ভিত্তি করে সামাজিক শ্রম বিভাগ করা হয়েছে। যুক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে নারী পুরুষের তুলনায় প্রকৃতিগত ভাবে দুর্বল। কিন্তু পাশ্চাত্য পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রে ভিন্নতর কাঠামোর মধ্যে ভিন্নভাবে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও নারীরা সমাজ পরিসরে পুরুষের পর্যায়ে উন্নিত হতে পারেনি। এই অধস্তনতা থেকে মুক্তির অভিপ্রায়ে বিশ্বব্যাপী গড়ে উঠেছে ব্যাপক নারীমুক্তি আন্দোলন।[৮]

১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে এবং ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনের কর্ম পরিকল্পনায় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারি পর্যায়ে নারী উন্নয়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করার সাথে সাথে দাতাসংস্থাসমূহ বিশেষ অনুদান বরাদ্দ করে নারী উন্নয়নের জন্য। আর বাংলাদেশ এসকল দেশগুলোর মধ্যে একটি।[৯]

স্বাধীনতার পর গত ৪২ বছরে শিক্ষা, জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এদেশের নারীরা জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে একটি সম্ভাবনাময় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে গ্রামীণ উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হলে কেন্দ্রীয় বাজেটে নারীর জন্য বরাদ্দের পাশাপাশি স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব স্থানীয় সরকারের হাতে দেওয়া প্রয়োজন। কারণ, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা না হলে এবং বাল্য বিবাহ ও নারী নির্যাতন বন্ধ না হলে নারীরা স্থানীয় রাজনীতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হবে না। আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। অথচ বাজেটের অতি তুচ্ছ অংশই নারীর জন্য বরাদ্দ করা হয়। কেবল মাত্র ভিজিডি, ভিজিএফ কিংবা ক্ষুদ্রঋণের মত কর্মসূচীর মাধ্যমে নারী উন্নয়ন প্রকল্প সীমাবদ্ধ রেখে নারীর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এ কারণে বাজেটে নারীর জন্য সুনির্দিষ্ট বরাদ্দের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় সরকার শক্তিশালী নয় বলে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি তাদের বাজেট বরাদ্দ দেয় না।[১০]

একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থানীয় সরকারের ইউনিয়ন পরিষদকে গঠন করার লক্ষে ১৯৯৭ সালে সংরক্ষিত আসনে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে দায়-দায়িত্ব পালনে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা বিশেষ করে নারী সদস্যদের জন্য সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ না থাকায় তাঁরা যথাযথ ভূমিকা পালনে সক্ষম হননি। ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সদস্য এবং তাঁরা তিনটি ওয়ার্ডের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন, তারপরও বাজেটে তাঁদের জন্য আলাদা কোন বরাদ্দ নেই। অথচ তাঁদের জন্যই বেশি কিংবা আলাদা বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন। একজন সাধারণ সদস্যের তুলনায় তাঁদের নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি এবং জনসংখ্যা প্রায় তিন গুণ। তাঁদের জন্য যেমন আলাদা বরাদ্দ নেই তেমনি বিভিন্ন সাধারণ প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দপ্রাপ্তির ক্ষেত্রেও তাঁরা বৈষম্যের শিকার হন। সংরক্ষিত আসনের সদস্য হওয়ায় সাধারণ সদস্যদের সঙ্গে দরকষাকষি করার সুযোগ কম, এলাকার উন্নয়নে কাজ করতে পারছেন না বলে জনগণের কাছে তাঁরা সহজ হতে পারেন না, আবার ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাঁরা প্রতিনিয়ত বৈষম্যের শিকার হন। উপরন্তু তাঁদের কাজের ও ক্ষমতার পরিধির কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থকায় তারা হতাশ ও হতোদ্যম হয়ে পড়েছেন।[১১]

জাতীয় বাজেট স্থানীয় সরকারের জন্য বাজেট বরাদ্দ এবং সুনির্দিষ্ট ভাবে নারীর জন্য বরাদ্দের বিষয়টি নারীর অর্থায়নে ক্ষমতায়নের প্রশ্নের সাথে জড়িত। বাজেটে নারীর জন্য যথাযথ বরাদ্দে না থাকলে কোন পলিসিই

নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে না। বাজেটে জাতীয় সম্পদের সুষম বন্টন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যা নারীর ক্ষমতায়নকে স্থায়ী ভিত্তির উপর দাড় করাতে সক্ষম। সারা বিশ্বেই নারীরা সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিপীড়ন ও বৈষম্যের শিকার। সমাজে সব ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক রাজনীতি উন্নয়নের ইতিহাস থেকে নারীকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। নারীকে বাধ্য করা হয়েছে কেবলই গৃহস্থালি কাজে নিয়োজিত থাকতে। যদিও নারী সমাজ, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে তারপরও এসব অবদানকে আর্থিক মানদণ্ডে বিবেচনা না করায় নারী তার অবদানের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন থেকে সবসময়ই বঞ্চিত হয়েছে। তার যাবতীয় কাজকে অ-গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান লক্ষ্যণীয়ভাবে বাড়লেও জনজীবনে তার প্রতিফলন ঘটেনি। ইদানীং বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের রপ্তানী আয়ের সাফল্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে আয়ের সাফল্য একক ভাবেই নারীর অবদান। নারী হচ্ছে পরিবর্তনের অপরিহার্য প্রভাবক। নারী এমন একজন ব্যক্তি যে নারী শুধু নিজের জন্য নয় তার পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতির মেরুদণ্ড।

স্বাধীনতা লাভের পর বর্তমান সময় পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে সেই বিষয়গুলোই বিশ্লেষণ করা হয়েছে এখানে। জাতীয় বাজেট ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলো পর্যালোচনা করলেই সরকারি পর্যায়ে নারীদের প্রতি সরকারের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে। নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকার কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং সরকারের ভবিষ্যত পরিকল্পনার পরিচয়ও আমরা এর মাধ্যমেই জানতে পারব। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট নয়টি পরিকল্পনা গৃহীত হয় এর মধ্যে ছয়টি পঞ্চবার্ষিকী ও একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা। এছাড়া দুইটি দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল প্রকল্প পত্র রয়েছে। এসব পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকার নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭১-১৯৭৮) নারীদের উন্নয়নের বিষয়টি আলাদাভাবে অনুসৃত হয়নি। শুধু যুদ্ধ কালীন সময়ে যারা নির্যাতিত এবং নিঃস্ব হয়েছিল তাদের কল্যাণ এবং পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ৫টি কর্মসূচি চিহ্নিতকরা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনা কালে কর্মসূচিগুলি বাস্তবায়িত না হয়ে পরবর্তী দুই বৎসরব্যাপী (১৯৭৮-১৯৮০) মধ্যবর্তীকালীন সময়ে আরো দুটি কর্মসূচি সহকারে মোট সাতটি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ১৯৮০ সাল নাগাদ সাতটি প্রকল্পের মধ্যে মাত্র দুটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছিল এবং এই কর্মসূচিগুলি বাস্তবায়নে মোট সম্পদের শতকরা এক ভাগেরও কম বরাদ্দ হয়েছিল।[১২] (১৯৮০-১৯৮৫) দ্বিতীয়

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী উন্নয়ন ভাবনাটি অধিকতর প্রাধান্য পায়। নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও গ্রামীণ কৃষি নির্ভর কর্মকাণ্ডে অধিক সম্পৃক্ত করনের প্রচেষ্টা নেয়া হয়। এ সময়কালে নারী-নির্যাতন অধ্যাদেশ, বাল্যবিবাহ নিরোধ, সংশোধিত অধ্যাদেশ, যৌতুক প্রথা রহিত করন আইন, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ প্রণীত হয়। এছাড়া ১৯৮৪ সালে মহিলা বিষয়ক পূর্নাঙ্গ অধিদপ্তরও প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১৩]

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে (১৯৮৫-৯০) পূর্ববর্তী পরিকল্পনাসমূহের প্রতি জোর অব্যাহত থাকে। এছাড়াও প্রাথমিক স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি জোর দেওয়া হয় এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচীকে যুক্ত করা হয় নারীদের ঋণ এবং দক্ষতা প্রশিক্ষন কর্মসূচীতে। এই সময়েই সরকারি কর্মসূচির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় মা ও শিশু সম্পর্কিত উন্নয়নমূলক ইস্যু। পতিতা পুনর্বাসন এবং নারীর আইনগত অধিকার বিষয়ে সচেনতা সৃষ্টির প্রয়াস নেয়া হয় নারী বিষয়ক মন্ত্রালয়ের তত্বাবধানে। ১৯৯০ সালে নারীবর্ষ এবং মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাইরে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নারী শিশুকে বিনা বেতনে শিক্ষার কথা ঘোষণা দেওয়া হয়।[১৪]

১৯৯০-৯৫ সালের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রথমবারের মত নারীদের উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। দেশের অর্থনীতিতে নারীদের অবদান বৃদ্ধির বিষয়টি পরিকল্পনা বিশেষভাবে বিবেচনায় আনা হয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির বিষয়টি স্বীকার করে নেওয়া হয়। এমনকি, বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের জন্য প্রথমে ৮৮০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয় যা পরবর্তীকালে সংশোধন করে ৪৫০ মিলিয়ন টাকা করা হয়।[১৫]

চতুর্থ ও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যবর্তী দু-বছর (১৯৯৫-৯৭) নারী কল্যাণের একটি জাতীয় নীতিমালা (National Policy for Women Advancement, NPWA) ঘোষিত হয় যার উদ্দেশ্য ছিল নারীর বিরুদ্ধে সকল বৈষম্য দূর করা।[১৬]

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) নারীকে উন্নয়নের মূলধারার সঙ্গে সংলগ্ন করে লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাসে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে নারী অধিকার রক্ষা করা, নারী ক্ষমতায়ন, উৎপাদনশীল খাতে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচির মাধ্যমে নারীর উপর থেকে অব্যাহত বোঝা হ্রাস করা এবং সর্বোপরি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।[১৭]

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথম নারী পুরুষ ভিত্তিক বৈষম্যের বিষয়টির অগ্রাধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়। পঞ্চবার্ষিকী ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোতে বরাদ্দকৃত সম্পদ নারী উন্নয়নের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল থাকায় নারী চাহিদা ও স্বার্থের অনুকূলে তাৎপর্যপূর্ণ কোন পরিবর্তন চোখে পড়েনি। উন্নয়ন পরিকল্পনায় একটি ব্যাপক ও সমন্বিত নারী উন্নয়ন নীতিমালার অভাবে ও বিভিন্ন সেক্টরে পর্যাপ্ত সমন্বয়ের অভাবে নারীর বাস্তব কোন অগ্রগতি সম্ভব হয়নি।

বর্তমান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প হিসেবে "বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনার রূপরেখা (২০১০-২১)" শীর্ষক পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করা হয়। প্রেক্ষিত পরিকল্পনাটি দুইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১০-১১ থেকে ২০১৪-২০১৫) অর্থবছর এবং (২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২১) অর্থবছর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। তাই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে, বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। ২০২১ সাল নাগাদ প্রবৃদ্ধির হার ১০ শতাংশে উন্নীত করা, ২০২১ সালের মধ্যে মাথাপিছু আয় ২০০০ মার্কিন ডলারে উন্নীত করা, ২০২১ সাল নাগাদ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা সাড়ে ১৩ শতাংশে নামিয়ে আনা। ২০১৪ সালের অতি নিকটবর্তী সময়ের মধ্যে বাংলাদেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করা, জেণ্ডার সমতা বজায় রেখে ২০১১-২০১২ সাল বা এর নিকটবর্তী সময়ের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে নিট ভর্তির হার শতভাগে উন্নীত করা এবং ছাত্রছাত্রীদের বিশেষত ছাত্রীদের ঝরে পড়া সমস্যা মোকাবেলার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া।[১৮] এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের জন্য তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।

বিশ্বায়নের এই যুগে নারীকে সামাজিক অর্থনীতির মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে National Strategy for Acceleratel Poverty Reduction (NSAPR-1,11) বিভিন্ন কার্যক্রম সন্নিবেশিত হয়েছে। এই কৌশল পত্রে দারিদ্র্য নির্মূলের লক্ষ্যে পাঁচটি কৌশল ব্লক চিহ্নিত করা হয়েছে, সেখানে দারিদ্র্যবান্ধব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন অন্যতম। যে পাঁচটি সহায়ক কৌশল গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সকল জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণমূলক ক্ষমতায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নারী দারিদ্র্য দূরীকরণে গৃহীত বিশেষ কার্যক্রমের মধ্যে এই কৌশলপত্রে রয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বলয়ের প্রসারের মধ্য দিয়ে হতদারিদ্র্য নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। ১৯৯৮ সালে শুরু হয় বিধবা ও দুঃস্থ নারীদের

ভাতা প্রদান কার্যক্রম। এই কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ৯ লক্ষ ২০ হাজার জন বিধবা নারীর প্রতি মাসে ৩০০ টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন। সেই সঙ্গে রয়েছে মাতৃত্বকালীন ভাতা। মোট ৮ হাজার দরিদ্র মা এই কর্মসূচির আওতায় প্রতি মাসে ৩৫০ টাকা ভাতা প্রাপ্ত হন। এছাড়াও বয়স্কভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, কার্যক্রম চলমান যা থেকে নারীরা উপকৃত হন। বিত্তহীন নারীর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (ভিজিডি)-এর আওতায় খাদ্য নিরাপত্তারূপে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার দরিদ্র নারীর মধ্যে প্রতিমাসে ৩০ কেজি চাল বা ২৫ কেজি আটা বিতরণ করা হয়। কৌশল পত্রে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান বিশেষত আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ কৃষি, কম্পিউটার ইত্যাদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সহজ শর্তে স্বল্পহারে ঋণপ্রদান, বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ আর্থিক সহায়তা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষত টেক্সটাইল, হস্তশিল্প, বয়নশিল্পের বিকাশে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে (Home Based Micro Enterprise) গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শ্রম বাজারে নারীর প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। (Rural Non Farm Activities) এর উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করার মধ্যদিয়ে নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদরূপে গড়ে তোলার বিষয়ে কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই কৌশল পত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে সরকারের দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) ও নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে কর্মকৌশল সংযুক্ত করে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) প্রণয়ন করা হয়েছে।[১৯]

এবারের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্যতম টার্গেট জেণ্ডার সমতা ক্ষমতায়ন। এবারের পরিকল্পনায় জেণ্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে নারী উন্নয়ন বিষয়ক মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে, আলাদা কোন অধ্যায় করা হয়নি।[২০]

আমাদের দেশের বাজেট জেণ্ডার সংবেদনশীল নয়। অনেক প্রত্যাশা ও প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বিভিন্ন সরকারের শাসনামলে প্রণীত বাজেটে নারীর ক্ষমতায়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে নারী ইস্যুতে খুব কমই মনযোগ দেওয়া হয়েছে।[২১]

স্থানীয় সরকারের সংরক্ষিত আসনের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিগণ নানাবিধ কারণে তাদের নির্বাচনী এলাকার নারীদের সুবিধা অসুবিধাগুলি সরকারের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হচ্ছেন না। তাদের নির্বাচনী এলাকা

পুরুষ সদস্যদের নির্বাচনী এলাকা থেকে বড়, তাদের জন্য নির্দিষ্ট কোন বাজেট নেই, তাদের কাজের সুনির্দিষ্ট কোন পরিধি নেই। এ কারণে জনগণের কাছে তারা তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করতে তথা কোন ভূমিকা বা অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছেন না।

বাংলাদেশের বিগত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলোতে নারীর জন্য বরাদ্দের বিষয়টিতে বরাবরের মত এবারও সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যরা বঞ্চিত থেকে গেছেন, বাজেটে তাদের জন্য আলাদা কোন বরাদ্দ নেই। অথচ নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি অনুযায়ী তাদের জন্য বেশি বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন ছিল। বিভিন্ন সাধারণ প্রকল্পগুলোতে নারীর অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তারা বৈষম্যের শিকার হন। এই ক্ষেত্রে পুরুষ সদস্যরাই অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন। বাজেটে স্থানীয় সরকারের নারী প্রতিনিধিদের জন্য আলাদা কোন ব্যয় বরাদ্দ না থাকায় সাধারণ জনগণের কাছে তাদের গ্রহণ যোগ্যতা যেমন কম, তেমনি তারা এলাকার কোন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত যা তাদেরকে শক্তিশালী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠায় কোন ভূমিকা পালন করতে সহায়তা করছে না। সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে অংশগ্রহণ না থাকার কারণে নারীর ক্ষমতায়ন যেমন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে তেমনি পুরুষ সদস্যদের ক্ষমতা কাঠামোয় প্রাধান্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ বেশ কিছু বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্র তৈরি করা সম্ভবপর হতো। স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে অসহায় ও প্রান্তিক নারীদের সামাজিক নিরাপত্তায় অধিকাংশ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় প্রান্তিক নারীরা সামাজিক নিরাপত্তা ও সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। সংরক্ষিত আসনের নারী প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রান্তিক অসহায় গ্রামীণ নারীর সামাজিক নিরাপত্তা ও সমস্যা সমাধান করার বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। সংরক্ষিত আসনের নির্বাচিত নারী সদস্যদের জন্য স্থানীয় বাজেটে তাঁদের দায়দায়িত্ব, ভূমিকা কিংবা বাজেট বরাদ্দ সম্পর্কে কোন সঠিক নির্দেশনা না থাকায় নির্বাচিত নারী সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদে তাদের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছেন না।

স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হলে আর্থিক ভাবে সুসংহত স্থানীয় সরকার গঠন এবং ইউনিয়ন পরিষদের জন্য যথেষ্ট পরিমান বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।একই সাথে ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের কার্যকর ভূমিকা পালনে দরকার সুর্নিদিষ্ট বাজেট বরাদ্দ এবং যথাযথ দায়িত্ব বণ্টন। কারণ, একটি শক্তিশালী স্বনির্ভর ইউনিয়র পরিষদই পারে নির্বাচিত নারীর ভূমিকা পালনের জন্য সহায়ক ও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে।

৪.৩ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালাঃ

বাংলাদেশ সরকার জাতীয় জীবনে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কতকগুলো আন্তর্জাতিক নীতি ও সনদে স্বাক্ষর করেছে। যে গুলোতে মানুষ ও নাগরিক হিসেবে নারীর সমান অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে। ১৯৯৫ সালে জাতিসংঘের উদ্দ্যোগে চীনের রাজধানী বেইজিং এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১৮৯ টি দেশের প্রায় ৩০ হাজার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সর্বসম্মত ভাবে নারী উন্নয়নের সামগ্রিক রূপরেখা হিসেবে "বেইজিং ঘোষণা ও প্লাটফরম ফর এ্যাকশন" বা সংক্ষেপে পিএফএ গৃহীত হয়। নারী উন্নয়নের বৈশ্বিক নির্দেশিকা হিসেবে এ প্লাটফরম ফর এ্যাকসনের আলোকে নিজ নিজ দেশের নারী উন্নয়ন নীতি ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালের ৮ মার্চ রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠাসহ নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত ও নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেইজিং পিএফএ এ আলোকে ১৪ দফা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করে এবং এই নীতি বাস্তবায়নে জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা প্রণীত হয়, যা নারী সমাজের জন্য একটি বড় অর্জন।[২২]

এরপর ২০০৪, ২০০৮ ও ২০১১ সালে নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা। ১৯৯৭ সালে প্রণীত প্রথম জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি মালায় উল্লেক করা হয়েছেঃ

- নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার বাস্তবায়ন,
- মেয়ে শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সাধন এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা,
- নারীর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূরীকরণ,
- সশস্ত্র সংঘর্ষ ও নারীর অবস্থান,
- শিক্ষা ও প্রশিক্ষন,
- ক্রীড়া ও সংস্কৃতি,
- জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকাণ্ডে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ,
- নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন,

- নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন,
- স্বাস্থ্য ও পুষ্টি,
- গৃহায়ন ও আশ্রয়,
- নারী ও পরিবেশ,
- নারী ও গণমাধ্যম,
- বিশেষ দূর্দশাগ্রস্থ নারী।[২৩]

১৯৯৭ সালের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়িত হলে নারীর সমমর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হত। এই নীতিতে কতকগুলো পরিবর্তন বা সংশোধনী আনা হয় যা নারীর অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

২০০৪ সালে তৎকালীন চার দলীয় বিএনপি জামায়াত জোট সরকার ১৯৯৭ সালে প্রণীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে পরিবর্তন ঘটায় ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৪ প্রণয়ন করে। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সংশোধিত আকারে প্রণীত হয় নারী উন্নয়ন নীতি। কিন্তু তার কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। আওয়ামী লীগের ২০০৮ সালের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০১১ সালে বেশ কিছু পরিবর্তন ও সংশোধন করে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে বেশ কিছু নতুন বিষয় সংযোজন করা হয়। জেণ্ডার সংবেদনশীল বাজেট এবং জেণ্ডার বিভাজিত ডাটাবেইজ বাজেট প্রণয়ন, কণ্যা শিশুকে শিক্ষা স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রদান, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন উদ্যোগ, নারী শিক্ষা বিস্তারে পদক্ষেপ গ্রহণ, নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণ, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ইত্যাদি। ১৯৯৭, ২০০৪, ২০০৮ ও ২০১১ সালের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মূল বিষয়বস্তু এবং কর্মসূচী প্রায় একই দুই চারটি শব্দ পরিবর্তন ছাড়া এই নীতিগুলোতে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন করতে হয় নাই।[২৪]

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর ১৮ নং ধারায় বলা আছে, কন্যা শিশুর উন্নয়ন ও এই সম্পর্কে আরো বলা হয়েছেঃ

১৮.১ বাল্য বিবাহ, কন্যা শিশু ধর্ষণ, নিপীড়ন, পাচারের বিরুদ্ধে আইন কাঠামো প্রয়োগ করা।

১৮.২ কন্যা শিশু চাহিদা যেমন, খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও বৃত্তিমূলোক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীন আচরণ করা ও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান।

১৮.৩ কন্যা শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যথাযথ বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা।

১৮.৪ কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং পরিবার সহ সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা নিশ্চত করা।

১৮.৫ কন্যা শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

১৮.৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন রাস্তাঘাটে কন্যা শিশুরা কোনরূপ যৌন হয়রানি, পর্নোগ্রাফী, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

১৮.৭ কন্যা শিশুর জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন বিনোদন, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুবিধা নিশ্চিত করা।

১৮.৮ প্রতিবন্ধী কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরন দূরীকরণ এবং সকল ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর ১৯ নং ধারায় নারীর প্রতি সকল নির্যাতন দূরীকরণে আরো বলা হয়েছেঃ-

১৯.১ পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি শারীরিক, মনসিক ও যৌন নিপীরণ, নারী ধর্ষণ, যৌতুক, পারিবারিক নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপসহ নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা দূর করা।

১৯.২ নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কিত সপ্রচলিত আইন যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংশোধন এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করা।

১৯.৩ নির্যাতনের শিকার নারীকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা।

১৯.৪ নারী পাচার বন্ধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন করা।

১৯.৫ নারীর প্রতি নির্যাতন দূরীকরণ এবং এক্ষেত্রে আইনে যথাযথ প্রয়োগের জন্য বিচার ব্যবস্থায় পুলিশ বাহিনীর সর্বস্তরে বর্ধিতহারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

১৯.৬ বিচার বিভাগ ও পুলিশ বিভাগকে নারীর অধিকার সংশ্লিষ্ট আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া ও জেণ্ডার সংবেদনশীল করা।

১৯.৭ নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতন ও পাচার সম্পর্কীয় অপরাধের বিচার ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পন্ন করার লক্ষ্যে বিচার পদ্ধতি সহজতর করা।

১৯.৮ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিভাগীয় শহরে ওয়ান-স্টপ ক্রইসিস সেন্টার (ওসিসি) ও মহিলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা এবং ওসিসির কার্যক্রম জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। নির্যাতনের শিকার নারীদের মানসিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।

১৯.৯ নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সমাজের সকল পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যাপক সচেনতা গড়ে তোলা এবং পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা পরিবর্তনের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১৯.১০ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গণমাধ্যমে ব্যাপক জনসচেনতা সৃষ্টি করা।

১৯.১১ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গণসচেনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পুরুষ ও যুবকদেরকে সম্পৃক্ত করা।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর ২১ নং ধারায় নারীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে যা বলা হয়েছেঃ

২১.১ নারী শিক্ষা বৃদ্ধি, নারী পুরুষের মধ্যে শিক্ষর হার সুযোগের বৈষম্য দূর করা এবং উন্নয়ন মূলোক ধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষা নীতি ২০১০ অনুসরণ করা।

২১.২ নারীর নিরক্ষতা দূর করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, বিশেষত কন্যা শিশু ও নারী সমাজকে কারিগরি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ সকল বিষয়ে শিক্ষক ও প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা।

২১.৩ কন্যা শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রাখা।

২১.৪ মেয়েদের জন্য স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর ২৪ নং ধারায় বলা আছে, নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণের বিভিন্ন বিষয়ঃ

২৪.১ হতদরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের অন্তর্ভুক্ত করা, বিধবা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রণয়ন, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রণয়ন ও বিত্তহীন মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচী (ভিজিডি) অব্যাহত রাখা।

২৪.২ দরিদ্র্য নারী শ্রম শক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি কল্পে তাদের সংগঠিত করা ও প্রশিক্ষণ প্রদাণের মাধ্যমে নতুন এবং বিকল্প অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সৃষ্টি করা।

২৪.৩ দরিদ্র্য নারীকে উৎপাদনশীল কর্মে এবং অর্থনৈতিক মূলধারায় সম্পৃক্ত করা।

২৪.৪ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ নারীর সকল চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।

২৪.৫ জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা দান ও অনুপ্রাণিত করা।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর ২৭ নং ধারায় জেণ্ডার সংবেদনশীল বাজেট এবং জেণ্ডার বিভাজিত ডাটাবেজ প্রণয়ন সম্পর্কে বলা আছে যেঃ

২৭.১ নারী উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেণ্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

২৭.২ জেণ্ডার সংবেদনশীল বাজেট যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করা এবং মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় তথা রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেণ্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রক্রিয়া (Gender Responsive Budgeting, GRB) অনুসরণ অব্যাহত রাখা। বাজেটকৃত অর্থের সর্বত্তম ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন ও পরিক্ষণ করার কাঠামো শক্তিশালী করা।

২৭.৩ জেণ্ডার ভিত্তিক পৃথক তথ্য/ উপাত্ত সংগ্রহ, সন্নিবেশ এবং নিয়মিত প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা কেন্দ্র, ব্যুরো আব স্ট্যাটিসটিকস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহকারী অঙ্গসমূহ নারীর অবস্থান ও ভূমিকা সংবলিত জেণ্ডার বিভাজিত ডাটাবেইজ গড়ে তুলবে। সংশ্লিষ্ট সকল

মন্ত্রণালয়/দফতর, কর্পোরেশন, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সকল কাজের জন্য জেণ্ডার ভিত্তিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রকাশনার ব্যবস্থা করবে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর ৩২ নং ধারায় বলা আছে, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও অন্য বিষয়ঃ

৩২.১ রাজনীতিতে অধিকহারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্যে প্রচার মাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

৩২.২ নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগে এবং সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

৩২.৩ রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে পর্যায়ক্রমে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধি নিশ্চিত করা।

৩২.৪ নির্বাচনে অধিকহারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা।

৩২.৫ নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করা এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

৩২.৬ রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনসহ বেসরকারী প্রতিষ্ঠনসমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

৩২.৭ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নিত করা ও বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩২.৮ স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সকল পর্যায়ে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

৩২.৯ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উচ্চ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ করা।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী সমাজের বৈষম্য কমিয়ে আনা সম্ভব। তৃণমূল পর্যায়ে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ এর সঠিক বাস্তবায়নের জন্য দরকার সংরক্ষিত আসনের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকা পালন। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের এসব বিষয়ে সম্পৃক্ত করে নারী

নির্যাতন প্রতিরোধ, কন্যা শিশু শিক্ষা নিশ্চিত করণ, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ, নারী দারিদ্র্য দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করে নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা সম্ভব। তৃণমূল পর্যায়ে এই নীতি বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা ভূমিকা পালন করতে সক্ষম এবং এ ব্যাপারে সরকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী।

৪.৪ ইউনিয়ন পরিষদ ও নারীর ক্ষমতায়নঃ

নারীর ক্ষমতায়ন উন্নয়নের পূর্ব শর্ত। কারণ ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারী তার নিজের অবস্থান, সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে সজাগ হবে, বিদ্যমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের প্রতি সোচ্চার হবে এবং সর্বোপরি আপন শক্তিতে বলীয়ান হবে। সকল বৈষম্য দূর করে নারী পুরুষ সমতার লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবে। তাছাড়া, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীকে সম্পৃক্তকরণের মূল হাতিয়ার তার ক্ষমতায়ন। এ ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার লক্ষ্য প্রকৃত অর্থে নারী পুরুষ উভয়েই। "জনগোষ্টীর অর্ধেকাংশকে পিছিয়ে রেখে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নারীদের মধ্যে ৬০ ভাগ লোক নিরক্ষর থাকলে, অপর দিকে পুরুষদের মধ্যে ১০০ ভাগ শিক্ষিত থাকলেও দেশের প্রায় ৪০ ভাগ লোক নিরক্ষর থেকেই যাবে। উপরন্তু নারীদের মধ্যে নিরক্ষতা, পুষ্টিহীনতা থাকলে শুধুমাত্র নারী জনগোষ্ঠী নিরক্ষর বা পুষ্টিহীন থাকবে না। যেমন একজন পুষ্টিহীন ও অসুস্থ মায়ের গর্ভজাত সন্তান পুষ্টিহীন ও স্বাস্থ্যহীন হয় যার জন্য বলা যায় একজন পুষ্টিহীন, অসুস্থ, নিরক্ষর মা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের তিন গুণ পুষ্টিহীন, অসুস্থ্য ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠী সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বুঝতে হবে উন্নয়নের জন্য নারীর অবস্থা এবং অবস্থানের পরিবর্তন প্রয়োজন, নারীদের ক্ষমতায়ন প্রয়োজন।

ক্ষমতায়ন সবচেয়ে সাম্পতিক এ্যাপ্রোচের। সমদর্শী এ্যাপ্রোচের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় বিশ্বের নারীবাদী সাহিত্য ও তৃণমূল সংগঠনের অভিজ্ঞতা থেকে এর উদ্ভব ঘটেছে ১৯৭৫ সালের পরবর্তী সময়ে। ক্ষমতায়ন এ্যাপ্রোচ মূলত নিজেদের জীবনের উপর নারীদের নিয়ন্ত্রন বৃদ্ধির উপর আলোকপাত করে। এর লক্ষ্য হল ব্যাপক আত্মনির্ভরশীলতা আইনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন। নারীরা নিজেরাই নিজেদের উন্নয়নের চালিকা শক্তি হবে। পুরুষের সাহায্য সহযোগিতা এখানে কাম্য নয়।[২৫]

ক্ষমতায়ন এ্যাপ্রোচের সবচেয়ে ভাল দৃষ্ঠান্ত ডন (Development Alternative with Women For a New Era-সংক্ষেপে DAWN), যা ১৯৮৫ সালে ভরতের ব্যাঙ্গালোরে প্রথম গড়ে ওঠে এবং পরবর্তীতে সমগ্র তৃতীয় বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। "Women, Development and Empowerment "এ Vanessa Griffen (1987) নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে বলেন, Empowerment means:

- Having control or gaining further control;
- Having a say and being listened to;
- Being able to define and create from a women's perspective;
- Being able to influence social choices and decisions affecting the whole society (not just areas of society accepted as women's place);
- Being recognized and respected as equal citizens and human being with a contribution all level of society and not just in the home power also mean having women's contribution recognized and valued.[২৬]

আন্তর্জাতিক নারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান International Research and Training Institute for the Advancement of Women (1995) তাদের Gender concepts in Development Planning এ ক্ষমতায়নের সংজ্ঞায় বলেন, Empolerment is the process of generating and building capabilities to exercise control over our's own life. Women's empowerment is a model of gemder analysis that traces women's increasing equality by empowering through five places, welfare, access, conscientisation, participation and control.[২৭]

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল কথাই হলো, সরকারি ক্ষমতার বৈধতার উৎস জনগণের সম্মতি। ফলে সত্যিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের জন্য প্রয়োজন সকল নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ, শুধুমাত্র গোষ্ঠী বিশেষের নয়। সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থায় সর্বাধিক জনগোষ্ঠীর মতামত, আশা আকাঙ্খা ও অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। নারীরা আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক। তাই নামমাত্র অংশগ্রহণ বা উল্লেখযোগ্য নারী প্রতিনিধিত্বহীন শাসন কাঠামোকে কোনভাবেই গণতান্ত্রিক বলা যুক্তিযুক্ত হবে না। এ কারণেই

আমাদের সংবিধানে [১০, ১৯(১) ও ২৮(২)] ধারায় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়ে জোরালো অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে।[২৮]

ক্ষমতায়ন হল বস্তুগত, মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের উপর ব্যক্তির নিয়ন্ত্রনের দক্ষতা। এই সম্পদকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। বস্তুগত সম্পদ (ভূমি, পানি, বন), মানবিক সম্পদ (মানুষ, তার দেহ, শ্রম, দক্ষতা), বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (জ্ঞান, তথ্য, তথ্য অভিজ্ঞতা, ধারণা), আর্থিক সম্পদ (অর্থ, অর্থে অভিগম্যতা), সামাজিক সম্পদ (সামাজিক সম্পদ, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি বিশ্বাস, পারস্পরিক আস্থা)।[২৯]

"নারীর ক্ষমতায়নের ফলাফল সুদূরপ্রসারী। নারী ক্ষমতায়িত হলে তার সুফল শুধু যে নিজেই ভোগ করেনা, তার পরিবার, সমাজ, এমনকি পুরো জাতি এ থেকে উপকৃত হয়ে। যেমন, আত্মশক্তিতে বলীয়ান নারী সফল হতে বাধ্য। যে দিকেই সে নিবিষ্টতা প্রদর্শন করুক, সেখানেই তার সাফল্য নিশ্চিত। একজন সফল নারী তার পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য বোঝা না হয়ে সম্পদে পরিণত হয়।[৩০]

নারীর ক্ষমতায়নে রাজনৈতিক দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের নির্দেশক হল ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিত্বশীল কাঠামোয় স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ। The United Nations Development Program এর রিপোর্ট অনুযায়ী, জেণ্ডার ক্ষমতায়নকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পেশাগত- এই তিন দিক থেকে পরিমাপ করা যায়। এসব ক্ষেত্রে নারী কতটা অগগতি অর্জন করেছে তার উপর নির্ভর করে, সে কতটা ক্ষমতার অধিকারী। এক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের পাঁচটি স্তর নির্দেশ করা হয়েছেঃ নিয়ন্ত্রণ, অংশগ্রহণ, নারী জাগরণ, সম্পদ আহরণ ও নিয়ন্ত্রণের অবাধ সুযোগ বা অধিকার এবং কল্যাণ।[৩১]

ক্ষমতায়ন হচ্ছে মানুষের সেই অধিকার অর্জিত হওয়া যার দ্বারা নিজের জীবনের পাশাপাশি সমাজ-পরিপার্শ্বের ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব হয়। শুধু ক্ষমতা থাকা নয়, দরকার ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার, শুধু উঁচু পদে আসীন হওয়া নয়, দরকার পদের উপর নিয়ন্ত্রণ অর্থ্যাৎ পদাধিকারীর সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ, শুধু সম্পদ থাকা নয়, দরকার সম্পদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। ক্ষমতার সঙ্গে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার অর্জিত হওয়া অর্থাৎ ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন একটি বিষয় যার দ্বারা মানুষ তার নিজের শরীর, মন ও কাজের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।[৩২]

অন্যান্য পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর মতো বর্তমান বাংলাদেশের নারীদের অবস্থান প্রান্তিক। যুগ যুগ ধরে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর ভূমিকা পুরুষদের দ্বারা নির্ধারিত হতো এবং সেটা আবার মানুষের তৈরি কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় নিজেদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল।

১৯৭৬ সালে ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর ক্ষমতায়নের প্রথম ধাপ রচিত হয়। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে দুটি করে নারী সদস্যপদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে নারীর জন্য ৩ টি করে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু উভয় আইনেই সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্যরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হত না বরং তারা ইউনিয়ন পরিষদ দ্বারা মনোনীত হত। ১৯৮৩ সালের পরে স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৯৭ সালের গৃহীত The Local Government (Union Parishad) Second Amendment Act, ১৯৯৭.[৩৩]

ইউনিয়ন পরিষদ যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে তার সকল ক্ষেত্রে নারীদের যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করা উচিত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা নির্দিষ্ট কোন দায়িত্ব পাননি, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তারা উপেক্ষিত ও বঞ্চিত হচ্ছেন। ইউনিয়ন পরিষদে নারী অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিতে সরকার যেমন পদক্ষেপ নিয়েছে তা সত্যিকার অর্থে নারীর ক্ষমতায়নে কতটুকু ভূমিকা পালনে সক্ষম সে বিষয়ে কিছুটা বিশ্লেষণ করা হলোঃ

১৯৯৭ সালের পূর্বে অর্থ্যাৎ ১৯৭৬ ও ১৯৮৩ সালে নারী সদস্যদের জন্য যথাক্রমে ২টি ৩টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল, বাস্তবে তা ছিল কাগজে কলমে। সাধারণত চেয়ারম্যান ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের আত্মীয় স্বজনই এ সংরক্ষিত আসনের জন্য মনোনীত হতেন। এই প্রতিনিধিদের কোন সক্রিয় ভূমিকাই ছিল না। নারী সদস্যরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকাই পালন করতো না। উপরন্তু গ্রমীণ সমাজে নারী নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে নারী সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদের নিয়মিত কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করত না। চেয়ারম্যান এবং তার পরিষদের সিদ্ধান্তে অবশ্যম্ভাবীভাবেই নারী সদস্য ইতিবাচক মতামত দিত বা স্বাক্ষর করত। বাস্তবিক ক্ষেত্রে এটি ছিল নারী প্রতিনিধিত্বের নামে সমাজে সুবিধাভোগী নারীদের জন্য বর্ধিত সুবিধার ব্যবস্থা মাত্র। সেক্ষেত্রে ১৯৯৭ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ আইন ছিল একটি পদক্ষেপ।[৩৪]

সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণের মাত্রা নারীর ক্ষমতায়নের পরিচায়ক। ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনে ১২,৮২৮ জন নারী নির্বাচিত হওয়া ছাড়াও ১১০ জন নারী সাধারণ সদস্য নির্বাচিত হওয়ায়, বাংলাদেশে সেই সময় নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়। স্থানীয় সরকার পরিচালনায় নারীর অংশগ্রহণের এই সাফল্যের জন্য তৎকালীন সরকার দেশে বিদেশে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইউনিয়ন পরিষদে নারী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে তা ক্ষমতায়নে কতটুকু সহায়ক হয়েছে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে দেখা যায় নির্বাচন পরবর্তী পর্যায়ে জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত নারী সদস্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ কারীগণ অভিযোগ করেছে যে, তারা সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারছেন না। পুরুষ সদস্য ও চেয়ারম্যানগণ তাদেরকে ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নমূলোক কাজে উপেক্ষা ও অসহযোগিতা করছে।[৩৫] যার পরোক্ষ ফলস্বরূপ তৃর্ণমূলের নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। পরবর্তীতে ২০০৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণে নেতিবাচক প্রবণতার প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থ্যাৎ ১৯৯৭ সালের থেকে ২০০৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনে নারীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। ২০০৩ সালে ১২,০০০ এরও বেশি সংরক্ষিত আসনে নারীদের অংশগ্রহণের, ১৯৯৭ সালের তুলনায় ১২%- এরও বেশি কমে গেছে। আরও দেখা গেছে বিভিন্ন ধরণের নেতিবাচক অভিজ্ঞতার কারণে পুনঃনির্বাচনের আগ্রহও ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯৭ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত ৪০ শতাংশের অধিক নারী সদস্য ২০০৩ সালের নির্বাচনে পুনরায় অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদে নারী বিরোধী পরিবেশ এবং সহায়ক পদ্ধতি ও কাঠামো গত দুর্বলতা। এটা স্পষ্টতই ইঙ্গিত করে যে স্থানীয় সরকারে নারী সদস্যদের অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত।[৩৬] তারপরও যতই দিন যাচ্ছে দেশের নারী সমাজ সবদিক থেকে ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছে।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাগণ ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তা কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যার ফলে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ে (MOWCA) Parliamentary Standing Committee) সৃষ্টি করা হয়েছে, যার একটি প্রধান কাজ হলো নারীর বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা চিহ্নিত করা এবং সেইমতে বাজেটিয় পদক্ষেপ সুপারিশ করা। তাছাড়া, দেশের প্রধানমন্ত্রীকে শীর্ষে রেখে National Council for Women Development (NCWD) শীর্ষক একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন

করা হয়েছে যার প্রধান কাজ হলো বিভিন্ন মন্ত্রনালয় ও সংস্থার নারী উন্নয়ন সম্পর্কীয় কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন কর্মকাণ্ডে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নীতি প্রণয়নের জন্যও এই কমিটি দায়িত্বপ্রাপ্ত।[৩৭]

দেশের নারীরা প্রতিটি আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে স্বল্প প্রতিনিধিত্বকারী এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণে উপেক্ষিত। বাংলাদেশ সিডও এবং বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন বা এমডিজির মতো আন্তর্জাতিক ঘোষণায় স্বাক্ষরকারী দেশ, যেগুলোতে নারীর ক্ষমতায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু এগুলো পুরোপুরি মানা হচ্ছে না যার ফলে ক্ষমতায়ন কাঠামোতে নারীর উপস্থিতি বিশ্বজুড়ে এখনও কম। দীর্ঘকাল ধরে চলমান নারী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে বর্তমানে নারীর জন্য কিছু অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। দেশের অর্থনীতিতে নারীর অবদান আজ অনস্বীকার্য। এমন কোন ক্ষেত্র নাই যেখানে নারী তার শ্রম ও মেধার স্বাক্ষর রাখছে না। বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে তিনটি খাতকে নারীদের অবদানে সমৃদ্ধবলে স্বীকার করা হতো। ১.পোশাক শিল্প, ২.জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও ৩.ভোট প্রদান।" পোশাকশিল্পে নারীদের অবদানের কারণের বড় অংশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। জন্মনিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাটি কার্যকর রাখার জন্য নারী শারীরিক ঝুঁকি বহন করে বেশি এবং ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে নারী অনেক বেশি সক্রিয়। কোন কোন এলাকায় মৌলবাদী গোষ্ঠীর ফতোয়া দান সত্ত্বেও নারীরা সেসব কিছু উপেক্ষা করে ভোটকেন্দ্রে যায়। তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনে নারীরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় নির্বারিত হয়েছেন নিঃসন্দেহে এটি একটি বড় ধরণের উদ্যোগ। দেশের স্থানীয় পর্যায়ের এই কাঠামোটি ধরে রাখে নারী, যতই দিন যাচ্ছে দেশের নারী সমাজ ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছে সবদিক থেকে যাদের অধিকাংশই নিরক্ষর। এইসব নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্য অর্জনে পরিবার সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সর্বত্র সমানভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে যেন তৃণমূল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর মর্যাদা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে অধিষ্ঠিত হতে পারে। স্থানীয় সরকার কাঠামোর এই স্তরের (ইউনিয়ন পরিষদ) সাথেই জনগণের সবচেয়ে সম্পর্ক রয়েছে। গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতা কাঠামোয় অবস্থানরত একজন নারীর সাথে তাদের প্রয়োজন ও অবস্থা সম্পর্কে মত বিনিময়ের সবচেয়ে ভাল সম্ভাবনা তৈরি করা সম্ভব। ইউনিয়ন পরিষদে পুরুষ আধিপত্য এতদিন বিরাজমান ছিল। গ্রামীণ নারী হিসেবে নারীরা গ্রামীণ নারীদের প্রয়োজন ও অবস্থানের কথা সবচেয়ে ভাল বুঝতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত নারীরা ক্ষমতা পেলে নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ অগ্রগতি অর্জিত হবে।

৪.৫ রাজনৈতিক দলের ঘোষণাপত্র ও নির্বাচনী ইশতেহারে স্থানীয় সরকার ও নারীঃ

এদেশের অর্ধেক নাগরিক নারী। স্থানীয় সরকার পরিচালনায় নারী ও পুরুষ উভয়েরই সমান অংশগ্রহণ করা উচিত। বর্তমান বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো পুরুষতন্ত্রের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে। রাষ্ট্র নানাভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের স্বার্থকে টিকিয়ে রাখছে। রাষ্ট্রক্ষমতায় নারীর অংশগ্রহণ যত বৃদ্ধি পাবে নারী ও পুরুষদের মধ্যে বৈষম্যমূলক অবস্থার তত অবসান ঘটবে। এ কারণেই রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। শুধু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ভোট প্রদান করা এবং কয়েকটি আসনে বিজয় লাভ করলেই রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বা ক্ষমতায়ন সম্ভব হয় না। রাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন অনেক বেশি ব্যাপক। আর সে কারণেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী অঙ্গীকারের সঙ্গে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। নারী পুরুষের সমতার বিষয়টি যারা আদর্শগত ভাবে বিশ্বাস করেন না। সে ধরণের উগ্র ধর্মীয় রাজনৈতিক দল ছাড়া দেশে সক্রিয় অন্যসব রাজনৈতিক দলের ঘোষণা পত্রে নারী বিষয়টি একেবারেই উল্লেখ নেই তা বলা যাবেনা। তাতে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দলিলের প্রতি সরকারের অঙ্গীকার এবং বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক দলগুলোর ঘোষণা অনুযায়ী নারী এবং তাদের ইস্যুসমূহ রাজনৈতিক দলের ঘোষণাপত্র, নির্বাচনী ইশতেহারে এবং গঠনতন্ত্রে যতটা গুরুত্ব সহকারে প্রাধান্য পাওয়ার কথা ছিল তা আমরা এখনও দেখতে পাই না।[৩৮]

আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী ইশতেহার কিংবা দলীয় নীতি নির্ধারণীমূলক কোন পুস্তক-পুস্তিকায় স্থানীয় সরকারের কাঠামো, কর্মকাণ্ড, ভূমিকা ইত্যাদি সম্পর্কে স্বচ্ছ কোন রূপরেখা পাওয়া যায়নি। সাধারণত যা দেখা যায় তা হচ্ছে কোন ইস্যু বা বিষয়ের ওপর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। কোন কোন সময় সে প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তিতে স্ববিরোধিতা ও পূর্বাপর বক্তব্যের অসামঞ্জস্যতা দৃষ্টিকটু ভাবে লক্ষণীয়। যেমন ১৯৮৩-৮৭ পর্যন্ত যুগপৎভাবে তৎকালীন সময়ে আন্দোলনকারী জোট ও দলসমূহের একদিকে উপজেলা নির্বাচন বয়কট ও প্রকাশ্যে উপজেলা পদ্ধতির বিরোধিতা, অপরদিকে ব্যক্তিগতভাবে সে দলসমূহের নেতা ও কর্মীগণের উপজেলা নির্বাচনে ব্যাপক অংশগ্রহণ দল-জোট সমূহের নীতি ও আচরণের অসামঞ্জস্যতাকে তুলে ধরে। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালের উপজেলা পরিষদ বাতিলের পর, একই ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পূর্বে যারা (১৯৮৩-৮৭ সাল পর্যন্ত) উপজেলা পরিষদ বিরোধী ভূমিকা পালন করেছে তাদেরকে পুনরায় পরিষদ বাতিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠতে দেখা গেছে। তেমন ভাবে সরকার ও সরকারিদলও কোন বিকল্প সৃষ্টির

পূর্বে ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে পরিষদ বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এভাবে সরকার ও বিরোধী দল সবার মধ্যে এক ধরণের তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহণের জন্যে অস্থির হয়ে উঠার মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা গেছে যা দেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ভূমিকা সম্পর্কে সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের চিন্তা ও মননশীলতার দৈন্যকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে ।[৩৯]

বিগত আওয়ামী লীগ সরকার "দিন বদলের" অঙ্গীকার নিয়ে ক্ষমতায় আসে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহারের ২৩ টি অগ্রাধিকারের মধ্যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও কার্যকর করাকে অগ্রাধিকার হিসেবে ঘোষণা হরে। আর দারিদ্র্য ঘোচানো ও বৈষম্য কমানো এবং কৃষি ও পল্লী জীবনে গতিশীলতা অর্জন পাঁচটি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। শেষোক্ত অগ্রাধিকারদ্বয় অর্জনের জন্য প্রয়োজন ছিল বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে কার্যকরকরণ।[৪০]

এটি স্পষ্ট যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করার পক্ষে সাংবিধানিক অঙ্গীকার, নির্বাচনী ওয়াদা ও অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধি থাকা সত্ত্বেও, বিগত সরকারের আমলে অতীতের মতো এগুলোকে অকার্যকর করেই রাখা হয়েছে। এর ফলে তৃণমূলের জনগণকে সেবা প্রদান, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কাঙ্খিত সাফল্য অর্জিত হয়নি।[৪১]

এই প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের কমিটিগুলো, রাজনৈতিক দলের ঘোষণাপত্র ও নির্বাচনী ইশতেহারে নারীদের অবস্থানের বর্তমান চিত্র তুলে ধরা হল।

রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর স্থায়ী এবং নির্বাহী কমিটিতেও লক্ষ করা যায় নারী স্বল্পতা। ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পুরুষরাই প্রাধান্য বিস্তার করছেন। ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একমাত্র বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ছাড়া আওয়ামী লীগ/ বিএনপি, জাতীয় পার্টিও নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদে নারী আসন বৃদ্ধি ও বর্ধিত আসনের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের অঙ্গীকার ঘোষিত হয়নি। পরবর্তী ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনী ইশতেহারে ২০০১ এ আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও ১১ দলীয় জোট সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়, "জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা দ্বিগুণ

অর্থাৎ ৬০ টি করা হবে। জাতীয় সংসদে প্রতি পাঁচটি সাধারণ আসন নিয়ে একটি সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচনী এলাকা গঠিত হবে এবং সরাসরি নির্বাচন হবে।"

আর বিএনপি তার নির্বাচনী ইশতেহারে নারী সমাজ অংশে ঘোষণা করেন যে, "সংসদে নারীদের কার্যকর ভূমিকা পালন ও ক্ষমতায়নের জন্য তাদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে এবং মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

অন্যদিকে জাতীয় পার্টি ও জামায়াত তাদের ইশতেহারে সংসদে নারী আসন সংখ্যা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করলেও নারী আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিষয়ে কোন স্পষ্ট অঙ্গীকার ঘোষণা করেনি। তবে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে তাদের ইশতেহারে প্রাধান্য দিলেও নারীদের মনোনয়ন দানের ক্ষেত্রে সে আন্তরিকতা প্রদর্শন করেনি। বিএনপি ও চার দলীয় জোট মাত্র ৬ জন ও আওয়ামী লীগ মাত্র ১১ জন নারীকে মনোনয়ন দিয়েছে। অথচ এবারই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নারী সাধারণ আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশা করেছিল। আর এভাবেই দুঃখজনকভাবে জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব কমে গেল। ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও যেখানে সকল দল থেকে ৩৬ জন নারী মনোনয়ন পেয়েছিলেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এদের মধ্যে ৮ জন নির্বাচিত হয়েছিলেন। অথচ ৮ম জাতীয় সংসদে ৩৮ জন মনোনয়ন লাভকারী নারী মাত্র ৬ জন বিজয়ী হয়ে জাতীয় সংসদে আসতে পেরেছেন।

বাংলাদেশের নবম সংসদীয় নির্বাচনে নারীরা পুরুষের চাইতে বেশি সংখ্যায় তাদের ভোট প্রদান করেছেন। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সেক্রেটারিয়েট হতে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পুরুষের চাইতে ১৪,১৩,৬০০ জন নারী ভোটার বেশি ছিল। রাজনৈতিক দলগুলোর মিছিল ও সমাবেশগুলোতেও তাদের উপস্থিতি দৃশ্যমান ছিল। প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা চালাতেও তাদেরকে দেখা গেছে। অবশ্য রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ লাভ করা কিংবা নির্বাচনে লড়বার জন্য দলের প্রার্থিতা লাভ করার ব্যাপারে তারা অতি সামান্য ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মোট ৫২ জন নারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন পেয়েছিলেন, যা মোট মনোয়নপত্রের মাত্র ৫.৭ শতাংশ। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে বিভিন্ন দল কর্তৃক মনোনীত নারী প্রার্থীর সংখ্যা নিচে সারণির মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।[৪২]

সারণিঃ ৪.১ ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে বিভিন্ন দল কর্তৃক মনোনীত নারী প্রার্থীর সংখ্যাঃ

রাজনৈতিক দলের নাম	মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা	নারী সংখ্যা	মোট মনোনীত প্রার্থীর মধ্যে নারীর অংশগ্রহণ
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৫৯	১৭	৭.৩৪
বাংলাদেশ জাতীয়তা বাদী দল	২৫৬	১৩	৫.৮৬
জাতীয় পার্টি	৪৬	৩	৬.৫৩
জাতীয় আওয়ামী পার্টি	৫	১	২০.০০
বাংলাদেশ কমুনিষ্ঠ পার্টি	৩৭	২	৫.৪১
অন্যান্য রাজনৈতিক দল	২৮৯	১৪	৪.৮৪
স্বতন্ত্র	১৪১	৭	৪.৯৬
মোট সংখ্যা	৯৯৬	৫৭	৫.৭২

উৎসঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সেক্রেটারিয়েট।

সারণিতে হতে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল , যে দু'টি দল সবচাইতে বেশি সময় রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে , সেই দুইটি দলে বেশি সংখ্যক নারীকে মনোনয়ন দেয়নি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সবচাইতে পুরানো রাজনৈতিক দল। এই দলের জন্মলগ্ন থেকেই নারীরা সম্পৃক্ত আছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এই দলের নারীদের অবদান নথিভুক্ত আছে। তার পরও তাদের মোট মনোনীত প্রার্থীদের মাত্র ৭.৩৪ শতাংশ ক্ষেত্রে নারীকে মনোনয়ন দিয়েছে। বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি উদার ও প্রগতিবাদী দল হিসেবে পরিচিত। এই পার্টিও নারীদের মনোনয়ন দিতে কার্পন্য করেছে। এখানে এটা স্পষ্ট যে, নারীর

রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জন না করার পেছনে নারীকে মনোনয়ন প্রদানে রাজনৈতিক দলগুলোর অনীহা একটি বড় কারণ। তবে সারণিতে একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো ৭ জন নারী স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার তথ্যটি। এই তথ্যটি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করছে, নারীকে অবলা হিসেবে যে সমাজ চিহ্নিত করে সে সমাজে অনেক নারী স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে লড়ার ক্ষমতা অর্জন করেছেন।[৪৩] আমাদের দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটিতে নারীদের অবস্থান একেবারে কম। শুধু শীর্ষ পদে দু'জন নারীকে আমরা কয়েক দশক ধরে দেখতে পাচ্ছি।

৪.৬ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নারী প্রতিনিধিত্বঃ

উপমহাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এই ক্রমবিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বৃটিশ ভারতে নারীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের কোন সুয়োগ ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে চারটি মাত্র দেশ ছিল যেখানে নারীর ভোটাধিকার ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও বহু দিন পর্যন্ত নারীর ভোটাধিকার ছিল না। উনিশ শতকের শেষের দিকে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে নারীর ভোটাধিকারের দাবি দানা বেঁধে ওঠে। ১৮৯০ সালে আমেরিকায় National American Women Suffrage Association গঠিত হয়। ১৮৯৭ সালে ইংল্যান্ডে National Union of Women's Suffarage Societies গঠিত হয়। কিন্তু ভোটাধিকার পেতে নারী সমাজকে আরো অনেক বছর আন্দোলন করতে হয়েছিল। অবশেষে আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও জার্মানির নারীরা প্রথম মহাযুদ্ধের পর এবং ফ্রান্সের নারীরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভোটাধিকার লাভ করে। এভাবে ধীরে ধীরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নারীরাও ভোটাধিকার পেতে থাকে। ভারতবর্ষে ১৯১৭ সালে নারী ভোটের অধিকারের জন্য দাবি জানায়। এর আগে নারীর ভোটের অধিকার ছিল না। বৃটিশ শাসনামলে দেশকে সাম্রাজ্যবাদের শৃংখল থেকে মুক্ত করার জন্য অনেক নারী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে সরোজিনী নাইডু, লীলানাগ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, বেগম রোকেয়া, সরলা দেবী চৌধুরাণী ও অন্যান্যরা উল্লেখযোগ্য।

১৯১৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে একটি নারী প্রতিনিধিদল তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ড ও ভারত সচিব মন্টেগুর কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন, যার উল্লেখযোগ্য দিক হলঃ

- নারীদের শিক্ষা;
- নারীদের স্বাস্থ্য;
- মাতৃমঙ্গলের উন্নয়ন ব্যবস্থা; এবং
- পুরুষের সাথে একই সাথে ভোটাধিকার।

১৯১৭ সালে এ্যানি বেসান্তের নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসে নারীদের পক্ষে প্রস্তাব পেশ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, "স্ত্রীজাতি বলেই তাদের প্রতি কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করা উচিত নয়। একই ভিত্তিতে নারী ও পুরুষ উভয়কেই ভোটাধিকার ও নির্বাচিত হবার অধিকার দিতে হবে।" ১৯১৯ সালে সরোজিনী নাইডু এবং এ্যানি বেসান্ত সাউথ বরো কমিশনের কাছে ভোটাধিকার সংক্রান্ত দাবি উত্থাপন করেন। বার বার দাবি উত্থাপন করার পরও ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টের কোথাও নারীর ভোটাধিকারের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়নি। ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় আইন সভায় আনিত নারীর ভোটের অনুমোদন প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। ১৯২১ সালে ভোটাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে 'বঙ্গীয় নারী সমাজ' গঠিত হয়। এই সংগঠনটি নারী সমাজকে তাদের অধিকার আদায়ে একই প্লাটফর্মে সংগঠিত হতে সাহায্য করে। কিন্তু এটি মারাত্মকভাবে ব্রিটিশ সরকার, সমাজ সংস্কারক, রক্ষণশীল মুসলমান এবং কিছু জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ কর্তৃক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। এ সত্ত্বেও পাবনা, দার্জিলিং, নীলফামারী, রায়গঞ্জ (দিনাজপুর), কাকিনা (রংপুর), টাঙ্গাইল এবং বীরভুমে বঙ্গীয় নারী সমাজের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ ইস্যুকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হতে থাকলে ব্যাপক চাপের মুখে বিষয়টি ভারতীয় প্রদেশ আইন সভাগুলোর ওপর তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে ছেড়ে দেয়। এর ফলে সর্বপ্রথম মাদ্রাজের আইন সভা ১৯২১ সালে নারীর ভোটাধিকার মঞ্জুর করে। পরবর্তী সময়ে ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে ভারতের সকল প্রাদেশিক পরিষদে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের ভোটাধিকার মঞ্জুর করা হয়।[৪৪] বিভিন্ন আইন পরিষদ কর্তৃক আইন গৃহীত হবার ফলে মহীশুরে ১৯২৩ সালে, আসামে ১৯২৪ সালে, বঙ্গদেশে ১৯২৫ সালে এবং মদ্যপ্রদেশে ১৯২৭ সালে নারীর ভোটাধিকার অর্জিত হয়।[৪৫]

১৯১৯ সালে ভারত সংস্কার বিলের মাধ্যমে তৎকালীন ভারতে ৩ টি শর্ত সাপেক্ষে সর্বপ্রথম নারীর ভোটের অধিকার প্রদান করা হয়। শর্তগুলি ছিল (ক) বিবাহিত হতে হবে, (খ) সম্পত্তির অধিকারী হতে হবে, (গ)

শিক্ষিত হতে হবে। পরবর্তী ১৯৩৫ সালে তৎকালীন ভারতে নারীদের জন্য সার্বজনীন ভোটাধিকার আইন পাস হয়। ১৯৫৬ সালে স্থানীয় সরকার পরিষদে প্রাপ্ত-বয়স্ক নারীদের সার্বজনীন ভোটাধিকর প্রদান করা হয়। ১৯৫৯ সালে উক্ত আইনের ভিত্তিতে প্রথম সকল নারী ইউনিয়ন পরিষদে ভোট দেয়।[৪৬]

ইউনিয়ন পরিষদ আমাদের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন ও জনগণের অত্যন্ত কাছের সরকার। এর প্রভাব প্রতিনিয়ত তাদের জীবন জীবিকার উপর পড়ে। অতএব ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পরে ইউনিয়ন পরিষদ এ পর্যন্ত, ৮টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচন সমূহ ১৯৭৩, ১৯৭৭, ১৯৮৪, ১৯৮৮, ১৯৯২, ১৯৯৭, ২০০৩ ও ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের সর্বপ্রথম নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালে। ১৯৭২ এ প্রেসিডেন্টের এক অধ্যাদেশ দ্বারা, মৌলিক গণতন্ত্রী ব্যবস্থা যা পাকিস্তান আমলে ১৯৫৮এর পর প্রবর্তিত হয়েছিল তা বাতিল করা হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল এবং থানা কাউন্সিলের পরিবর্তে ইউনিয়ন পরিষদ, জেলা পরিষদ, থানা উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ৭৩-এর নির্বাচনের আগে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বে সরকারি কর্মচারী নিয়োগ করা হতো। ১৯৭৩ এর আইন দ্বারা প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতি ওয়ার্ডের জন্য তিনজন সদস্য অর্থাৎ তিনটি ওয়ার্ডে ৯ জন সদস্য রাখা হয়। এছাড়া গোটা ইউনিয়নে আরো ছিলেন একজন চেয়ারম্যান এবং আর একজন ভাইস-চেয়াম্যান। অর্থ্যাৎ মোট এগার জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হতো। এরা নির্বাচিত হতেন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে। কিন্তু ১৯৭৩ এর পর আইনটিতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৯৭ এর নির্বাচনে প্রথমবারের মত প্রতিটি ইউনিয়নে তিনটি সংরক্ষিত আসনে নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।[৪৭]

১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৪,৩৫২ টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ১ জন মহিলা (রংপুর) চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর পরে ইউপি নির্বাচনে ১৯৭৭ সালে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ৪। ১৯৮৪ সালে নির্বাচিত ৪ জন ছাড়াও আরও ২ জন নারী উপ নির্বাচনে নির্বাচিত হন। ১৯৮৮ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৪৪০১ টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থির সংখ্যা ছিল ১৮৫৬৫ জন এবং মেম্বার বা সদস্য প্রাথীর সংখ্যা ছিল ১,১৪,৬৯৯ জন। এর মধ্যে নারী চেয়ারম্যান প্রার্থী ছিলেন ৭৯ জন এবং সাধারণ সদস্য প্রার্থী নারীর সংখ্যা ছিল ৮৬৩ জন। এর মধ্যে ১ জন নারী প্রার্থী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৯২ সালে ৩৮৯৯

টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী ছিলেন ১৭,৪৪৪ জন এবং ৩৪,৮০১ টি সদস্য প্রার্থী ছিলেন ১,৬৯,১৩৫ জন। এর মধ্যে ১১৫ জন নারী চেয়ারম্যান ও ১১৩৫ জন নারী সদস্যপদে প্রতিদ্বন্দিতা করেন। ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার পরিষদ নির্বাচনে নারী প্রতিনিধিদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নারী জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[৪৮]

১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৪ হাজার ২ শত ৯৮ টি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নারী পুরুষ মিলিয়ে প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২,১০,৩৩৪ জন, যার মধ্যে নারী প্রার্থী প্রায় ৪৫০০০। এ নির্বাচনে মহিলা চেয়ারম্যান ২০ জন, ১১০ জন সাধারণ সদস্য পদে এবং ১২,৮২৮ জন, সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে আরো কয়েকটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হন মোট ১৩,৪৩৭ জন নারী এবং মোট নারী চেয়ারম্যান ২৩ জন।[৪৯]

কিন্তু নারীরা ক্ষমতায়নের যে প্রত্যাশা করেছিলেন তা সম্পূর্ণ ভাবেই ব্যর্থ হয়েছিল। তাদেরকে তেমন কোন দায়িত্ব পালনের সুযোগই দেয়া হয়নি। ক্ষমতা এবং অর্থ সংক্রান্ত কাজ থেকে সবসময় তাদেরকে দূরে রাখা হতো। উন্নয়নমূলক, অর্থ-সংক্রান্ত কাজ করার সুযোগ না দিয়ে পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, মা ও শিশুর কল্যাণ এর মতো কাজগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদেরকে দিয়ে করানো হতো। তারপরও নারী প্রতিনিধিরা একেবারে নিরুৎসাহী হয়নি। ২০০৩ সালের নির্বাচনে আবারো অংশগ্রহণ করেছে। ২০০৩ সালে ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা ছিল ৪ হাজার ৪৯৫ টি। এর মাঝে নির্বাচন হয়েছে ৪ হাজার ২২৮ টি ইউনিয়ন। বাকি ২৬৭ টি ইউনিয়নে নির্বাচন হয়নি।[৫০]

২০০৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন শুরু হয়েছিল ২৫ জানুয়ারি। দীর্ঘ ৫১ দিন এ নির্বাচন চলেছিল এবং শেষ হয়েছিল ১৬ মার্চ ২০০৩।[৫১]

২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে দু'একটি নির্বাচন বাদে সকল নির্বাচনের সাথেই জড়িত ছিল সহিংসতা। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের অস্ত্র প্রতিযোগিতায় সন্ত্রাসীদের চাইতে সাধারণ মানুষই নিহত এবং আহত হয়েছে বেশি।[৫২]

২০০৩ সালের নির্বাচনে নারীদের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। এজন্যে নারীদের ভোট কেন্দ্রে এসে ভোট প্রদানের উপর বা ভোট কেন্দ্রে যাবার উপরে কোন ফতোয়া ছিল না। অথচ ১৯৯৭ সালের নির্বাচনে বলা হয়েছিল

মেয়ে লোকের আবার ভোট কিসের? বাড়ির পুরুষেরা ভোট দিলেই মেয়েদের ভোট দেয়া হয়। অথবা মেয়েরা ভোট কেন্দ্রে গেলে আল্লাহর গজব নেমে আসবে ইত্যাদি। কিন্তু জনগনের সচেনতা এবং প্রশাসনিক উদ্যোগের ফলে ফতোয়াবাজরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার পর দেখা যায় ভোট কেন্দ্রে এসে নারী সংহিসতার শিকার হয়েছে। নির্বাচনে নারী প্রার্থীর হয়ে কাজ করার জন্যে রংপুর জেলার গাঙ্গিচড়া উপজেলার আলমবিদি চর ইউনিয়নের স্কুল শিক্ষিকা কাজল রুপতানা খাতুনকে রিকশা থেকে নামিয়ে হুমকি দেওয়া হয়।[৫৩] ইউনিয়ন পরিষদের সরাসরি নির্বাচনে নারীদের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি। নারীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন আত্মবিশ্বাস নিয়ে নির্বাচনী প্রচারনাও করেছেন দৃঢ়তার সাথে বিজয়ী হওয়ার প্রত্যয় নিয়ে। প্রত্যক্ষ নির্বাচন নারীর পছন্দ। কারণ এতে করে এলাকার লোকজন, বিশেষ করে মহিলাদের সাথে পরিচিত হওয়া যায়। তাদের সমস্যাগুলো সম্পর্কে জানা যায় ।

২০১১ সালের মার্চ মাস থেকে জুলাই পর্যন্ত সারাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দফায় ২৯ মার্চ ২০১১ থেকে ৩ এপ্রিল ২০১১ পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকার ১২টি জেলার ৫৫৩টি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দফা ৩১ মে থেকে ৫ জুলাই ২০১১ পর্যন্ত তিন হাজার ৮১৩ টি ইউনিয়ন পরিষদে ভোট গ্রহণ করা হয়। আইনি জটিলতা এবং সিটি কর্পোরেশন গঠনের পরিকল্পনা থাকায় অবশিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে পরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ।[৫৪]

দেশে বর্তমান ৪৫৬২ টি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। এর আগে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের জন্য পৃথক আইন থকলেও কোন বিধিমালা ছিল না, শুধু জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিধিমালা ছিল। এবার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের জন্য নতুন আইন এবং আইন অনুসারে বিধিমালা করা হয়েছে। বিধিমালা অনুযায়ী নির্বাচনী আইন ও বিধি লংঘন এবং নির্বাচনী অপরাধের তাৎক্ষণিক বিচারে প্রতিটি ইউনিয়নে একজন করে বিচারিক ও একজন করে নির্বাচনী ম্যাজিস্ট্রেট নিযোজিত থাকবেন। নির্বাচনী এলাকাগুলোর নির্বাহী হাকিমের নেতৃত্বে স্ট্রাইকিং ফোর্সের সদস্যরা টহল দেবেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, স্বচ্ছ ভোটার তালিকার কারণে নির্বাচনী ব্যবস্থার এমন ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। পাশাপাশি বিগত তত্ত্বধায়ক সরকারের সময়ে নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং আচরণ বিধিমালার ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করায় নির্বাচনী সংস্কৃতিতে বিরাট পরিবর্তন এসেছে, যা ২০০৮ সালের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে, ঐ বছরের শেষে জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৯ এর শুরুতে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন, গত জানুয়ারী মাসে পৌরসভা নির্বাচনের মতো ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও কর্মকর্তা এবং ভোটার ও প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, অতীতে মূলত জাল ভোটকে কেন্দ্র করে নির্বাচনী সহিংসতার সূত্রপাত ঘটত। কিন্তু

এবার ছবিসহ ভোটার তালিকার সুবাদে জাল ভোট ছিল না বললেই চলে। পাশাপাশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং ভ্রাম্যমান আদালতের কার্যকর ভূমিকা ও সুষ্ঠু নির্বাচনে ভূমিকা রেখেছে।[৫৫]

স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ তোফায়েল আহমেদের মতে, প্রশাসনের কঠোর অবস্থানের কারণে নির্বাচন ভালো হয়েছে। তাৎক্ষণিক শাস্তির ব্যবস্থা ছিল সবচেয়ে বেশি কার্যকর।[৫৬]

নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ব্রতীর হিসাব অনুযায়ী ২০০৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে শুধু বরিশাল বিভাগেই সহিংসতায় ১৭ জনের প্রাণহানি হয়েছিল। আহত হয়েছিলেন ১ হাজার ২৩৫ জন। ২০০৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নারী ভোটারদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি না পেয়ে ১৯৯৭ সালের তুলনায় কিছুটা কমেছে। ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে গোটা দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ নারী তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। কিন্তু ২০০৩ সালে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৮০.০৪ শতাংশ। তবে নির্বাচন কালীন সময়ে দেশের আইন শংঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতির ফলে সৃষ্ট নিরপিত্তাহীনতা থেকেও এই নারী ভোট কম পড়ার কারণ হতে পারে।[৫৭]

দেশের মোট ৪ হাজার ৩৮০ টি ইউনিয়নের মধ্যে চেয়ারম্যান হিসেবে নারী প্রতিনিধিত্ব করছেন ২২ টিতে। নেতৃত্বের আরও তৃণমূল পর্যায়ে তাকালে দেখা যায়, সংরক্ষিত ওয়ার্ড সদস্যপদে নারী প্রতিনিধিত্ব থাকলেও সাধারণ সদস্যদে নারী প্রতিনিধিত্বে একেবারে নেই বললেই চলে। ইউনিয়ন পরিষদে এই হার মাত্র ১ শতাংশ।[৫৮]

স্থানীয় জনপ্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সমাজের এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব আছে মাত্র একভাগ। নারীর এই অধঃস্থনতা সার্বিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করছে। যে সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে অর্ধেক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব মাত্র ১ শতাংশ সেই সমাজকে আধুনিক ও অগ্রসর সমাজ বলে চিহ্নিত করা যায় না। তৃণমূল পর্যায়ে নেতৃত্বের আসনে নারীর এই অনুপস্থিতির কারণে কেবল নারীরাই বৈষম্যের শিকার ও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে না সর্বোপরি সার্বিক জাতীয় উন্নয়নও ব্যাপকভাবে পিছিয়ে পড়ছে। একটি দেশের প্রান্তিক জনগোষ্টীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সার্বিক উন্নয়ন বহুলাংশে স্থানীয় সরকারের উপর নির্ভর করে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বিশেষত দারিদ্র্য দূরীকরণ করে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় শক্তিশালী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের তুলনায় স্থানীয় সরকারগুলো স্থানীয় সমস্যা ও প্রয়োজনসমূহ অধিক দক্ষভাবে চিহ্নিত করতে পারে। স্থানীয় সমস্যা ও সরকারের সাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় চাহিদা চিহ্নিত করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় নীতি নির্ধারণ করতে পারে।

২০১১ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে নির্দলীয় ভাবে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের কথা বলা হলেও, এমনকি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে নির্দলীয় নির্বাচনের আশ্বাস প্রদান করা হলেও বাস্তবে প্রায় সব ইউনিয়নেই দল ভিত্তিক মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। বর্তমানে রাজনৈতিক দলই ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অতীতে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থীর ব্যক্তি ইমেজ তাদের সততা ও যোগ্যতা, আঞ্চলিকতা, প্রার্থীর বংশ পরিচয় ইত্যাদি প্রাধান্য পেত।

সাম্প্রতিক বছরগুলোর লাগামহীন দলবাজির কারণে তৃণমূল পর্যায়ে প্রায় সকল নিয়ম-নীতি ভেঙ্গে পড়েছে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অনেক কাজ এখন দলীয় নেতা কর্মীরাই সম্পাদন করে। ফলে ইউনিয়ন পর্যায়ে একধরণের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।[৫৯]

২০১১ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সংরক্ষিত আসনে সম্ভাব্য নারী প্রার্থীদের হতাশা। নারী প্রার্থীদের অনেকেরই, বিশেষত অতীতে যারা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ছিলেন, বর্তমানে সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের ধারণা অত্যন্ত নেতিবাচক। তাদের মতে, বর্তমান পদ্ধতি সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত নারীদেরকে ক্ষমতা কাঠামোর বাইরে রাখে। তাই নারী সদস্যদের অনেকেই ২০১১ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হননি।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীরা নির্বাচিত হয়ে আসলে জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে তৃণমূলের জনগণের সমস্যা সমাধানে সহায়ক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদেরকে তাদের আয়ের উৎস, শিক্ষাগত যোগ্যতা, তাদের ও তাদের পরিবারের সম্পদ ও দায়-দেনার হিসাব, অপরাধ কর্মকাণ্ডের বিবরণ, আয়কর বিবরণী মনোনয়নপত্রের সাথে জমা দিতে হয়েছে। বাধ্যবাধকতা উপজেলা নির্বাচন, সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার নির্বাচনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু ২০১১ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তথ্য প্রদানে এ ধরণের বাধ্যবাধকতা ছিল না বিধায় নির্বাচনে ভোটারদের যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে সমস্যায় পড়তে হয়েছে।

তর্থ্য নির্দেশিকাঃ

১.উন্নয়ন পদক্ষেপ, জানুয়ারি ২০০৯, পঞ্চদশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা-২৩।

২. উন্নয়ন পদক্ষেপ, পঞ্চদশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০০৯, পৃষ্ঠা-২০।

৩. মাহফুজ পারভেজ, দেশ জাতি ও সমাজ সম্পর্কে মহিলা সংগঠনগুলো কি ভাবছে, রোববার, মার্চ-১৭, ১৯৯১ ইং, পৃষ্ঠা-৮।

৪. পারভীন নাহার পপি, চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রেক্ষিত,"দৈনিক দিনকাল, জুলাই ২৫, ২০০৫, পৃষ্ঠা-৫।

৫. নারী জাগরণ ও মুক্তি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, আয়শা খানম, জুন, ১৯৮৬ ইং, পৃষ্ঠা -(২-৩)।

৬. নারী জাগরণ ও মুক্তি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-(৭-৮)।

৭. বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা (ঢাকা), পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৪, বার্ষিক সংখ্যা, বাংলাদেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান:একটি বিশ্লেষণ, মো: ফেরদৌস হোসেন, পৃষ্ঠা- (৫৪-৫৫)।

৮. বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, মো: ফেরদৌস হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৪।

৯. রাশেদা আখতার, উন্নয়ন কার্যক্রমে এনজিও, গ্রামীণ নারীর আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন: একটি নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা, ক্ষমতায়ন, ১৯৯৬, সংখ্যা-১, পৃষ্ঠা-১।

১০. উন্নয়ন পদক্ষেপ ঊনবিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুন ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১২।

১১. উন্নয়ন পদক্ষেপ, একাদশ বর্ষ, আটত্রিশতম সংখ্যা, জুন ২০০৫, পৃষ্ঠা-১৩।

১২. নারী ও সমাজ, বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, আবু হোসেন আহমেদ ভূঁইয়া, ক্ষমতায়ন ১৯৯৬, সংখ্যা-১, পৃষ্ঠা-৩১.

১৩. উন্নয়ন কার্যক্রম এনজিও; গ্রামীণ নারীর আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের পরিবর্তনঃ একটি নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা রাশেদা আখার ক্ষমতায়ন, ১৯৯৬, সংখ্যা-১, পৃষ্ঠা-৪।

১৪. সুরাইয়া বেগম, রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ এবং অংশগ্রহণ সংকট: (পরিপ্রেক্ষিত নারী) নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি সম্পাদনা মেঘনাগুহ ঠাকুরতা, সুরাইয়া বেগম, হাসিনা আহমেদ, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, পৃষ্ঠা-১২১।

১৫. রাশেদা আক্তার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১।

১৬. সৈয়দা সুলতানা পারভীন, নারীর ক্ষমতায়ন বাংলাদেশ এবং একটি সমীক্ষা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা জুন ২০০৩, সংখ্যা-৭৬, পৃষ্ঠা-১১১।

১৭. সৈয়দা সুলতানা পারভীন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১১।

১৮. দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ মে, ২০১২, পৃষ্ঠা-১৮।

১৯. উন্নয়ন পদক্ষেপ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস বিশেষ সংখ্যা ২০১২, অষ্টাদশবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা মার্চ-২০১২, পৃষ্ঠা-(৫৬-৫৭)।

২০. প্রফেসর হান্নানা বেগম, নারীর সম অধিকার মহাজোট সরকারের উদ্যোগ ও আগামীর সুবর্ণরেখা, নভেম্বর-২০১৩, হান্নানা বেগম, পৃষ্ঠা-১০।

২১. উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপস্ টুয়র্ডস্ ডেভেলপমেন্ট, একাদশ বর্ষ, আটত্রিশ তম সংখ্যা, জুন-২০০৫, পৃষ্ঠা-৫।

২২. উন্নয়ন পদক্ষেপ, সপ্তদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুন-২০১১, পৃষ্ঠা-৯।

২৩. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রালায়ে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৮ ই মার্চ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা- ১২।

২৪. সিরাজ উদদীন আহমেদ, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি মেক্সিকো থেকে বেইজিং, ভাস্কর প্রকাশনী, ২০১২, পৃষ্ঠা-১৩৯।

২৫. উন্নয়ন পদক্ষেপ, ষষ্ঠ বর্ষ, বিংশ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০০, পৃষ্ঠা-১৮।

২৬. Vanessa Griffen (ed), Women, Development and Empowerment: A Pacific Feminist Perspective (Kualalampur: Asia and Pacific Development Centre, 1987) pp. 117-118).

২৭. Gender Concepts in Development Planning, A Publication of International Research and Training Institute for the Advancement, of Women, UNO, (Quated from Empowerment, Vol, 6, Dhaka, women for women, 1999. P. 42.

২৮. বদিউল আলম মজুমদার, গণতান্ত্রিক উত্তরণ, স্থানীয় শাসন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, আগামী প্রকাশনী ২০১১ পৃষ্ঠা-৪৩৫.)

২৯. তপতী সাহা, "নারীর ক্ষমতায়ন, ধারণাগত কাঠামো ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত" বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা বিংশতিতম খণ্ড বার্ষিক সংখ্যা ১৪০৯, পৃষ্ঠা-১৪২।

৩০. বদিউল আলম মজুমদার, প্রগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৩২।

৩১. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জান (সম্পাদিত) নারীর ক্ষমতায়নঃ রাজনীতি ও আন্দোলন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-১০-১১।

৩২. রোকেয়া কবির, "নারীর রজনৈতিক ক্ষমতায়নঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত" Shahiduzzaman Mahfuzur Rahman (ed). Gender Equality in Bangladesh: still a long way to go, News Network, Dhaka, 2003. P. 151.)

৩৩. অধ্যাপক মো: আব্দুল মান্নান, সামসন্নাহার খানম মেরী, "নারী ও রাজনীতি অবসর প্রকাশনা সংস্থা: ২০০৬, পৃষ্ঠা-১৭৩।

৩৪. অধ্যাপক মো: আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭১।

৩৫. স্থানীয় সরকার কাঠামোতে নারীর ক্ষমতায়ন তত্ত্ব ও বাস্তবতা এস,এম মোর্শেদ, সংবাদ ২০০০, পৃষ্ঠা-৫।

৩৬. জেরিনা রহমান খান, বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার এবং নারী ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের কী ক্ষমতায়ন হয়েছে, বাংলাদেশের উন্নয়ন সমীক্ষা, দ্বাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, মার্চ ২০০৬, পৃষ্ঠা-৮১।

৩৭. প্রতিমা পাল মজুমদার, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও জেণ্ডার সংবেদনশীল বাজেট, বাংলাদেশের উন্নয়ন সমীক্ষা খণ্ড, ৩১, বার্ষিক সংখ্যা, ১৪২০, পৃষ্ঠা-৫১।

৩৮. উন্নয়ন পদক্ষেপ, চতুদর্শ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা, আগষ্ট-সেপ্টম্বর-২০০৮, পৃষ্ঠা-২২।

৩৯. তোফায়েল আহমেদ, বৃত্ত ও বৃত্তান্ত, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ২০১১, পৃষ্ঠা-৬০।

৪০. দৈনিক ইত্তেফাক- ৩ এপ্রিল, ২০১৩, পৃষ্ঠা-১০।

৪১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০।

৪২. প্রতিমা পাল মজুমদার, নারী রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও জেণ্ডার সংবেদনশীল বাজেট, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ২০১৪, পৃষ্ঠা-৫২।

৪৩. প্রতিমা পাল মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫২।

৪৪. অধ্যাপক মো: আব্দুল মান্নান, প্রগুক্ত, পৃষ্ঠা-(৭৭-৭৮)।

৪৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ এপ্রিল, ২০১০, পৃষ্ঠা-১১।

৪৬. তৃণমূলের সুশাসন, স্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট, মইনুল হুদা, চন্দন কুমার লাহিড়ী, ২০০৪, পৃষ্ঠা-১৪।

৪৭. দৈনিক ইত্তফাক, ১১ মার্চ-২০০৩, পৃষ্ঠা-৫।

৪৮. নাহিদ সুলতানা, প্রনব কুমার পাণ্ডে, নাজনীন ইসলাম, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, পরিপ্রেক্ষিত ইউনিয়ন পরিষদ, সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাটিজ, পার্ট-ডি, খণ্ড-১, সংখ্যা-১, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা-১১৩।

৪৯. নাহিদ সুলতানা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১৩।

৫০. দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ মার্চ, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৫।

৫১. নারী বার্তা, আগষ্ট ২০০৩, ষষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৫।

৫২. দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ মার্চ, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৫।

৫৩. নারী বার্তা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬।

৫৪. প্রথম আলো, ২০ মে-২০১১, পৃষ্ঠা-১১।

৫৫. প্রথম আলো, ৮ মে, ২০১১, পৃষ্ঠা-৩।

৫৬. প্রথম আলো, ২০ এপ্রিল, ২০১১, পৃষ্ঠা-১৩।

৫৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ জুলাই, ২০১২, পৃষ্ঠা-৮।

৫৮. উন্নয়ন পদক্ষেপ ৯ম বর্ষ, অষ্টবিংশ সংখ্যা, জানুয়ারী ২০০৩, পৃষ্ঠা-১৬।

৫৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ মার্চ, ২০১১, পৃষ্ঠা-১১।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

গবেষণা এলাকাধীন ইউনিয়ন পরিষদে ২০১১ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র ও ভূমিকা

৫.১ ভূমিকাঃ

৫.২. নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র ও ভূমিকাঃ

৫.৩ চেয়ারম্যানগণের মতামতঃ

৫.৪ পুরুষ সদস্যদের মতামতঃ

৫.৫ ইউনিয়ন পরিষদের সচিবদের মতামতঃ

৫.৬ সাধারণ জনগণের মতামত জরিপঃ

৫.১ ভূমিকাঃ

এই অধ্যায়ে ২০১১ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নির্বাচিত নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিষয়ে সংগৃহীত তথ্যগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরার জন্য বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বৈবাহিক অবস্থা, নিজ পেশা, স্বামীর পেশা, স্বামীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা, দায়িত্ব পালনের নিয়মাবলী সম্পর্কে ধারনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামর্থ্য, রাজনেতিক সম্পৃক্ততা, সভায় উপস্থিতি, সালিশ বিচারে অংশগ্রহণ, চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের সাথে সম্পর্ক, এলাকার সমস্যা সম্পর্কে ধারণা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণে এবং ইউনিয়ন পরিষদে কার্যকর ভূমিকা পালনে এ বিষয়গুলো সম্পর্কিত। নারী ক্ষমতায়িত হলে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও তা বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হলে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন ও উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। বর্তমানে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনে বিশেষ করে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তারা তাদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে সক্ষম হচ্ছেন কিনা, প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে কোন সমস্যা দেখা দিচ্ছে কিনা এবং সমস্যা দেখা দিলে তা দূরীকরণের উপায় সম্পর্কে তাদের মতামত নেয়া হয়েছে কিনা এসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নির্বাচিত নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তা পর্যায়ক্রমে শতকরা হারে এবং কিছু তথ্য সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫.২. নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র ও ভূমিকাঃ

বয়সঃ

উত্তরদাতা নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের বয়স বিশ্লেষণে জানা যায়, ২৫ থেকে ৩০ বৎসর বয়স সীমার অন্তর্ভুক্ত সদস্য সংখ্যা ৯ জন (২০%), ৩০ থেকে ৩৫ এর মধ্যে ৩ জন (৬.৬৭%), ৩৫ থেকে ৪০ এর মধ্যে ১৬ জন (৩৫,৫৫%), ৪০ থেকে ৪৫ এর ১১জন (২৪.৪৪%), ৪৫ থেকে ৫০ এর মধ্যে ৩ জন (৬.৬৭%), এবং ৫০ বৎসরের উর্ধ্বে আছেন ৩ জন (৬.৬৭%)। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ৩৫-৪০ বছর (৩৫.৫৫%) বয়সী প্রতিনিধিদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ৪০-৪৫ বছরের (২৪.৪৪%) সদস্য, তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ২৫ থেকে ৩০ বৎসর বয়সী (২০%) সদস্য।

সারণিঃ ১. নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের বয়সঃ

বয়সসীমা	সদস্য সংখ্যা	শতকরা হার
২৫-৩০	৯ জন	২০%
৩০-৩৫	৩ জন	৬.৬৭%
৩৫-৪০	১৬ জন	৩৫.৫৫%
৪০-৪৫	১১ জন	২৪.৪৪%
৪৫-৫০	৩ জন	৬.৬৭%
৫০+	৩জন	৬.৬৭%
মোট	৪৫ জন	১০০%

সারণির তথ্যসমূহ বার ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলঃ

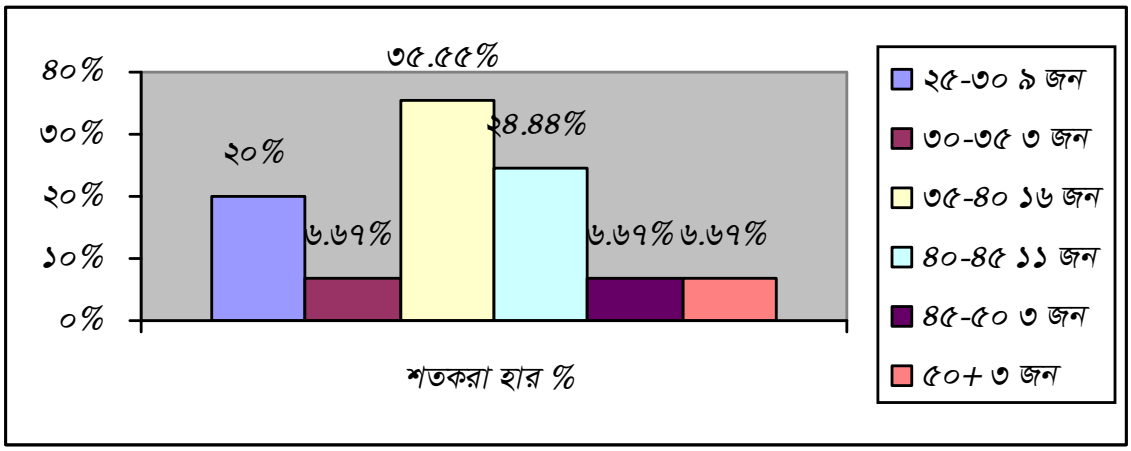

চিত্র:১- নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের বয়স।

বৈবাহিক অবস্থাঃ

নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের বৈবাহিক অবস্থা জানার জন্য প্রশ্ন করা হলে উত্তরদাতাদের মধ্যে বিবাহিতদের সংখ্যা ৪০ জন (৮৮.৮৭%), তালাক প্রাপ্তের সংখ্যা ২ জন (৪.৪৪%), এবং বিধবা নারী প্রতিনিধির সংখ্যা ৩ জন (৬.৬৭%)। উল্লেখ্য, গবেষণা এলাকাধীন কোন অবিবাহিত নারীকে নির্বাচিত হতে দেখা

যায়নি যদিও বিবাহিত নারীর সংখ্যা বেশি। বিবাহিত নারীরা স্বামীর ইচ্ছা ও সহযোগিতায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। বিধবা নারীদের একজন ২০০৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে হেরে যান। স্বামী মারা যাওয়ার পর প্রতিবেশী ও জনগণের ইচ্ছায় ২০১১ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। অন্য দুইজন সমাজে নিজেদের অবস্থান তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা থেকে জনগণের ইচ্ছায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

সারণি: ২ বৈবাহিক অবস্থাঃ

বৈবাহিক অবস্থা	সদস্য সংখ্যা	শতকরা হার
বিবাহিত	৪০ জন	৮৮.৮৭%
অবিবাহিত	০	০
তালাক প্রাপ্ত	২ জন	৪.৪৪%
বিধবা	৩ জন	৬.৬৭%
মোট	৪৫ জন	১০০%

সারণির তথ্যসমূহ বার ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলঃ

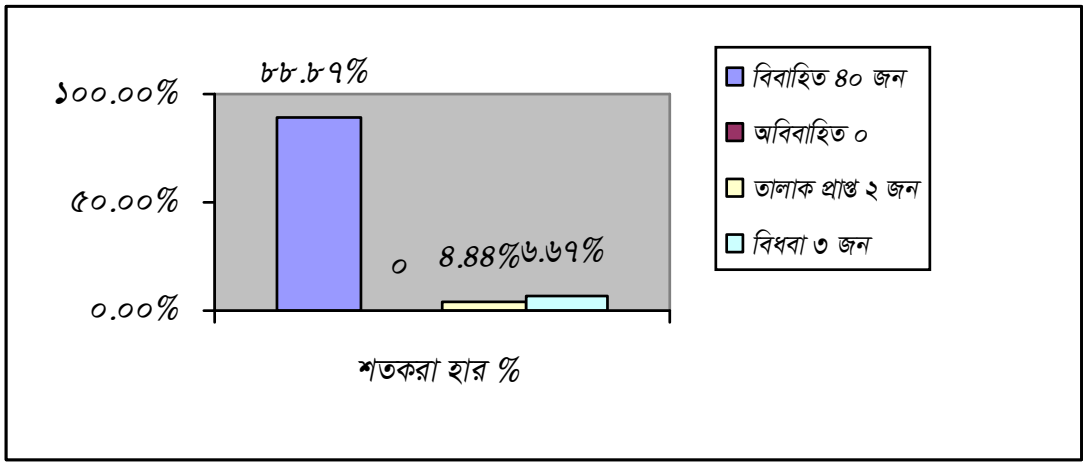

চিত্র:২- বৈবাহিক অবস্থা।

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন নারী প্রতিনিধিরা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হলে দায়িত্ব পালনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন। শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যার মাধ্যমে নিজের অবস্থান দৃঢ় করা এবং পরিষদে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করা সম্ভব। সেই প্রয়োজনীয়তা থেকে শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে দেখা গেছে শুধু স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন নারী প্রতিনিধির সংখ্যা ৭ জন (১৫.৫৬%), মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেনী পর্যন্ত ২২ জন (৪৮.৮৯%) এস,এস, সি পাশ ৯ জন (২০%), এইচ, এস,সি পাশ ৬ জন (১৩.৩৩%), স্নাতক পাশ ১ জন (২.২২%)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে খুব বেশি শিক্ষিত নারী সদস্যরা অংশগ্রহণ করছে না। ফলশ্রুতিতে তারা দায়িত্ব পালনেও কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছেন না। নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিগণ আর একটু শিক্ষিত হলেই ইউনিয়ন পরিষদে কার্যকর অবদান রাখতে আরো বেশি সক্ষম।

সারণিঃ ৩ নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	সদস্য সংখ্যা	শতকরা হার
স্বাক্ষর	৭ জন	১৫.৫৬%
মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ-৯ম)	২২জন	৪৮.৮০%
এস,এস,সি	৯ জন	২০%
এইচ,এস,সি	৬ জন	১৩.৩৩%
স্নাতক	১ জন	২.২২%
স্নাতকোত্তর	০	০
মোট	৪৫ জন	১০০%

সারণির তথ্যসমূহ বার ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলঃ

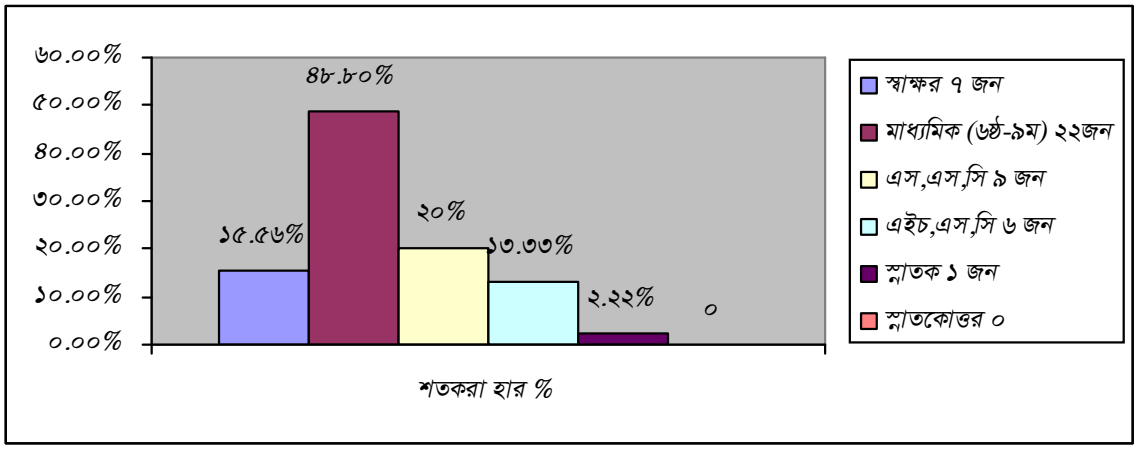

চিত্র:৩- নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা।

পেশার ধরণঃ

উত্তরদাতা বেশির ভাগ সদস্য অর্থ্যাৎ ৩৮ জন (৮৪.৪৫%) পেশায় গৃহিনী। ১ জন (২.২২%) সদস্য এইচ.এস.সি পাশ করে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত আছেন। এছাড়া ১ জন ব্যবসা (২.২২%), ৪ জন রাজনীতি (৮.৮৭%), ১ জন (২.২২%) অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত আছেন। নারী প্রতিনিধিদের বর্তমান পেশা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে ৩ জন গৃহিনী (৬.৬৭%) বলেছেন, নির্বাচনের আগে তারা ব্রাক স্কুলে শিক্ষকতা করতেন কিন্তু নির্বাচনের পর ইউনিয়ন পরিষদের কাজে ব্যস্ত হওয়ায় এখন আর শিক্ষকতা করেন না। যারা রাজনীতি ও অন্যান্য পেশায় জড়িত তারা ইউনিয়ন পরিষদের কাজ বোঝেন ও কাজে অংশগ্রহণ করেন। আর যারা কোন সংগঠনের সাথে যুক্ত না অথবা সামাজিক কোন কর্মকাণ্ডে জড়িত না, শুধুই গৃহিনী তারা প্রতি পদক্ষেপে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন, অন্যের উপর নির্ভশীলতা বাড়ছে এবং তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে পুরোপুরি সক্ষম হচ্ছেন না।

সারণিঃ ৪ পেশার ধরণঃ

পেশার ধরণ	সদস্য সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষকতা	১ জন	২.২২%
রাজনীতি	৪ জন	৮.৮৯%
গৃহিনী	৩৮ জন	৮৪.৪৫%
এনজিও কর্মী	০	০
ব্যবসা	১ জন	২.২২%
অন্যান্য	১ জন	২.২২%
মোট	৪৫ জন	১০০%

সারণির তথ্যসমূহ বার ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলঃ

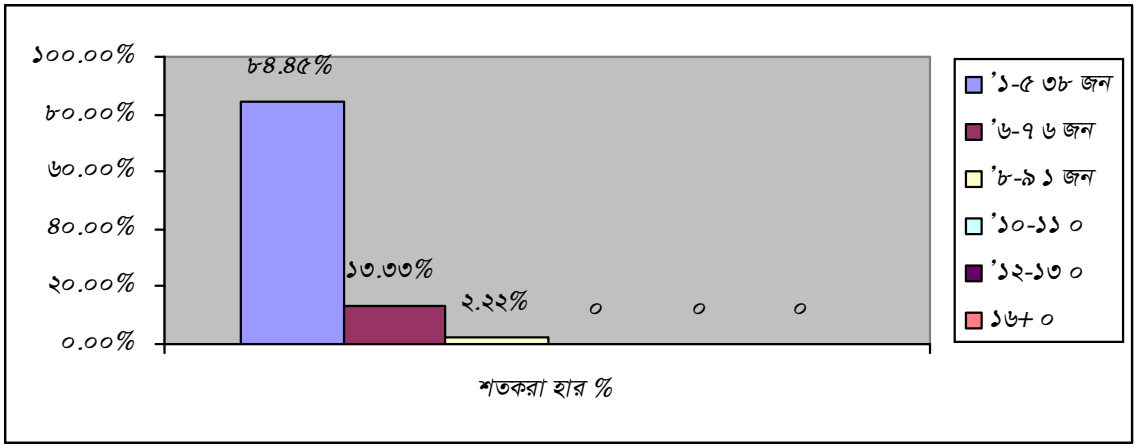

চিত্র:৪- **পেশার ধরণ।**

মাসিক আয়ঃ

বাংলদেশের নারীরা আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্বামীর উপর নির্ভরশীল। নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের পরিবারের মাসিক আয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে জানা যায় অধিকাংশের মাসিক আয় ৫

হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকার মধ্যে। ৫ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা মাসিক আয়ের সদস্য সংখ্যা ৩৪ জন (৭৫.৫৬%), ১৫ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকার মধ্যে মাসিক আয়ের সংখ্যা ৭ জন (১৫.৫৬%), ২৫ হাজার থেকে ৩৫ হাজার টাকার পারিবারিক মাসিক আয়ের সদস্য সংখ্যা ২ জন (৪.৪৪%), ৩৫ হাজার থেকে ৪৫ হাজার এবং ৪৫ হাজার থেকে ৫৫ হাজার টাকার মাসিক আয়ের মধ্যে কোন সদস্য নেই। ৫৫ হাজার এবং তদুর্ধ্ব পারিবারিক মাসিক আয়ের সদস্য সংখ্যা ২ জন। উল্লেখ্য, মাসিক আয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে অধিকাংশ উত্তরদাতাই এ বিষয়ে উত্তর দিতে সংকোচ বোধ করেছেন।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নারী প্রতিনিদিদের অধিকাংশই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছেন, যাদের সামাজিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এসব নির্বাচনে নারী প্রতিনিধিরা অবস্থা সম্পন্ন পরিবারের সদস্য না, তাদের পারিবারিক আয় সীমিত, অল্প কিছু জমির মালিক অথবা জমিজমা নাই, সামাজিক অবস্থা বা সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তির ভিত্তিও অত্যন্ত দুর্বল, যে কারণে ইউনিয়ন পরিষদের সভায় যে কোন মতামত প্রকাশে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে ভূমিকা পালন করতে পারেন না।

সারণি : ৫ মাসিক আয়ঃ

মাসিক আয়	সদস্য সংখ্যা	শতকরা হার
৫০০০-১৫০০০	৩৪ জন	৭৫.৫৬%
১৫০০০-২৫০০০	৭ জন	১৩.৫৬%
২৫০০০-৩৫০০০	২জন	৪.৪৪%
৩৫০০০-৪৫০০০	০	০
৪৫০০০-৫৫০০০	০	০
৫৫০০০$^{+}$	২ জন	৪.৪৪%
মোট	৪৫ জন	১০০%

নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের পারিবারিক অবস্থা জানার জন্য স্বামীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা ও পরিবারের সদস্য সংখ্যা বিষয়ে প্রশ্ন করে উত্তর সংগ্রহ করা হয়।

সারণির তথ্যসমূহ বার ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলঃ

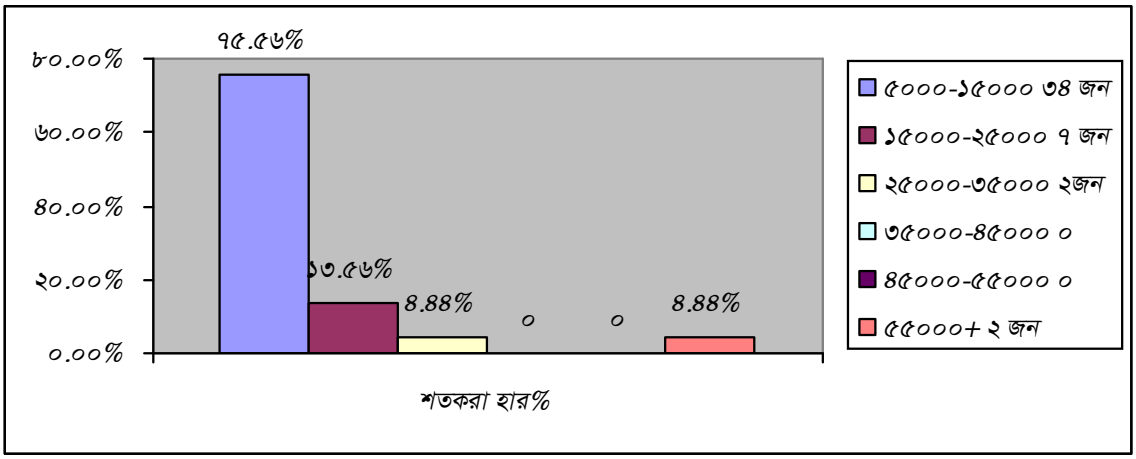

চিত্র:৫- মাসিক আয়।

নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের স্বামীর পেশাঃ

নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের স্বামীর পেশাসংক্রান্ত প্রশ্নে উত্তরদাতাদের ১৪ জন (৩৩.৩৩%) বলেছেন কৃষি, ৪ জন (৯.৫২%) বলেছেন চাকরি, ২ জন (৪.৭৬%) বলেছেন শিক্ষকতা, ১ জন (২.৩৮%) অবসরভোগী, ১৬ জন (৩৮.১০%) ব্যবসা, অন্যান্য পেশায় আছেন ৫ জন (১১.৯১%)। ৫ জন অন্যান্য পেশায় যারা নিয়োজিত আছেন তাদের মধ্যে চা বিক্রেতা, বাস ড্রাইভার, মুদি দোকানদার, দর্জির কাজে নিয়োজিত, এক জন পল্লী চিকিৎসক এবং একজন বেকার। অর্থ্যাৎ উত্তরদাতা নারী সদস্যদের অধিকাংশই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য এবং তাদের বেশিরভাগ সদস্যের স্বামীর পেশা কৃষি। ৩ জন বিধবা নারী প্রতিনিধিদের মধ্যে ১ জনের স্বামীর পেশা ছিল কৃষিকাজ। অন্য দুইজন ব্যবসা পেশার সাথে জড়িত ছিলেন। ৩ জন নারী প্রতিনিধি বিধবা হওয়ায় তাঁদের স্বামীর পেশা সারণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সারণিঃ ৬. স্বামীর পেশা

স্বামীর পেশা	সদস্য সংখ্যা	শতকরা হার
শিক্ষকতা	২ জন	৪.৭৬%
চাকরি	৪ জন	৯.৫২%
কৃষিকাজ	১৪ জন	৩৩.৩৩%
অবসরভোগী	১ জন	২.৩৮%
ব্যবসা	১৬ জন	৩৮.১০%
অন্যান্য	৫ জন	১১.৯১%
মোট	৪২ জন	১০০%

সারণির তথ্যসমূহ বার ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলঃ

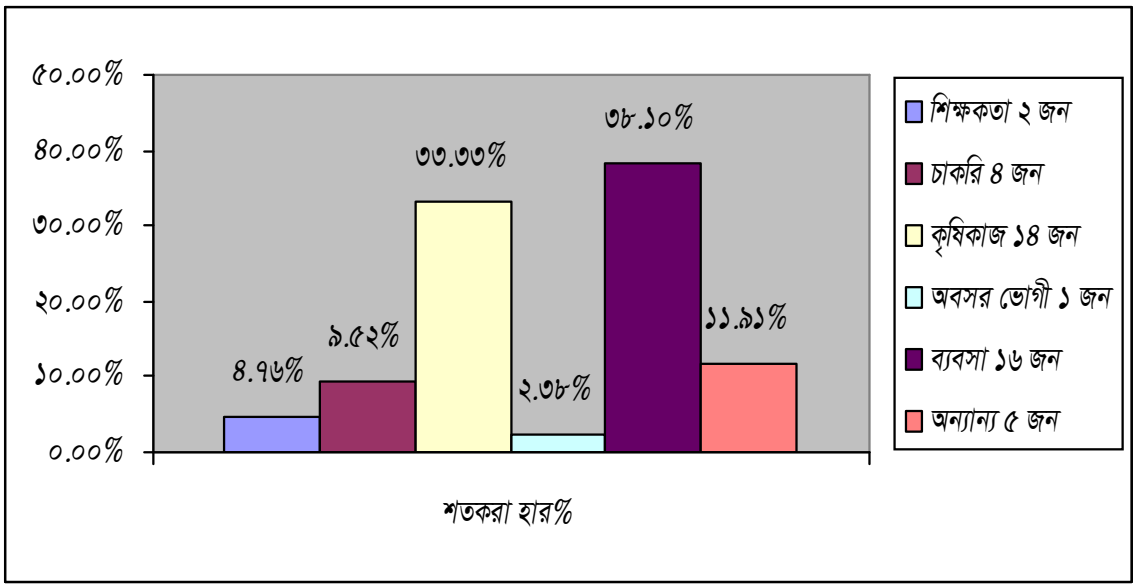

*চিত্র:*৬- স্বামীর পেশা।

স্বামীর শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের স্বামীর শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রশ্নে ৬ জন বলেছেন কোনরকম স্বাক্ষর দিতে পারেন (১৪,২৮%), ১৬ জন মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ-৯ম) (৩৮.১%) পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন, এস.এস.সি পাশ করেছেন ৬ জন (১৪.২৮%), এইচ.এস.সি পাশ করেছেন ৭ জন (১৬.৬৭%) এবং স্নাতক পাশ করেছেন ৭ জন

(১৬.৬৭%)। নারী প্রতিনিধিদের স্বামীর বেশিরভাগ মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ-৯ম) পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত। এখানে লক্ষ্যণীয়, নারী প্রতিনিধিদের স্বামীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ক্রমেই বাড়ছে। ৩ জন বিধবা নারী প্রতিনিধির স্বামীর শিক্ষাগত যোগ্যতায় দুইজন মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ-৯ম) এবং ১ জন এস,এস,সি পাশ ছিলেন। স্বামী বর্তমান না থাকায় ৩ জন নারী প্রতিনিধির স্বামীর শিক্ষাগত যোগ্যতা সারণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সারণি: ৭ স্বামীর শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

স্বামীর শিক্ষাগত যোগ্যতা	সদস্য সংখ্যা	শতকরা হার
স্বাক্ষর	৬ জন	১৪.২৮%
মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ-৯ম)	১৬ জন	৩৮.১%
এস.এস.সি	৬ জন	১৪.২৮%
এইচ.এস.সি	৭ জন	১৬.৬৭%
স্নাতক	৭ জন	১৬.৬৭%
মোট	৪২ জন	১০০%

সারণির তথ্যসমূহ বার ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলঃ

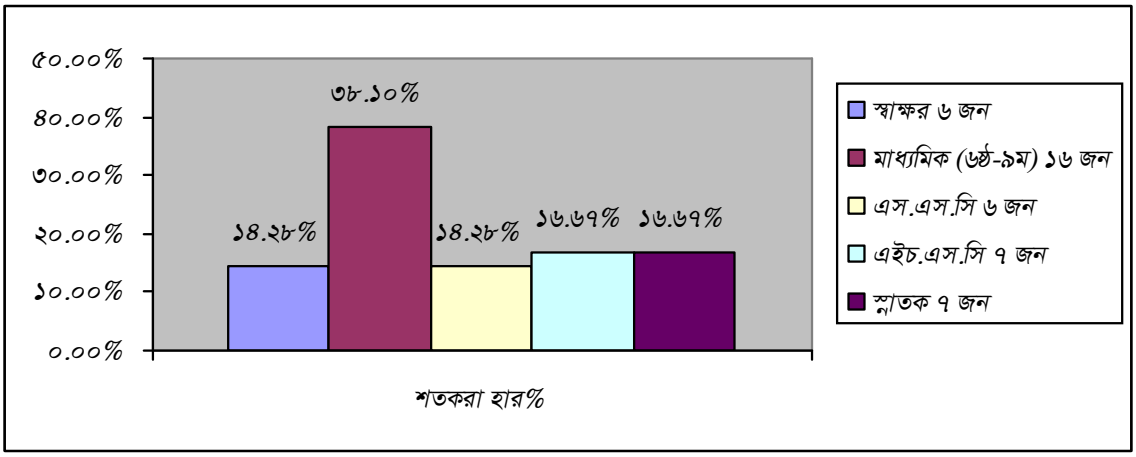

চিত্র:৭- স্বামীর শিক্ষাগত যোগ্যতা

পরিবারের সদস্য সংখ্যাঃ

নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা (৪-৫) জনের মধ্যে আছে ৩৩ জন (৮৪.৪৫%), (৬-৭) জন সদস্যের মধ্যে আছে ৬ জন (১৩.৩৩%) এবং (৮-৯) জন সদস্য সংখ্যার মধ্যে আছে ১ জন (২,২২%)। ১টি পরিবারের সদস্য সংখ্যা ২ জন এবং ৪টি পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩ জন। নারী প্রতিনিধিদের

পরিবারের আকার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বর্তমানে সমাজ ক্রমশ একক পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে এবং পরিবারের সদস্য সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। গবেষণা এলাকার দেয়া তথ্য অনুযায়ী ২ জন নারী সদস্য বলেছেন সভা থাকলে স্বামী ছোট বাচ্চাকে নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদে যায় ও সবধরনের সহযোগিতা করে। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নারী প্রতিনিধিগণ এককভাবে পরিবারে স্বামীর সহযোগিতায় সমাজে নিজের অবস্থান গড়ে তুলছেন।

সারণিঃ ৮. পরিবারের সদস্য সংখ্যাঃ

পরিবারের ধরণ	সদস্য সংখ্যা	শতকরা হার
১-৫	৩৮	৮৪.৪৫%
৬-৭	৬	১৩.৩৩%
৮-৯	১	২.২২%
১০-১১	০	০
১২-১৩	০	০
১৬+	০	০
মোট	৪৫ জন	১০০%

সারণির তথ্যসমূহ বার ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলঃ

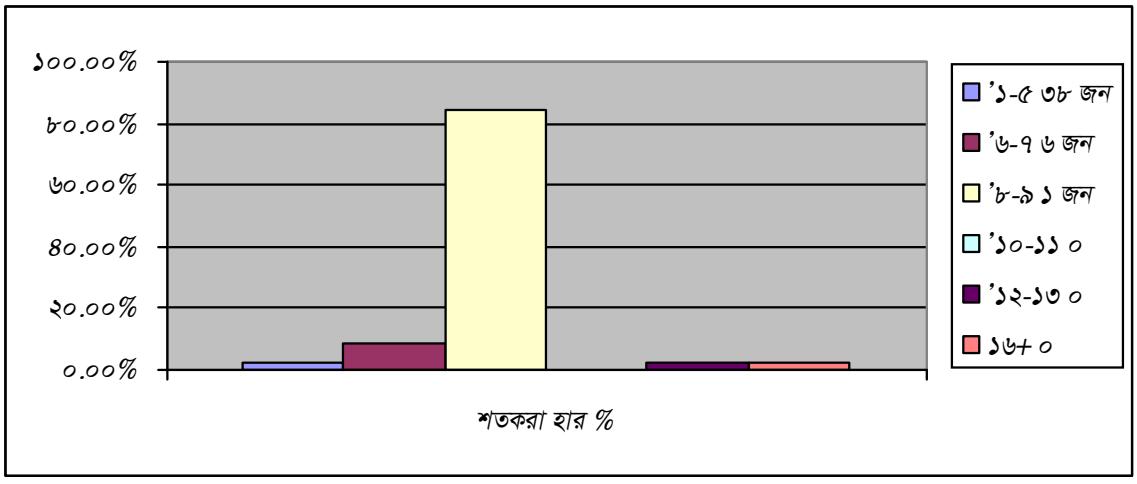

চিত্রঃ৮ - পরিবারের সদস্য সংখ্যা।

নির্বাচনে অংশগ্রহণের কারণঃ

নারী সদস্যদের ২২ জন (৪৮.৮৯%) প্রতিবেশী ও জনগণের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন, ৪ জন (৮.৮৯%) সদস্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং ১৯ (৪২.২২%) জন সদস্য পরিবারের অনুপ্রেরণায় ও স্বামীর ইচ্ছায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। বেশির ভাগ উত্তরদাতাই বলেছেন, জনগণের ইচ্ছায় নির্বাচন করেছেন, যাদের পারিবারিক অনুপ্রেরণা ছিল তারাও বলেছেন পারিবারিক অনুপ্রেরণার পাশাপাশি জনগণও তাদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন।

এসকল তথ্যের আলোকে বলা যায়, পরিবারগুলো সচেতন হয়েছে এবং জনগণও নারীদের মূল্যায়ণ করছে।

সারণিঃ ৯ নির্বাচনে অংশগ্রহণের কারণঃ

নির্বাচনে অংশগ্রহণের কারণ	সদস্য সংখ্যা	শতকরা হার
ব্যক্তিগত উদ্যোগ	৪ জন	৮.৮৯%
পারিবারিক অনুপ্রেরণা	১৯ জন	৪৮.৮৯%
প্রতিবেশী/জনগণের ইচ্ছা	২২ জন	৪২.২২%
এনজিওদের প্রচেষ্টা	০	০
অন্যান্য	০	০
মোট	৪৫ জন	১০০%

সারণির তথ্যসমূহ বার ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলঃ

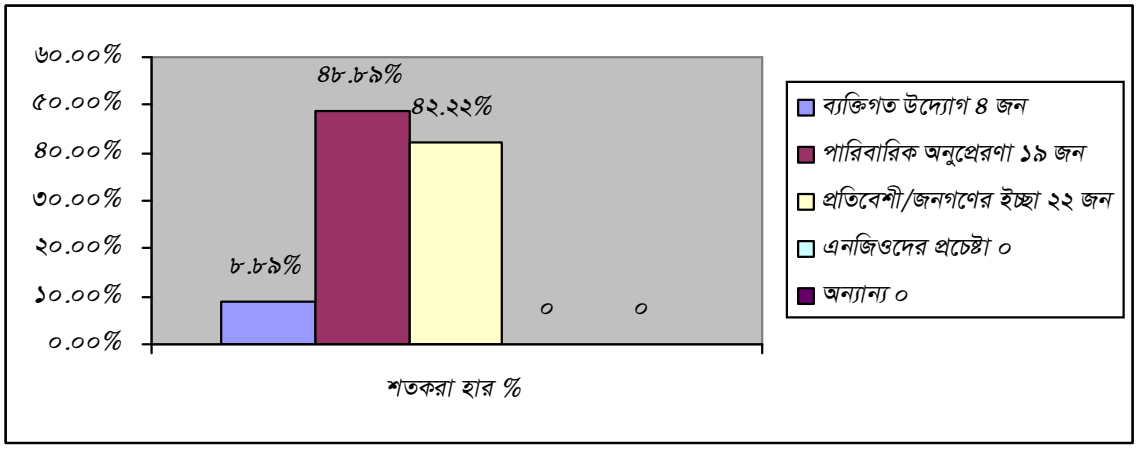

চিত্র:৯- নির্বাচনে অংশগ্রহণের কারণ।

নির্বাচিত নারী সদস্যদের সামাজিক মর্যাদাঃ

নির্বাচিত হওয়ার পর নারী হিসেবে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে কি না এ প্রসঙ্গে ৩৮ জন (৮৪.৪৪%) নারী সদস্য বলেছেন তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৭ জন (১৫.৫৬%) বলেছেন সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়নি।

সামাজিক মর্যাদা আগের চেয়ে এই অর্থে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, আগে যারা কথা বলতো না এখন তাঁরা সালাম দিয়ে চলে, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়, মানুষ যথেষ্ঠ সম্মান করে চলে ও মর্যাদা দেয়।

সারণিঃ ১০. সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিঃ

প্রশ্নের বিষয়	উত্তর	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
নির্বাচিত হওয়ার পর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে কী না	হ্যাঁ	৩৮ জন	৮৪.৪৪%
	না	৭ জন	১৫.৫৬%
মোট		৪৫ জন	১০০%

নির্বাচিত হওয়ার পেছনে পারিবারিক, সামাজিক বা ধর্মীয় বাধাঃ

নির্বাচিত হওয়ার পেছনে পারিবারিক, সামাজিক বা ধর্মীয় বাধা ছিল কি না এ প্রশ্নের উত্তরে ৪২ জন (৯৩.৩৩%) বলেছেন, কোন ধরণের বাধার সম্মুখীন তারা হননি বরং সকলে স্বতঃস্ফুর্তভাবে সহযোগিতা করেছে। কিন্তু ৩ জন (৬.৬৭%) বলেছেন, নির্বাচনী প্রচারণার সময় গ্রামের কোন কোন পুরুষ এ বিষয়টিকে সহজ ভাবে মেনে নিতে পারেননি এবং নানাধরণের মন্তব্য করেছেন।

সারণিঃ ১১. পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বাধাঃ

প্রশ্নের বিষয়	উত্তর	সদস্য সংখ্যা	শতকরা হার
নির্বাচিত হওয়ার পেছনে বাধা	হ্যাঁ	৩ জন	৬.৬৭%
	না	৪২ জন	৯৩.৩৩%
মোট		৪৫ জন	১০০%

শক্তিশালী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকাঃ

এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে অধিকাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, নারী প্রতিনিধিদের অবশ্যই ভূমিকা আছে। কিন্তু বাস্তবে ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের কাজের পরিবেশ না থাকায় নারী প্রতিনিধিরা ভূমিকা পালনে সক্ষম হচ্ছেন না। ১২ জন (২৬.৬৭%) উত্তরদাতা বলেছেন, নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকা আছে। ২৮ জন (৬২.২২%) উত্তরদাতা কোন মন্তব্য করেননি। ৫ জন (১১.১১%) উত্তরদাতা বলেছেন, নারীরা ইউনিয়ন পরিষদে কোন কাজ করতে পারছেন না বিধায় তাদের কোন ভূমিকাও নাই। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় অনেক উত্তরদাতা স্থানীয় সরকারের শক্তিশালীকরণের বিষয়টি বুঝে উঠতে না পারায় তেমন কোন মন্তব্য করেননি। একই শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন পুরুষ সদস্যরা এ বিষয়ে মন্তব্য করতে পেরেছেন। এ থেকেই বোঝা যায় নারী প্রতিনিধিদের সচেতনতার যথেষ্ঠ অভাব রয়েছে।

সারণিঃ ১২. স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণে নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকাঃ

প্রশ্নের বিষয়	উত্তর	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণে নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকা	হ্যাঁ	১২ জন	২৬.৬৭%
	না	৫ জন	১১.১১%
	মন্তব্য করেননি	২৮ জন	৬২.২২%
মোট		৪৫ জন	১০০%

সভায় নিয়মিত উপস্থিতিঃ

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যরা সভা ও কর্মকাণ্ডে নিয়মিত উপস্থিত থাকেন কি না, উপস্থিত না থাকলে কেন পারেন না, এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ৩৮ জন (৮৪.৪৪%) সদস্য মত দিয়েছেন তারা নিয়মিত ইউনিয়ন পরিষদের সভায় উপস্থিত থাকেন। ৭ জন (১৫.৫৬%) সদস্য বলেছেন উপস্থিত থাকেন না।

সারণিঃ ১৩.সভায় উপস্থিতিঃ

প্রশ্নের বিষয়	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
নিয়মিত সভায় উপস্থিত থাকেন	৩৮ জন	৮৪.৪৪%
নিয়মিত সভায় উপস্থিত থাকেন না	৭ জন	১৫.৫৬%
মোট	৪৫ জন	১০০%

উপস্থিত না থাকার কারণগুলোর মধ্যে ১ জন সদস্য বলেছেন তার পরিবর্তে তার স্বামী পরিষদের সকল সভা ও কর্মকাণ্ডে উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি কোথাও স্বাক্ষর দেন না। স্বাক্ষর দেওয়ার প্রয়োজন হলে তিনি সভায় উপস্থিত হন। ২ জন সদস্য পারিবারিক সমস্যার কারণে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে পারেন না। চেয়ারম্যানের অসহযোগিতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় নারী সদস্যদের মতামত না শোনা এসব কারণে ২ জন সদস্য নিয়মিত পরিষদের সভায় উপস্থিত থাকেন না। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, যাতায়াত ভাতা না থাকা, আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে ২ জন সদস্য নিয়মিত উপস্থিত থাকতে পারেন না। তবে লক্ষ্যনীয়, গবেষণা এলাকার প্রাপ্ত তথ্যে সব উত্তরদাতাই কম বেশি বঞ্চিত। তারপরও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য স্বতঃস্ফুর্তভাবে পরিষদে উপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালন করতে চান। চেয়ারম্যান, মেম্বাররা সহযোগিতা করলে, দায়িত্ব পেলে, কাজের পরিবেশ সৃষ্টি হলে কোন বাধাকে তারা বাধা মনে করেন না।

সারণিঃ ১৪. উপস্থিত না থাকার কারণ

প্রশ্নের ধরণ	সদস্য সংখ্যা	শতকরা হার
পারিবারিক সমস্যা	৩ জন	৬.৬৭%
যাতায়াতের অসুবিধা	২ জন	৪.৪৪%
চেয়ারম্যানের অসহযোগিতা	২ জন	৪.৪৪%
সভার খবর যথাসময়ে না পাওয়া	০	০
অন্যান্য	০	০

সভায় নির্বাচিত নারী সদস্যদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাঃ

সভায় স্বতঃস্ফুর্তভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারেন কি না, এ প্রশ্নের উত্তরে ৩৬ জন সদস্য (৮০.০০%) বলেছেন সভায় স্বতঃস্ফুর্তভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারেন। ৫ জন (১১.১১%) সদস্য সভায় মতামত প্রকাশ করতে পারেন না, এজন্য চুপ করে থাকেন। কারণ, মতামত প্রকাশ করে কোন লাভ হয় না। ৪ জন সদস্য চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের অসহযোগিতার কারণে মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন। ৪ জন (৮.৮৯%) সদস্য কোন মন্তব্য করেননি।

সারণিঃ ১৫ সভায় মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাঃ

প্রশ্নের বিষয়	উত্তর	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
সভায় স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে নিজের মতামত প্রকাশ	হ্যাঁ	৩৬ জন	৮০.০০%
	না	৫ জন	১১.১১%
	মন্তব্য করেন নি	৪ জন	৮.৮৯%
মোট		৪৫ জন	১০০%

সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রাধান্যঃ

ইউনিয়ন পরিষদের সভায় কাদের সিদ্ধান্তকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়, এ প্রশ্নের উত্তরে নারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ২ জন (৪.৪৫%) বলেছেন নারী সদস্য, ১৮ জন (৪০,০০%) পুরুষ সদস্য, ১১জন (২৪.৪৪%) চেয়ারম্যান, ৮ জন (১৭.৭৮%) চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্য, ৬ জন (১৩.৩৩%) নারী পুরুষ উভয়ের সমান গুরুত্ব। সভায় পুরুষ সদস্যদের সিদ্ধান্তকে সবচেয়ে বেশি প্রধান্য দেওয়া হয়। নারী সদস্যদের কোন মূল্যায়ণ করা হয় না। সিদ্ধান্তগ্রহণের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের ডাকা হয় না। চেয়ারম্যানের সাথে পুরুষ সদস্যরা একমত হয়ে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সারণিঃ ১৬. সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রাধান্যঃ

সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রাধান্য	সদস্য সংখ্যা	শতকরা হার
চেয়ারম্যান	১১ জন	২৪.৪৪%
পুরুষ সদস্য	১৮ জন	৪০.০০%
নারী সদস্য	২ জন	৪.৪৫%
চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্য	৮ জন	১৭.৭৮%
নারী পুরুষ উভয়ের সমান গুরুত্ব	৬ জন	১৩.৩৩%
মোট	৪৫ জন	১০০%

নারী সদস্য কম হওয়ায় তাদের অবহেলা করাঃ

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারী সদস্যরা কম হওয়ায় তাদের অবহেলা করা হয় কি না, এ প্রশ্ন করা হলে উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৬ জন (৩৫.৫৬%) বলেছেন অবশ্যই অবহেলা করা হয়। ২৪ জন (৫৩.৩৩%) বলেছেন অবহেলা করা হয় না। ৫ জন (১১.১১%) সদস্য কোন মন্তব্য করেননি।

সারণিঃ ১৭. সদস্য কম হওয়ায় অবহেলা করাঃ

নারী সদস্য কম হওয়ায় অবহেলা করা হয় কী না	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
অবহেলা করা হয়	১৬ জন	৩৫.৫৬%
অবহেলা করা হয় না	২৪ জন	৫৩.৩৩%
মন্তব্য করেননি	৫ জন	১১.১১%
মোট	৪৫ জন	১০০%

সারণির তথ্যসমূহ বার ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলঃ

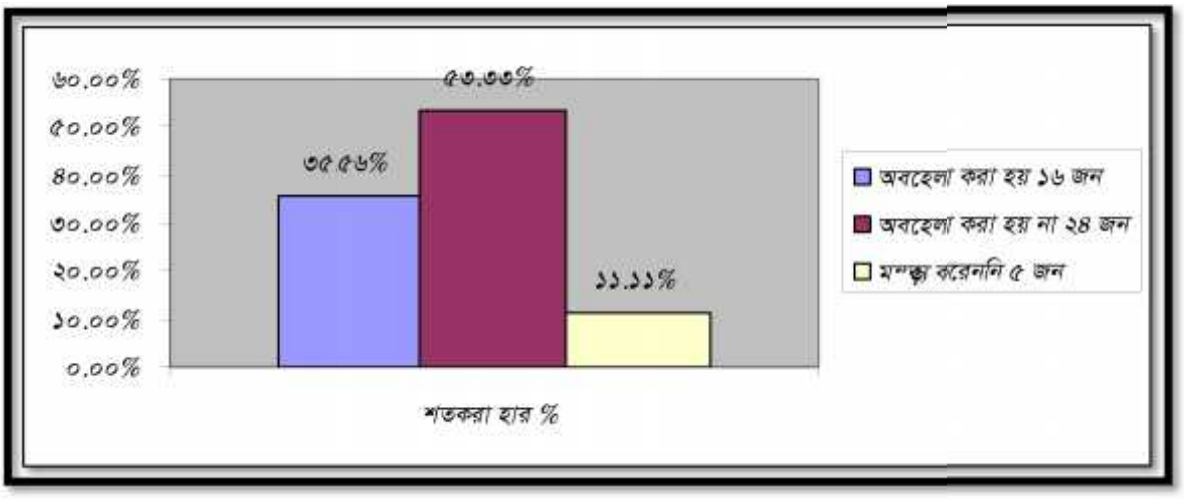

চিত্র:১৭- সদস্য কম হওয়ায় অবহেলা করা।

নারী সদস্য কম হওয়ায় কী ধরণের অবহেলা করা হয় জানতে চাওয়া হলে উত্তর দাতারা অভিযোগ করেন, নারী হওয়ায় তাদের মতামতের গুরুত্ব দেওয়া হয় না। পুরুষ সদস্য এবং কোন কোন চেয়ারম্যানের ধারণা নারীরা এ কাজের জন্য যোগ্য নয়। তাদেরকে পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পের দায়িত্ব ও যে কোন সিদ্ধান্তগ্রহণ ও আলোচনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। কোন দায়িত্ব দিলেও পুরুষ সদস্যদের সহযোগিতা করার কথা বলা হয়।

চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের সাথে সম্পর্কঃ

চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের সাথে নারী প্রতিনিধিদের সম্পর্ক কেমন এ প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৬ জন (৩৫.৫৬%) বলেছেন সহযোগিতামূলক এবং ২৯ জন (৬৪.৪৪%) বলেছেন অসহযোগিতামূলক। গবেষণায় দেখা যায়, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের সাথে নারী প্রতিনিধিদের অধিকাংশের সম্পর্ক অসহযোগিতামূলক। অসহযোগিতামূলক বলতে তারা বুঝিয়েছেন নারী প্রতিনিধিদের মতামতের মূল্যায়ণ না করা, সিদ্ধান্তগ্রহণের সময় নারী সদস্যদেরকে প্রাধান্য না দেওয়া। অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে সুষম বণ্টন না করা। নারী সদস্যদের উপেক্ষা করে পুরুষ সদস্যকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া ইত্যাদি। ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের অসহযোগিতার কারণে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিগণ তাঁদের দায়িত্ব পালনে প্রতিনিয়ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। তবে চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক ভাল। সহযোগিতামূলক বলতে উত্তরদাতাগণ বুঝিয়েছেন চেয়ারম্যান পরিষদে নারী পুরুষ উভয়কে সমান গুরুত্ব দেন, পুরুষ সদস্যরা যাতে

নারীদের কাজকে মূল্যায়ণ করে সে ব্যাপারে সহযোগিতা করেন, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ত্রান বা রিলিফের সুষম বণ্টন করেন। সর্বোপরি নারী সদস্যদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দিতে চেষ্টা করেন। পুরুষ সদস্যদের সাথে যে কোন বিষয়ে মত বিনিময় করে সিদ্ধান্ত নেন, নিজেদের মধ্যে পরিষদের ও এলাকার সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা করে সভায় উপস্থাপন করেন, নিয়মিত পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন, কারো কোন সমস্যা হলে তারা এগিয়ে আসেন ইত্যাদি।

সারণিঃ ১৮ চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের সাথে সম্পর্কঃ

চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের সাথে সম্পর্ক	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
সহযোগিতামূলক	১৬ জন	৩৫.৫৬%
অসহযোগিতামূলক	২৯ জন	৬৪.৪৪%
মোট	৪৫ জন	১০০%

সারণির তথ্যসমূহ বার ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলঃ

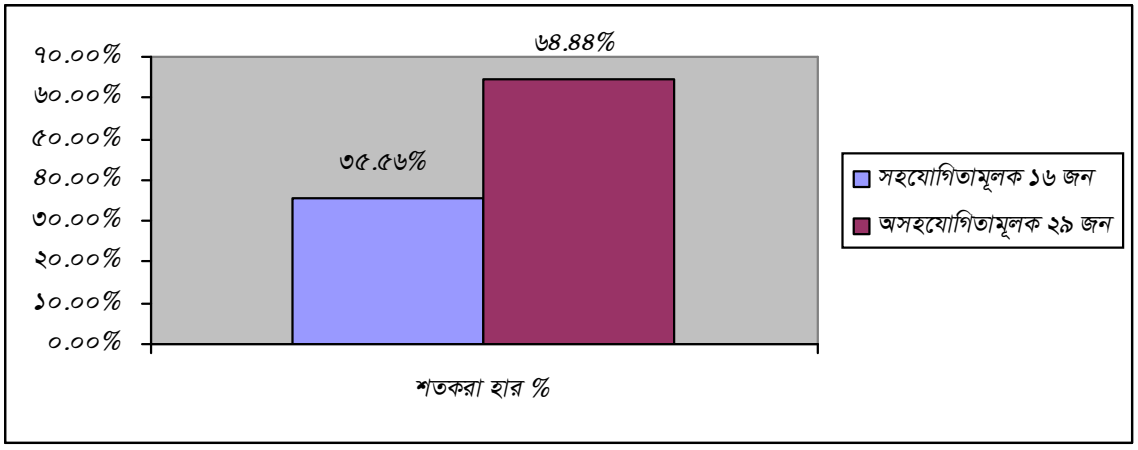

চিত্র:১৮- চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের সাথে সম্পর্ক।

সভার তারিখ জানানোর মাধ্যমঃ

ইউনিয়ন পরিষদের সভার তারিখ কীভাবে জানানো হয় এর উত্তরে উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩৬ জন (৮০.০০%) বলেছেন মোবাইল ফোনে, ৫ জন বলেছেন (১১.১১%) চিঠিপত্রের মাধ্যমে, ৪ জন সদস্য বলেছেন (৮.৮৯%) অন্যান্য। অন্যান্যরা চৌকিদারের মাধ্যমে, মৌখিক ভাবে, লোকের মাধ্যমে অথবা পরিষদের সদস্যদের কাছ থেকো সভার তারিখ জানতে পারেন। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, বেশিরভাগ উত্তরদাতাই সভার তারিখ

জানতে পারেন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। বর্তমানে মোবাইল ফোন চালু হওয়ায় সভার তারিখ জানতে তেমন কোন সমস্যা হয় না। তবে সভাগুলো সঠিক সময়ে চেয়ারম্যান ডাকে না। ডাকলেও অনেক সময় ঠিকমতো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না। চেয়ারম্যান নাম মাত্র সভা শেষ করেন। পরবর্তীতে পরিচিত ও কাছের পুরুষ সদস্যদের নিয়ে নিজেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সারণিঃ ১৯. সভার তারিখ জানার মাধ্যমঃ

প্রশ্নের ধরণ	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
চিঠিপত্রের মাধ্যমে	৫ জন	১১.১১%
মৌখিক ভাবে	০	০
মোবাইল ফোনে	৩৬ জন	৮০.০০%
অন্যান্য	৪ জন	৮.৮৯%
মোট	৪৫ জন	১০০%

পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতাঃ

সভায় উপস্থিতি ও ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডে পরিবারের সদস্যরা সহযোগিতা করেন কি না, এ প্রশ্নের উত্তরে ৩৮ জন (৮৪.৪৪%) সদস্য বলেছেন পরিবারের সকল সদস্যই সহযোগিতা করেন। কেউ বলেছেন, স্বামীর সহযোগিতা বেশি পান। নারী প্রতিনিধিদের অধিকাংশ মনে করেন, তাঁরা পরিবারের সদস্যদের সক্রিয় সহযেগিতার জন্যই এ পর্যায়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। ৭ জন (১৫.৫৬%) সদস্য বলেছেন, পরিবারের সহযোগিতা পান না। নিজের অনেক দায়িত্ব নিতে হয়।

সারণিঃ ২০. পারিবারের সদস্যদের সহযোগিতাঃ

পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা	সদস্য সংখ্যা	শতকরা হার
সহযোগিতা করেন	৩৮ জন	৮৪.৪৪%
সহযোগিতা করেন না	৭ জন	১৫.৫৬%
মোট	৪৫ জন	১০০%

পারিবারিক সিদ্ধান্তগ্রহণে মতামতের প্রাধান্যঃ

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের প্রায় সকলেই মত প্রকাশ করেছেন যে, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের নিজস্ব মতামতের প্রাধান্য রয়েছে। পারিবারিক কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে ২৯ জন (৬৪.৪৪%) নারী সদস্য কারো পরামর্শ গ্রহণ করেন না, অর্থাৎ নিজেই সিদ্ধান্তগ্রহণ করেন। ১৬ জন (৩৫.৫৬%) সদস্য পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বামীর পরামর্শ নেন।

সারণিঃ ২১ পারিবারিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণঃ

কার পরামর্শে	সদস্য সংখ্যা	শতকরা হার
পিতা	০	০
স্বামী	১৬ জন	৩৫.৫৬%
ছেলে	০	০
নিজ	২৯ জন	৬৪.৪৪%
মোট	৪৫ জন	১০০%

নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের সম্মানী ভাতাঃ

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য হওয়ায় নারী প্রতিনিধিদেরকে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সম্মানী ভাতা দেওয়া হয়, যার পরিমাণ ৯৫০ টাকা। সরকার কর্তৃক এই ভাতা নির্ধারিত। আবার ইউনিয়ন পরিষদের আয় থেকেও কিছু সম্মানী ভাতা দেওয়া হয়। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হিসেবে সরকার নির্ধারিত ও ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বরাদ্দকৃত ভাতা পান কি না, এ প্রশ্নের উত্তরে ইউনিয়ন পরিষদের ১১ জন সদস্য (২৪.৪৪%) বলেছেন ভাতা পান, ৩৪ জন (৭৫.৫৫%) উত্তরদাতা বলেছেন নিয়মিত পান না। যারা পান তাদের মধ্যে অনেকেই বলেছেন নিয়মিত পান না বকেয়া থাকে, চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞেস করলে বলেন, ফাণ্ডে টাকা নাই, ইউনিয়ন পরিষদের কোন আয় নাই তাই সম্মানী দেওয়া যায় না। এক এক মাসে এক এক পরিমাণ টাকা দেওয়া হয় এবং তা অনিয়মিত। কোন মাসে পান কোন মাসে পান না। কখনও সাত আট মাসের টাকা পর্যন্ত বাকী থাকে। তবে ১০০% নারী সদস্য বলেছেন সরকারী অংশ তারা নিয়মিত পান। সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে প্রায় ১০০% নারী সদস্যই বলেছেন সম্মানী যথেষ্ট নয়, বাড়ানো উচিত। পুরুষ সদস্যদের তুলনায় নারী সদস্যদের ভাতা বেশি হওয়া

উচিত কারণ পুরুষ সদস্যরা একটি ওয়ার্ড থেকে এবং নারী সদস্যরা তিনটি ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হন। নারী সদস্যরা যে সম্মানী ভাতা পান তাতে তাদের পরিষদে আসা যাওয়ার খরচও হয় না। এ কারণে নারী সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদের কাজের প্রতি গুরুত্ব ও আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন।

সারণিঃ ২২. নারী সদস্যদের সম্মানী ভাতাঃ

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভাতা		ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বরাদ্দকৃত ভাতা		শতকরা হার
সম্মানী ভাতা পান	১০০%	নিয়মিত ভাতা পান	১১ জন	২৪.৪৫%
সম্মানী ভাতা পান না	০	নিয়মিত ভাতা পান না	৩৪ জন	৭৫.৫৫%
মোট			৪৫ জন	১০০%

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রদান ও তা বাস্তবায়নঃ

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের সময় এলাকাবাসীকে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কি না, প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকলে সেগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে কি না এই প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের কাছে প্রশ্ন করা হলে ১০০% উত্তরদাতা বলেছেন নির্বাচনকালীন সময়ে এলাকাবাসীকে/জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, নারী নির্যাতন রোধ, নারী স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষার সুযোগ প্রদান, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি, রাস্তাঘাট সংস্কার ও নির্মান, টিউবওয়েল, বিদ্যুৎ সমস্যা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

প্রদত্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পেরেছেন কি না এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে ৩৪ জন (৭৫.৫৬%) বলেছেন নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন। ৮ জন (১৭.৭৮%) বলেছেন আংশিক পূরণ করতে সক্ষম হয়েছেন, ৩ জন (৬.৬৬%) কোন মন্তব্য করেননি। প্রাপ্ত এ তথ্যগুলো থেকেই ধারণা করা যায় ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনায় নারীরা কতটুকু ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছেন। নির্বাচিত গবেষণা এলাকায় পর্যবেক্ষণ কালে দেখা যায়, প্রায় অধিকাংশ নারী প্রতিনিধিই তাঁদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এলাকাবাসীর চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে অনেক নারী সদস্য হতাশ হয়ে পরবর্তীতে আর নির্বাচনে না দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সারণিঃ ২৩. নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণঃ

প্রশ্নের ধরণ	উত্তর	সদস্য সংখ্যা	শতকরা হার
নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ	হ্যাঁ	৩ জন	৬.৬৬%
	না	৩৪ জন	৭৫.৫৬%
	আংশিক	৮ জন	১৭.৭৮%
মোট		৪৫ জন	১০০%

পুনরায় নির্বাচনে অংশগ্রহণঃ

ভবিষ্যতে নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্নে ২৫ জন সদস্য (৫৫.৬%) স্বতঃস্ফুর্তভাবে বলেছেন, পরবর্তী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন, ১৫ জন (৩৩.৩৩%) জানিয়েছেন অংশগ্রহণ করবেন না, ৫ জন (১১.১১%) সদস্য বলেছেন , জনগণ যদি চায় ভবিষ্যতে চিন্তা ভাবনা করে দেখবেন। এখনই এটা বলার সময় আসেনি। গবেষণায় দেখা যায়, যারা পুনরায় নির্বচনে অংশগ্রহণ করতে চান তাঁদের সংখ্যাই বেশী। এদের উদ্দেশ্য নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা, এলাকার নারীদের সমস্যার সমাধান করা, গরীর দুঃখী মানুষের সেবা করা, জনগণের সার্বিক উন্নয়ন তথা এলাকার উন্নয়নে ভূমিকা পালন করা।

আর যারা ভবিষ্যতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চান না তারা বলেছেন, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করতে না পারা, ইউনিয়ন পরিষদের দূর্নীতি, চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের অসহযোগিতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতা না থাকা, কাজের কোন সুনির্দিষ্ঠ নীতিমালা না থাকা এবং পারিবারিক সমস্যার কারণে তাঁরা ভবিষ্যতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চান না।

সারণি; ২৪. পুনরায় নির্বাচনে অংশগ্রহণঃ

প্রশ্নের ধরণ	উত্তর	সদস্য সংখ্যা	শতকরা হার
পুনরায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ	হ্যাঁ	২৫ জন	৫৫.৬%
	না	১৫ জন	৩৩.৩৩%
	ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত নিবেন	৫ জন	১১.১১%
মোট		৪৫ জন	১০০%

ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট, ত্রান ও উন্নয়ন খাতে সম্পদঃ

ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট, ত্রান ও উন্নয়ন খাতে সম্পদ আছে এবং এগুলো সঠিক ভাবে বণ্টন করা হচ্ছে কী না, এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে উত্তরদাতাদের মধ্যে ২০ জন (৪৪.৩১%) বলেছেন ধারণা আছে, ২৫ জন (৫৫.৬৯%) বলেছেন তেমন কোন ধারণা নেই। বেশিরভাগ উত্তরদাতা বাজেট, ত্রান ও উন্নয়ন খাতের বরাদ্দ সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না। তবে কাবিখা, টি আর, ভি জি ডি, ভিজিএফ কার্ড, বয়স্কভাতা ও রিলিফের কাজ সম্পর্কে তাদের কিছু ধারণা আছে। কিন্তু এ সব কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা মিলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। উন্নয়ন প্রকল্পে কার্যক্রম পরিচালনায় নারীপ্রতিনিধিদের সভাপতি করা হলেও প্রকল্প কমিটির সদস্য হিসেবে পুরুষ মেম্বাররা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীপ্রতিনিধিদের পরিচালিত করেন এবং তাদের নিজস্ব ওয়ার্ডে পুরুষ মেম্বাররা তাদের প্রাধান্য বজায় রাখার চেষ্টা করেন।

সারণিঃ ২৫. বাজেট, ত্রাণ ও উন্নয়ন খাতে সম্পদ

প্রশ্নের ধরণ	উত্তর	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
বাজেট, ত্রাণ ও উন্নয়ন খাতে সম্পদ বরাদ্দ সম্পর্কে ধারণা	হ্যাঁ	২০ জন	৪৪.৩১%
	না	২৫ জন	৫৫.৬৯%
মোট		৪৫ জন	১০০%

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের নিয়মাবলী ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা আছে কি না, এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ৩০ জন (৬৬.২৮%) বলেছেন তারা তেমন কিছু জানেন না, ১৫ জন (৩৩.৭২%) বলেছেন জানা আছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, অধিকাংশ নারী প্রতিনিধিই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও পর্যাপ্ত ধারণা রাখেন না। ২ জন প্রতিনিধি বলেছেন, এ সব বিষয়ে তাদের স্বামী জানেন, কখনো কোন সমস্যা হলে স্বামীর সহযোগিতা চান। প্রশিক্ষণের অভাব, দায়িত্ব পালনের নিয়মাবলী সম্পর্কে সরকারি নির্দেশনার অভাব, চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের দায়িত্ব ও কাজ সম্পর্কে জানানোর নেতিবাচক মানসিকতা ইত্যাদি বিষয় দায়ী।

যারা দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানেন, তারা শিক্ষিত, কিছুটা পড়াশোনা করেছেন, রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, জানার আগ্রহ আছে এবং মোটামুটি পারিবারিক ভাবে পূর্বে পিতা ভাই বা স্বামীর ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সম্পৃক্ততা ছিল।

সারণিঃ ২৬. দায়িত্ব পালনের নিয়মাবলী সম্পর্কে ধারণাঃ

দায়িত্ব পালনের নিয়মাবলী সম্পর্কে	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার %
জানা আছে	৩০ জন	৬৬.২৮%
জানা নেই	১৫ জন	৩৩.৭২%
মোট	৪৫ জন	১০০%

সালিশ বিচারে অংশগ্রহণঃ

ইউনিয়ন পরিষদের কাজে অংশ হিসেবে নারী প্রতিনিধিদের এলাকার বিভিন্ন বিচার, সালিশ ও বিভিন্ন সভায় উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব দিতে হয়। নারী প্রতিনিধিদের সালিশ ও বিচার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন কী না প্রশ্ন করা হলে, ৮ জন (১৭.৭৮%) বলেছেন উপস্থিত থাকেন, ৩৭ জন (৮২.২২%) বলেছেন উপস্থিত থাকেন না। এদের মধ্যে ১ জন সদস্য বলেছেন সালিশ, বিচারে অংশ নেন, এলাকার মুরব্বিরা তাকে সম্মান করেন। না থাকার কারণগুলোর মধ্যে আছে পারিবারিক ব্যস্ততা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের অসহযোগিতা ইত্যাদি। অনেক সময় নারী সদস্যদের ডাকেন না। সালিশ বিচারে ডাকলেও সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এর মেম্বার ও চেয়ারম্যানের যোগসাজোশে বিচারকে প্রভাবিত করেন। এই পর্যায়ে দেখা যায়, নারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে অবহেলিত এবং কোন কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হচ্ছেন না।

সারণি : ২৭ সালিশ বিচারে অংশগ্রহণঃ

প্রশ্নের ধরণ	উত্তর	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার %
সালিশ বিচারে উপস্থিতি	হ্যাঁ	৮ জন	১৭.৭৮%
	না	৩৭ জন	৮২.২২%
মোট		৪৫ জন	১০০%

উন্নয়ন প্রকল্প কমিটি, অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে কমিটির প্রধান করাঃ

ইউনিয়ন পরিষদের কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য স্থায়ী/ স্ট্যাণ্ডিং কমিটি/অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করার ক্ষমতা ইউনিয়ন পরিষদকে দেওয়া হয়েছে। ১৯৮৩ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ এর অনুচ্ছেদ ৩৮ তে বলা হয়েছে যে, ইউনিয়ন পরিষদ প্রয়োজন বোধে কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে যে কোন কমিটি গঠন করতে পারবে। ১৯৯৩ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর ৩৮ ধারা অনুযায়ী পূর্বের ৭ টি স্ট্যাণ্ডিং কমিটির অতিরিক্ত আরও ৫ টি স্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠনের নির্দেশ প্রদান করে। স্থানীয় সরকার আইন, ২০০৯ এ ৪৫ নং ধারা মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদ তার কার্যাবলী বাস্তবায়ন করার জন্য ১৩ টি স্থায়ী (স্ট্যাণ্ডিং) কমিটি গঠন করতে পারবে। যেসব বিষয়ে পরিষদে বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না সেসব ক্ষেত্রে কমিটি সরেজমিনে পরিদর্শন, জনগণের মতামত গ্রহণ ও বিচার বিশ্লেষণ করে পরিষদের কার্যক্রমে সহয়তা প্রদান করবে। স্থায়ী কমিটি গঠন প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদেরকে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং প্রজেই ৩/ বিবিধ ১৪/২০১১/৮০১ তারিখ : ১০/৯/২০০২ এর প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদে স্থায়ী কমিটিগুলোর প্রতিটিতে মোট সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ সদস্য হবে সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য। মোট স্থায়ী কমিটির এক তৃতীয়াংশের চেয়ারম্যান হবেন সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য। নারী সদস্যদেরকে ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্প কমিটি, অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত কমিটি ও অন্যান্য কমিটির সদস্য করা হয় কি না, এ প্রশ্নের উত্তরে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় আইন বা বিধি বিধান যা আছে তা ঠিক মত বাস্তবায়ন করা হয় না। কোন কমিটির সাথে জড়িত কি না, এ প্রসঙ্গে ১৬ জন (৩৫.৩৪%) বলেছেন জড়িত, ২৯ জন (৬৪.৬৬%) বলেছেন জড়িত না। ইউনিয়ন পরিষদের নিয়ম মাফিক কমিটি গঠন করা হয় কি না, প্রশ্নের উত্তরে ৩১ জন (৬৮.৭৯%) বলেছেন নিয়ম মাফিক কমিটি গঠন করা হয় না। ১৪ জন (৩১.২১%) বলেছেন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি গঠন না করা এবং কমিটির সদস্য না করার পেছনে চেয়ারম্যান ও পুরুষ মেম্বারদের অসহযোগিতার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া, কোন কোন নারী সদস্য জানেনই না যে মোট স্থায়ী কমিটির এক তৃতীয়াংশের চেয়ারম্যান হবেন সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য।

সানণিঃ ২৮.১ উন্নয়ন প্রকল্প কমিটি সম্পর্কে ধারণাঃ

প্রশ্নের ধরণ	উত্তর	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
কোন কমিটির সাথে জড়িত কি না	হ্যাঁ	১৬ জন	৩৫.৩৪%
	না	২৯ জন	৬৪.৬৬%
মোট		৪৫ জন	১০০%

সারণি: ২৮.২ নিয়ম মাফিক কমিটি গঠন

প্রশ্নের ধরণ	উত্তর	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
নিয়ম মাফিক কমিটি গঠন করা হয় কি না	হ্যাঁ	১৪ জন	৩১.২১%
	না	৩১ জন	৬৮.৭৯%
মোট		৪৫ জন	১০০%

সাধারণ জনগণের মনোভাবঃ

গবেষণাধীন এলাকার উত্তরদাতা নারী প্রতিনিধিদের ২১ জন (৪৬.৭%) সদস্য মনে করেন সাধারণ জনগণ তাদের কাজে সন্তুষ্ট নন। ১৮ জন (৪০.০০%) সদস্য মনে করেন সাধারণ জনগণ আংশিক সন্তুষ্ট এবং বাকী ৬ জন (১৩.৩%) সদস্য মনে করেন জনগণ তাদের কাজে সন্তুষ্ট ।

সারণিঃ ২৯ সাধারণ জনগণের মনোভাবঃ

প্রশ্নের ধরণ	উত্তর	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
সাধারণ জনগণ আপনার কাজে সন্তুষ্ট কি না	হ্যাঁ	৬ জন	১৩.৩%
	না	২১ জন	৪৬.৭%
	আংশিক	১৮ জন	৪০.০০%
মোট		৪৫ জন	১০০%

যারা মনে করেন সাধারণ জনগণ সন্তুষ্ট নন তারা বলেছেন, বিভিন্ন উন্নয়ন খাত যেমন ভিজিডি / ভিজিএফ, বন্যা বা দুর্যোগের ত্রাণ, শিক্ষা, বয়স্ক বিধবা ভাতা, রাস্তা ঘাট সংস্কার ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে চাল, গম, শাড়ি, লুঙ্গি, ঔষধ, সার স্যানিটারি টয়লেট ইত্যাদি পান, সেগুলো বিতরন করতে গেলে এলাকার সাধারণ জনগণের কাছে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। কারণ, এক জন সাধারণ সদস্য এক ওয়ার্ডের প্রতিনিধি অন্যদিকে এক জন নারী সদস্য তিন ওয়ার্ডের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন। পরিষদের এক জন সাধারণ সদস্য এক ওয়ার্ডে যে বরাদ্দ পান তিন ওয়ার্ড মিলে এক জন নারী সদস্য সেই একই পরিমান বরাদ্দ পেয়ে থাকেন। তিন ওয়ার্ডে বিতরণের সময় এলাকার জনগণকে সন্তুষ্ট করা যায় না। এলাকার জনগণের চাহিদা অনেক। তখন এলাকাবাসীর নানা কটুক্তি শুনতে হয়। এক জন নারী সদস্য ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, সরকার নারী প্রতিনিধিদেরকে এ সব কাজে নামিয়ে লাঞ্চিত করেছেন। সরকারের এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। কেউ কেউ বলেছেন জনগণ তাদের উপর আংশিক সন্তুষ্ট। এ অর্থে তিনি (নারী সদস্য) যা পেয়েছেন তাই দিবেন। চেয়ারম্যান না দিলে উনি (নারী সদস্য) দিবেন কীভাবে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে বোঝা যায়, নারী সদস্যরা তাদের এলাকায় সাধারণ জনগণকে সন্তুষ্ট করতে সমর্থ হচ্ছেন না।

রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততাঃ

ইউনিয়ন পরিষদের নারী প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা আছে কী না, তা যাচাই করার জন্য প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। উত্তর দাতাদের মধ্যে ২৯ জন (৬৪.৪৪%) বলেছেন হ্যাঁ। ১৬ জন বলেছেন (৩.৫৬%) বলেছেন না। যে সকল নারী প্রতিনিধির ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে তাঁরা পরিষদের সুযোগ সুবিধা বেশি পান এবং তারা প্রভাবশালী।

সারণিঃ ৩০. রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা

প্রশ্নের ধরণ	উত্তর	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা আছে কি না	হ্যাঁ	২৯ জন	৬৪.৪৪%
	না	১৬ জন	৩৫.৫৬%
মোট		৪৫ জন	১০০%

দায়িত্ব পালনে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের অসহযোগিতাঃ

পেশাগত দায়িত্ব পালনে রাজনৈতিক দলের কোন চাপ অথবা অসহযোগিতা আছে কী না, এ প্রশ্নের উত্তরে ২৯ জন (৬৪.৪৪%) বলেছেন হ্যাঁ। ৭ জন (১৫.৫৬%) বলেছেন না। ৯ জন (২০.০০%) সদস্য কোন মন্তব্য করতে রাজী হননি। উন্নয়নমূলক কাজ যেমন ভিজিডি, ভিজিএফ কার্ড বিতরণ, ভাতা বরাদ্দ, গম বণ্টন ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের কিছুটা চাপ থাকে। এছাড়া, প্রায় প্রত্যেক উত্তরদাতাই বলেছেন কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের পৃথক রাজনৈতিক দল থাকলে এবং চেয়ারম্যান এক দলের এবং সদস্যরা অন্য রাজনৈতিক দলের হলে কাজ করতে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, নারী সদস্যরা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত নয়।

সারণি : ৩১ দায়িত্ব পালনে রাজনৈতিক দলের প্রভাব

প্রশ্নের ধরণ	উত্তর	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
দায়িত্ব পালনে রাজনৈতিক দলের প্রভাব আছে কি না	হ্যাঁ	২৯ জন	৬৪.৪৪%
	না	৭ জন	১৫.৫৬%
	মন্তব্য করেন নি	৯ জন	২০.০০%
মোট		৪৫ জন	১০০%

ইউনিয়ন পরিষদের সভায় এলাকার সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণঃ

পরিষদের সভায় এলকার সুনির্দিষ্ট সমস্যাগুলো তুলে ধরতে পারেন কি না এবং সমস্যা উত্থাপিত হলে সমস্যা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেওয়া হয় কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮ জন (১৭.৭৮%) বলেছেন এলাকার সমস্যা তুলে ধরেন ও তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ৭ জন (১৫.৫৬%) বলেছেন সমস্যা তুলে ধরেন, কিন্তু কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। তারা জানেন এলাকার সমস্যা জানিয়ে কোন লাভ নেই। এদের মধ্যে ২ জন নারী সদস্যের বাড়ির সামনের রাস্তা খারাপ, বৃষ্টির দিনে আরও খারাপ হয়ে যায়। এভাবেই তিনি পরিষদে আসা যাওয়া করেন। বার বার বলেও কোন লাভ না হওয়ায় তিনি এখন আর পরিষদে এসে কোন কথা বলেন না। নারী মেম্বারের বাড়ির সামনে রাস্তার এমন আবস্থা দেখে অনেক সময় এলাকার জনগণ কটুক্তি

করে। ৩০ জন (৬৬.৬৬%) সদস্য মনে করেন তারা এলাকার সমস্যা তুলে ধরেছেন এবং তার আংশিক সমাধানের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

তবে অধিকাংশ সদস্যের মতামত, এলাকার সমস্যা সমাধানে তেমন কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। এলাকা বাসী তাদের কাজ করার জন্য নির্বাচিত করেছে, কিন্তু নারী সদস্যরা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারছেন না। চেয়ারম্যানের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ দেওয়া হয়ে থাকে। বেশির ভাগ পুরুষ সদস্য নারীদের অযোগ্য মনে করে। পুরুষ সদস্যরা নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে কাজ ভাগাভাগি করে নেয়। নির্বাচিত গবেষণা এলাকা পর্যবেক্ষণ কালে জানা যায়, এলাকার নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ তেমন সক্রিয় ও সন্তোষজনক নয়।

সারণি ঃ ৩২ এলাকার সমস্য সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণঃ

প্রশ্নের ধরণ	উত্তর	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার %
এলাকার সমস্য সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় কি না	পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়	৮ জন	১৭.৭৮%
	পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না	৭ জন	১৫.৫৬%
	আংশিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়	৩০ জন	৬৬.৬৬%
মোট		৪৫ জন	১০০%

প্রদত্ত ক্ষমতা বাস্তবায়নে বাধাঃ

নারী প্রতিনিধিদের বাস্তবে যে সব কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় সেগুলো পালন করতে গেলে কোন ধরণের বাধার সম্মুখীন হন কি না প্রশ্ন করা হলে, ২৯ জন (৬৪.৪৪%) বলেছেন বাধার সম্মুখীন হন। ১৬ জন (৩৫.৫৬%) বলেছেন কোন ধরণের বাধার সম্মুখীন হন না। প্রভাবশালীরা কাজে বাধা দেয় কি না অথবা কী ধরণের বাধা আসে, সেই সম্পর্কে তারা বলেছেন, উন্নয়নমূলক কোন কাজ করতে হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষ সদস্যদের সাহায্য সহযোগিতা নিতে হয়। স্থানীয় জনগণ অনেক সময় নারীদের কথাকে গুরুত্ব দেয় না, নারীরা

কোন কাজ করতে পারে না এ ধরণের নেতিবাচক মনোভাব ও মানসিকতা, স্থানীয় রজনীতির কারণে বিভিন্ন বাধা। নারী সদস্য সংখ্যায় কম হওয়ায় ও ওয়ার্ড সংখ্যা বেশি হওয়ায় বিভিন্ন কাজ ও সিদ্ধান্ত নিতে বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

সারণিঃ ৩৩. প্রদত্ত ক্ষমতা বাস্তবায়নে বাধা

প্রশ্নের ধরণ	উত্তর	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ক্ষমতা বাস্তবায়নে বাধার সম্মুখীন হন কি না	হ্যাঁ	২৯ জন	৬৪.৪৪%
	না	১৬ জন	৩৫.৫৬%
মোট		৪৫ জন	১০০%

প্রশিক্ষণঃ

নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা ইউনিয়ন পরিষদে যোগদানের পর এ পর্যন্ত কোন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন কি না, এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে ৪ জন (৮.৮৯%) বলেছেন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ৪১ জন (৯১.১১%) বলেছেন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেননি। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না এ প্রশ্নে ১০০% সদস্যই বলেছেন অবশ্যই প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বেশির ভাগ উত্তরদাতার প্রশিক্ষণ নেই। কিন্তু তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণে বিশেষভাবে আগ্রহী। তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে ইউনিয়ন পরিষদের বিধিবিধান ও নিয়মাবলী সম্পর্কে তারা জানতে পারবেন এবং তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিক ভাবে পালন করতে পারবেন। পরিষদের নিয়মাবলী সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় তারা সুষ্ঠু ও সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালনে বাধাগ্রস্থ হচ্ছেন।

সারণিঃ ৩৪. প্রশিক্ষণ গ্রহণ

প্রশ্নের ধরণ	উত্তর	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
প্রশিক্ষণের গ্রহণ করেছেন কি না	হ্যাঁ	৪ জন	৯১.১১%
	না	৪১ জন	৮.৮৯%
মোট		৪৫ জন	১০০%

নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কে ধারণাঃ

নারী প্রতিনিধিদের নির্বাচনী এলাকার প্রধান প্রধান সমস্যা সম্পর্কে ধারণা আছে কি না এ বিষয়ে সক্ষাৎকার গ্রহণকালে দেখা যায়, ৩৪ জন (৭৫.৫৫%) সদস্যের এই সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে, ৭ জন (১৫.৫৬%) সদস্যের মোটামুটি ধারণা আছে এবং ৪ জন (৮.৮৯%) সদস্যের তেমন কোন ধারণা নেই। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নির্বাচিত নারী সদস্যদের সাক্ষৎকার গ্রহণকালে তাদের নিজ নিজ এলাকার প্রধান সমস্যাগুলোর কথা জানতে চাওয়া হলে তারা যে সমস্যার কথা বলেছেন এ বিষয়ে সাধারণ জনগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণকালেও একই তথ্য পাওয়া যায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কে নারী প্রতিনিধিরা খবর রাখেন এবং যথেষ্ট সচেতন।

সারণিঃ ৩৫. নির্বাচনী এলাকার সমস্যা সম্পর্কে ধারণা

প্রশ্নের ধরণ	উত্তর	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
এলাকার সমস্যা সম্পর্কে ধারণা আছে কি না	ধারণা আছে	৩৪ জন	৭৫.৫৫%
	ধারণা নেই	৪ জন	৮.৮৯%
	মোটামুটি ধারণা আছে	৭ জন	১৫.৫৬%
মোট		৪৫ জন	১০০%

নিম্নে নারী সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত তাদের ইউনিয়ন পরিষদের অর্ন্তভুক্ত এলাকার সমস্যাগুলো তুলে ধরা হলঃ

সিলেট বিভাগ ঃ

লোডশেডিং, ঋণের অভাব, বেকারত্ব, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, শিক্ষার হার কম, দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যের দাম বেশি, এলাকার লোকজন কর্ম বিমুখ।

বরিশাল বিভাগঃ

সুপেয় পানির অভাব, পর্যাপ্ত সংখ্যক নলকূপের অভাব, নদী ভাঙ্গন, অনুন্নত রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ, অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ, পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকা, স্যানিটেশন ব্যবস্থাও চাহিদা অনুযায়ী কম।

খুলনা বিভাগঃ

এলাকায় গরীব লোকের সংখ্যা বেশি, রাস্তা ঘাটের সমস্যা, টিউবওয়েল, স্যানিটেশন সমস্যা, বিদ্যুৎ সমস্যা, তালাক, যৌতুক ও নারী নির্যাতন সমস্যা।

ঢাকা বিভাগঃ

ঈদগা মাঠ না থাকা, খেলাধুলা ও বিনোদনের পর্যাপ্ত মাঠ না থাকা, সরকারি কিংবা বেসরকারী হাসপাতালের অপর্যাপ্ততা, গ্যাসের চাপ কম, খাবার পানির তীব্র সংকট, ড্রেনেজ ও স্যুয়ারেজ ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় কম। ময়লা আবর্জনা ফেলার জায়গার অভাব।

রাজশাহী বিভাগঃ

টিউবওয়েলের চাহিদা বেশি, সন্ত্রাসী কার্যক্রম বেশি, অভাবী লোকের সংখ্যা বেশি।

৫.৩ চেয়ারম্যানগণের মতামতঃ

গবেষণা এলাকাধীন ১৫ টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণের কাছ থেকে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের সম্পর্কে নির্বাচনে অংশগ্রহণ, সভা কর্মকাণ্ডে নিয়মিত উপস্থিতি, দায়িত্ব পালন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। চেয়ারম্যান পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং তারা সবাই মহিলা সদস্যদের সাথে কাজ করছেন।

রইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণকে সমর্থন করেন কি না এই প্রশ্নের জবাবে ১৫ জন (১০০%) উত্তরদাতাই বলেছেন তারা নির্বাচনে নারী প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণকে সমর্থন করেন। একজন চেয়ারম্যান নারী প্রতিনিধিদের সম্পর্কে বলেছেন, পরিষদে নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। সরকার আইন করে

উনাদের দিয়েছেন কাজেই মানতেই হবে। পরিষদে সকল সদস্যের উনি সহযোগিতা করেন। সদস্যরাও তাকে সহযোগিতা করেন। পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো। অন্য একজন চেয়ারম্যান নারীর অংশগ্রহণকে সমর্থন করেন এ অর্থে যে, এলাকার নারীদের বিষয়গুলি নারীরা যত সহজে বুঝতে পারেবে পুরুষ সদস্যদের পক্ষে ততটা সহজভাবে বোঝা সম্ভব হবে না। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে সবাই একমত।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে নির্বাচিত নারীদের কোন ভূমিকা আছে কি না এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ৮ জন (৫৩.৩৩%) চেয়ারম্যান বলেছেন ভূমিকা আছে, ৭ জন (৪৬.৬৭%) চেয়ারম্যান বলেছেন ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে নানা সীমাবদ্ধতা আছে। নারীরা এখনো ভূমিকা পালন করার মত যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। নারীরা শিক্ষিত না, যে পদ তাদেরকে দেয়া হয়েছে সেই কাজ সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট ধারণা না থাকায় তারা সঠিকভাবে কাজ করতে পারছেন না। অনেক বিষয়ে তারা বোঝেও না। কাজেই তাদের শিক্ষিত হতে হবে, কাজ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দক্ষতা অর্জন করলেই নারী সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। একজন চেয়ারম্যান অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন, ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একজন নারীর ভূমিকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে এলাকার নারীদের সমস্যার কথাগুলো তুলে ধরার একমাত্র মাধ্যম হল নারী প্রতিনিধিরা। কারণ, নারীদের দ্বারাই এলাকার নারী বিষয়ক সমস্যাগুলো সমাধান করা সহজ। নারীরা নারীদের সমস্যা যেভাবে বুঝতে পারে, খোলামেলা আলোচনা ও তাদের সাথে মিশতে পারবে একজন পুরুষ সদস্যের পক্ষে তা কখনই সম্ভব না। পরিষদকে শক্তিশালী করায় নারীদের ভূমিকা অত্যন্ত জরুরী।

সভা কর্মকাণ্ডে উপস্থিতিঃ

সভা ও কর্মকাণ্ডে নারীদের উপস্থিতি বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে ১৩ জন (৮৬.৭৬%) চেয়ারম্যান বলেছেন, নারীরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে পরিষদের সভায় উপস্থিত থাকেন। সভায় নারী সদস্যদের ডাকার পর তারা আসেননি বা উপস্থিত থাকেননি এমন নজির নেই। ২ জন (১৩.৩৩%) চেয়ারম্যান বলেছেন, পারিবারিক ও স্বাস্থ্যগত কারণে দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নন বলে ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক সভায় নারী প্রতিনিধিরা অনুপস্থিত থাকেন। একজন চেযারম্যান বলেছেন, পারিবারিক ব্যস্ততার কারণে নারী সদস্যরা উপস্থিত না হতে পারলে স্বামীকে পাঠিয়ে দেন। আর একজন চেয়ারম্যান বলেছেন, মাঝে মাঝে উপস্থিত না থাকার যে কারণ সেটা পুরুষ

সদস্যদের ক্ষেত্রেও ঘটে থাকে। গবেষণা এলাকা পর্যবেক্ষণে জানা যায়, নারী সদস্যরা পরিষদের কর্যক্রমে আগ্রহী এবং সভায় তাদের উপস্থিতি সন্তোষজনক।

তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনঃ

নারী প্রতিনিধিদের উপর অর্পিত দায়িত্ব তারা যথাযথভাবে পালন করেন কি না, এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে ৯ জন (৬০%) চেয়ারম্যান বলেছেন, তারা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম। এদের মধ্যে ৩ জন (২০%) চেয়ারম্যান বলেছেন, নারীদেরকে তিনি বেশি কাজ দেন এবং তাদের কথা শোনেন পরিষদের উন্নয়নমূলক কাজের সাথে তাদেরকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেন। নারীদের কাজে তিনি সন্তুষ্ট। তারা দুর্নীতি কম করেন, দায়িত্বশীল, তারা যেহেতু নতুন এবং সংখ্যায় কম সে কারণে তাদেরকে গুরুত্ব এবং মর্যাদা দিতে হবে। অনেক সময় তারা ভুল করবে এক্ষেত্রে ভুলগুলি ধরিয়ে দিয়ে তাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে। তাহলেই কেবল তারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে। ৬ জন (৪০%) উত্তরদাতা বলেছেন তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব তারা যথাযথ ভাবে পালন করতে পারেন না। তাদের কর্যক্রমেও সন্তুষ্ট না। সববিষয়ে পুরুষ সদস্যদেরকে সহযোগিতা করতে হয়। দায়িত্ব সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। নারী সদস্যদের নির্ভরশীলতা বেশি।

ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পর্কে ধারণাঃ

কেন্দ্রীয় সরকার নারী সদস্যদেরকে যে সব দায়িত্ব দিয়েছে সে সম্পর্কে নারী সদস্যদের কোন ধারণা আছে কি না, এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে, ৯ জন (৬০%) চেয়ারম্যান বলেছেন, সব দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের জানা নেই। দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা কম থাকায় তারা অনেক কিছু বুঝে উঠতে পারে না। সভার আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। ৬ জন (৪০%) চেয়ারম্যান বলেছেন, দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা আছে। তবে সব দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের জানা নেই। মাসিক যে সভা হয় সেখানে চেয়ারম্যান তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা কম থাকায় এবং বাইরের জগতে আসা যাওয়া কম করায় নারী সদস্যরা যে কোন বিষয় একটু কম বোঝে। যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদেরকে দায়িত্ব ও কাজ সম্পর্কে ধারণা দেওয় সম্ভব।

সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিঃ

সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্যদের সংখ্যা বাড়ানো উচিত কি না এ প্রশের উত্তরে ১৪ জন (৯৩.৩৩%) চেয়ারম্যান বলেছেন, আর বাড়ানো উচিত না, যা আছে তাই থাক। বরং এদের কাজকে সুনির্দিষ্ট করে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তোলা উচিত। ১ জন (৬.৬৭%) চেয়ারম্যান বলেছেন, নারী সদস্যের একার পক্ষে তিনটি ওয়ার্ডে কাজ করা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এই অর্থে তাদের সংখ্যা বাড়ানো উচিত। নারী প্রতিনিধিরা প্রায়ই অভিযোগ করেন তারা কাজ পান না, এর সত্যতা কতটুকু, এ প্রসঙ্গে ৩ জন (২০%) চেয়ারম্যান বলেছেন, এর সত্যতা আছে তবে দায়িত্বশীল না হওয়ায়, কাজ না বোঝার কারণে তাদের কাজ দেওয় হয় না। ১২ জন (৮০%) চেয়ারম্যান বলেছেন, এটা ঠিক না, এর কোন সত্যতা নেই। কারণ, সরকারি নিয়মেই আছে তাদের দিয়ে কাজ করাতে হবে যেমন এলজিএসপি (লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট) শীর্ষক প্রকল্প গঠন করা হলে যার মধ্যে কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ কমিটির সভাপতি থাকেন সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য। এছাড়া, সংরক্ষিত নারী আসন ভিত্তিক একটি করে স্কিম সুপারভিশন কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির এক তৃতীয়াংশ সদস্য নারী। কাজেই, নারীদের কাজ দেওয়া হয় না এই অভিযোগ এখন আর সঠিক নয়।

পুরুষ সদস্যদের মত দায়িত্ব দেয়া উচিত কি নাঃ

নারী সদস্যদের পুরুষ সদস্যদের মত দায়িত্ব দেয়া উচিত কি না, এ প্রসঙ্গে ৯ জন (৬০%) চেয়ারম্যান বলেছেন, তাদেরকে পুরুষ সদস্যদের মত দায়িত্ব দেওয়ার পরিবেশ এখনও তৈরি হয়নি। প্রচলিত নিয়ম ও নীতিমালার আলোকে নারীদেরকে পুরুষদের মত দায়িত্ব দিলে তারা তা পালন করতে সক্ষম হবেন না। একজন চেয়ারম্যান বলেছেন, নারী সদস্যরা বেশী কথা বলেন। নিজের দায়িত্ব পালনের নিয়মাবলী সম্পর্কে ধারণা না থাকায় ইউনিয়ন পরিষদের সভায় না বুঝেই অনেক সময় অনেক কথা বলেন, থামানো যায় না। সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদেরকে সুনির্দিষ্ট কাজের নীতিমালা ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না করে অন্তর্ভুক্ত করায় পরিষদের জন্য এক ধরণের বাড়তি ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে।

৬ জন (৪০%) চেয়ারম্যান বলেছেন, পুরুষদের মত দায়িত্ব দেয়া উচিত। কাজের দায়িত্ব দিলে তারা পুরুষ সদস্যগণের মতই যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে। একজন চেয়ারম্যান মনে করেন প্রথমে তাদেরকে শিক্ষিত হতে হবে, প্রশিক্ষণ দিতে হবে তারপর কাজের দায়িত্ব দিতে হবে। তাদেরকে কাজের সাথে সম্পৃক্ত না

করলে তারা কোনদিনই যোগ্য হয়ে গড়ে উঠবে না। নারী সদস্যদেরকে তিনি বেশি বেশি কাজ দেওয়ার পক্ষে। পুরুষদের মত দায়িত্ব না দিয়ে সামাজিক কাজে উৎসাহী ও অনুপ্রাণিত এবং দায়িত্বাবলী পালনে আগ্রহী করার জন্য তাদেরকে নারী বিষয়ক কার্যক্রম, পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ের উপর কিছু দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেয়া উচিত।

নারী সদস্যদের কার্যক্রমে আপনি সন্তুষ্ট কি নাঃ

নারী সদস্যদের কার্যক্রমে সন্তুষ্ট কি না এ প্রসঙ্গে ৮ জন (৫৩.৩৩%) চেয়ারম্যান বলেছেন, নারী সদস্যদের কাজে সন্তুষ্ট না। নারী সদস্যরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিজে সক্রিয় থেকে কোন কাজ করতে আগ্রহী হয় না। সব সময় মানসিকতা থাকে স্বামী বা অন্যের সহযোগিতায় কাজ সম্পন্ন করার। একজন চেয়ারম্যান বলেছেন, অর্থবরাদ্দের বিষয় থাকলে তখন নারী সদস্যদের আগ্রহ বেশি থাকে। কিন্তু অন্যান্য সমাজ উন্নয়নমূলক ও বিচার সালিশে তেমন আগ্রহ দেখান না এবং উপস্থিতও থাকেন না। অনেক ক্ষেত্রে তিনি কেন সভায় এসেছেন সেটাই জানেন না। ৭ জন (৪৬.৬৭%) চেয়ারম্যান নারী প্রতিনিধিদের কার্যক্রমে সন্তুষ্ট। তিনি নারীদেরকে ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত করেন, নিয়ম অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদান করেন। নারীরা দুর্নীতি কম করে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী প্রতিনিধিরা আগ্রহী কি নাঃ

সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও ইউনিয়ন পরিষদের অন্যান্য কর্মকাণ্ডে নারী প্রতিনিধিরা আগ্রহী কি না, এ প্রশ্নের উত্তরে ৭ জন (৪৬.৬৭%) উত্তরদাতা বলেছেন, পরিষদের কর্মকাণ্ডে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী প্রতিনিধিদের যথেষ্ঠ আগ্রহ আছে। নারী প্রতিনিধিরা ইউনিয়ন পরিষদের জরুরি ও সাধারণ সভায় উপস্থিত থেকে গঠনমূলক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন কমিটির প্রধান করা হয়। এক জন চেয়ারম্যান উল্লেখ করেছেন তার পরিষদের দুই জন নারী সদস্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও অন্যান্য উন্নয়রমূলক কর্মকাণ্ড দক্ষতার সাথে পালন করেন। কিন্তু অন্য আর একজন সদস্য সেই তুলনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে কম অংশগ্রহণ করেন। ৮ জন (৫৩.৩৩%) চেয়ারম্যান বলেছেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে আগ্রহী না। সবসময় পরিবারের সদস্য, অথবা পরিষদের অন্যান্য মেম্বারদের সহযোগিতায় কাজ সম্পন্ন করতে চান।

দায়িত্ব পালনে বাধাঃ

নারী সদস্যরা দায়িত্ব পালনে কোন বাধার সম্মুখীন হন কি না, এ প্রশ্নের উত্তরে ৯ জন (৬০%) চেয়ারম্যান বলেছেন কোন ধরণের বাধার সম্মুখীন হন না। জনগণ এখন অনেক সচেতন হয়েছে। নারীদের কাজকে তারা মেনে নিয়েছেন। নারী সদস্যগণ জনগণের সহযোগিতায় অনেক উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। ৩ জন (২০%) চেয়ারম্যান বলেছেন, তারা দায়িত্ব পালনে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। প্রধান সমস্যাগুলো হচ্ছে, নির্বাচনী এলাকা বড়, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, সহযোগিতার অভাব, সম্মানী ভাতা কম, শ্রমিক নিয়ন্ত্রণে কৌশলের অভাব, শিক্ষায় অনগ্রসরতা, কাজ না বোঝা এবং মাঠ পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতার অভাব ইত্যাদি।

সালিশ বিচারে অংশগ্রহণঃ

সালিশ বিচারে অংশগ্রহণ করেন কি না, এ প্রসঙ্গে, ৯ জন (৬০%) চেয়ারম্যান বলেছেন সালিশ বিচারে অংশগ্রহণ করেন না। তাদের বিচারকার্যে দক্ষতার অভাব রয়েছে এবং পারিবারিক সমস্যার কারণে দীর্ঘসময় সলিশ/বিচারে উপস্থিত থেকে কাজে তৎপরতা দেখাতে পারেন না। ৩ জন (২০%) চেয়ারম্যান বলেছেন, মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকেন। ৩ জন (২০%) চেয়ারম্যান বলেছেন, তারা সালিশ বিচারে অংশগ্রহণ করেন এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাদের যথেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা আছে এবং সালিশ ব্যবস্থায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

নারী সদস্যদের অবদানঃ

আপনার ইউনিয়নে নারী সদস্যরা কোন অবদান রেখেছেন কি না এ প্রশ্নের উত্তরে ৭ জন (৪৬.৬৭%) চেয়ারম্যান বলেছেন, নারী সদস্যদেরকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তা তারা খুব দক্ষতার সাথেই সম্পন্ন করেছেন এবং এলাকার উন্নয়নে অবদান রেখেছেন। নারী সদস্যগণ সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত থেকে মাঠ পর্যায়ের কাজে প্রয়োজনীয় তদারকি করে ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নে যথেষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন বলে চেয়ারম্যানগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ৪ জন চেয়ারম্যান (২৬.৬৬%) বলেছেন পরিবারের সদস্য এবং পরিষদে অন্যান্য পুরুষ মেম্বারদের সহযোগিতায় নারী সদস্যরা এলাকার উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অবদান রেখেছেন। ৪ জন (২৬.৬৭%) চেয়ারম্যান এলাকার উন্নয়নে নারী প্রতিনিধিদের অবদান সম্পর্কে তেমন কোন মন্তব্য করেননি।

নারী সদস্যদের সাথে সম্পর্ক ঃ

ইউনিয়ন পরিষদের নারী প্রতিনিধিদের সাথে চেয়ারম্যানদের সম্পর্ক কি ধরণের তা জানতে এবং তাদের মধ্যে পরস্পারিক সম্পর্ক যাচাই করার লক্ষ্যে তাঁদেরকে প্রশ্ন করা হয়। প্রায় সব চেয়ারম্যানই বলেছেন (১০০%) তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ভাল এবং সহযোগিতামূলক। ভালো বলতে তারা বুঝিয়েছেন, যে কোন ব্যাপারে পরস্পর মত বিনিময় করেন, পরিষদে বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কারো কোন সমস্যা হলে এগিয়ে আসেন সহযোগিতা করেন এবং নিয়ম ও বিধি অনুযায়ী নারী প্রতিনিধিদেরকে কাজ করার সুযোগ দিয়ে থাকেন।

গবেষণা এলাকা পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, নারী প্রতিনিধিদের কাজেকে কোন কোন চেয়ারম্যান সহযোগিতা করেন, তাদের অংশগ্রহণ সমর্থন করেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন।

৫.৪ পুরুষ সদস্যদের মতামতঃ

স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করায় নির্বাচিত নারী সদস্যরা কোন ভূমিকা পালন করতে সক্ষম কি না, এ বিষয়ে প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের তিন জন পুরুষ সদস্যকে প্রশ্ন করে উত্তর সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া নারী প্রতিনিধিদের প্রতি পুরুষ সদস্যদের মনোভাব যাচাইয়ের জন্যও তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণকে সমর্থন করেন কি না, এর উত্তরে ৩৩ জন (৭৩.৩৩%) সরাসরি উত্তর দিয়েছেন সমর্থন করেন, ১২ জন (২৬.৬৭%) উত্তর দিয়েছেন সমর্থন করেন না। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা নারীদের অংশগ্রহণের উপযোগী না। নারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম। এছাড়া অন্যান্য কারণেও তারা নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণকে সমর্থন করেন না।

ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করায় ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের কোন ভূমিকা আছে কি না এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে জানতে চওয়া হলে ১১ জন (২৪.৪৪%) সদস্য বলেছেন ভূমিকা আছে। ৩৪ জন (৭৫.৫৬%) সদস্য বলেছেন, নারী সদস্যদের কোন ভূমিকা নাই। একজন সদস্য বলেছেন সরকার স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে আগ্রহী, কিন্তু সরকার স্থানীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় অর্থ ও ক্ষমতা দেয় না। ইউনিয়ন পরিষদ নিজেই শক্তিশালী না, ইউনিয়ন পরিষদে যে বরাদ্দ আসে তার পরিমাণ সীমিত। পরিষদের নিজস্ব আয় নেই, মেম্বারদের সন্মানী ভাতা কম, সংসদ সদস্যদের অনাকাংঙ্খিত হস্তক্ষেপ, আমলাতন্ত্রের জটিলতা এসব

কারণে এখন পর্যন্ত স্থানীয় সরকার হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ নিজেই একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিণত হতে পারেনি। সেখানে নারী প্রতিনিধিরা ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করতে আদৌ কোন ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে না। স্থানীয় সরকার হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদে অর্থ বরাদ্দ এমপি এবং উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে না দিয়ে সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদকে দিতে হবে। চেয়ারম্যানদের দুর্নীতি কমাতে হবে, মেম্বারদের সম্মানীভাতা বাড়াতে হবে, নারী সদস্যদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে, লিখিত নির্দেশ, নারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে নারী সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

ইউনিয়ন পরিষদের সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকা প্রসঙ্গে ৩৮ জন (৮৪.৪৪%) সদস্য বলেছেন উপস্থিত থাকেন। ২ জন (৪.৪৪%) সদস্য বলেছেন নিয়মিত থাকেন না। ৫ জন (১১.১২%) সদস্য বলেছেন মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকেন। নিয়মিত যারা উপস্থিত থাকেন তাদের সম্পর্কে উত্তরদাতারা বলেছেন নারী প্রতিনিধিরা ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকেন। স্বতঃস্ফুর্তভাবে মতামত তুলে ধরেন এবং কাজ করার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী। সভায় নিয়মিত উপস্থিত না থাকলে কেন থাকেন না এর উত্তরে বলেছেন, পারিবারিক অসুবিধা, যাতায়াতের সমস্যা,কাজে অনীহা, ব্যক্তিগত ভাবে কাজ না বোঝা ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম সম্পর্কে অজ্ঞতা ইত্যাদি কারণে তারা পরিষদে উপস্থিত থাকেন না। মাঝে মাঝে যারা উপস্থিত থাকেন তারা নানান অজুহাতে অনুপস্থিত থাকেন। পরিষদে উপস্থিত থাকলেও অল্প সময় অবস্থান করে চলে যান। একজন উপস্থিত থাকলে ২ জন অনুপস্থিত থাকেন। অনেক সময় নারী প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে তাদের পক্ষে স্বামী উপস্থিত থাকেন।

নারী প্রতিনিধিদের কার্যক্রমে সন্তুষ্ট কি এর উত্তরে, ২৮ জন (৬২.২২) সদস্য বলেছেন , তাদের কার্যক্রমে সন্তুষ্ট। ১২ জন (২৬.৬৭%) বলেছেন, তাদের কর্যক্রমে সন্তুষ্ট না। ৫ জন (১১.১১%) সদস্য কোন মন্তব্য করেননি। যারা সন্তুষ্ট তারা বলেছেন, নারী সদস্যরা পুরুষ সদস্যদের চেয়ে অফিস বেশি করে। তাদের মতে, আগের চেয়ে বর্তমানে মহিলা সদস্যরা দায়িত্ব পালনে আগ্রহী বেশি।

একজন সদস্য নারীদের কার্যক্রমে সন্তুষ্ট। তিনি ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন বিধায় নারী প্রতিনিধিদের দিয়ে পরিষদের উন্নয়নমূলক কাজ করান। নারী সদস্যরা দায়িত্বে থাকেন, তিনি তদারকি করেন। নারী সদস্যদের সাথে সুম্পর্ক বজায় আছে। যারা সন্তুষ্ট না তারা বলেছেন প্রশিক্ষণের অভাব, শিক্ষার অভাব, নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আসায় কাজের নিয়মাবলী সম্পর্কে ধারণা না থাকায় পরিষদের কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করতে পারেন না।

ইউনিয়ন পরিষদের কাজ ও নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা আছে কি না এই প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে ৫ জন (১১.১১%) সদস্য বলেছেন ধারণা আছে, ২৪ জন (৫৩.৩৩%) বলেছেন ধারণা নেই, ১৬ জন (৩৫.৫৬%) বলেছেন অল্পকিছু ধারণা আছে। একজন সদস্য বলেছেন, ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম সম্পর্কে নারী প্রতিনিধিরা কোন ধারণা রাখেন না। নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তাঁরা সচেতন নন। কোথায় কোন প্রকল্প আছে সেই সম্পর্কে তারা কোন দাবি করতে পারেননা। তাই অনেক সময় তাকে কাজের সুযোগ দেওয়া যায় না।

ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়ানো উচিত কি না এই প্রসঙ্গে ৪২ জন (৯৩.৩৩%) সদস্য বলেছেন নারী প্রতিনিধিদের সংখ্যা আর বাড়ানো উচিত না। ৩ জন (৬.৬৭%) বলেছেন সংখ্যা বাড়ান উচিত। না বাড়ানো প্রসঙ্গে বলেছেন, নারীরা আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি সচেতন। ১৯৯৭, ২০০৩ সলে নির্বাচিত নারী সদস্যরা তেমন কোন ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এখন অবস্থার উন্নতি হয়েছে। কাজের পরিবেশ তৈরি হয়েছে, এলাকার জনগণ সহযোগিতা করে থাকে। কাজেই নারী প্রতিনিধিদের সংখ্যা না বাড়িয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে, সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, কাজের সুযোগ দিতে হবে, কাজের ক্ষেত্র সুনিদিষ্ট করে দিতে হবে। তাদের কার্যক্রমকে বেতন কাঠামোর আওতায় আনা উচিত। আর্থিক বরাদ্দ দেয়া উচিত যাতে তারা উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। পুরুষ সদস্যদের তুলনায় তাদের ওয়ার্ড সংখ্যা বেশি। ওয়ার্ডের কাজগুলো যাতে দায়িত্বের সাথে পালন করতে পারে সেই ব্যাপারে বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে সমন্বয় করে বরাদ্দ দেয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। পাশাপাশি কাজের মনিটরিং ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকা উচিত। নারী প্রতিনিধিরা সংখ্যায় কম, পরিষদে পুরুষদের প্রধান্য বেশি, ওয়ার্ড সংখ্যাও নারীদের বেশি। সেই তুলনায় বরাদ্দ কম। এসব কারণে ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের সংখ্যা বাড়ানো উচিত বলে উত্তর দাতারা মনে করেন। নারীদের পুরুষদের মত দায়িত্ব দেয়া উচিত কি না এ প্রসঙ্গে ২৮ জন (৬২.২২%) মনে করেন তাদের পুরুষদের মত দায়িত্ব দেয় উচিত নয়। একজন পুরুষ সদস্য বলেছেন, নারী নেতৃত্বের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। উনারা ঘরে থাকবেন। বাস্তবক্ষেত্রে নারীদের ইউনিয়ন পরিষদে আসা যাওয়া ছাড়া আর কোন কাজ নেই। ব্যক্তিগত ভাবে নারীদের বোধশক্তি কম, আগের থেকে সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত না থাকায় ইউনিয়ন পরিষদের স্বাভাবিক কাজকর্ম করতেও পারে না, বোঝেও না। এই জন্য তাদের পুরুষদের মত দায়িত্ব দেওয়া উচিত না। আর একজন সদস্য বলেছেন, নারীদের পুরুষদের মত দায়িত্ব না দিয়ে পরিষদে পুরুষদের সহযোগী হিসেবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া উচিত। ১৪ জন (৩১.১১%) সদস্য মনে করেন নারীদের পুরুষদের মত দায়িত্ব দেয়া উচিত। দায়িত্ব পেলে কাজের পরিবেশ সৃষ্টি হলে কাজের

সহযোগিতা করলে তারাও দক্ষতার সাথে পুরুষদের মত দায়িত্ব পালনে সক্ষম। ৩ জন (৬.৬৭%) সদস্য কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।

দায়িত্ব দিলে নারী প্রতিনিধিরা যথাযথ ভাবে সে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম কি না এই প্রশ্নের উত্তরে ২৭ জন (৬০%) বলেছেন, দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করতে পারেন না। এলাকার জনগণ নারী সদস্যদের কাছে কোন সমস্যা নিয়ে সাধারণত যায় না। যে সব নারী প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে আসছে তাদের যোগ্যতা নেই। যোগ্য লোককে নেতৃত্বে আসা উচিত। পুরুষ সদস্যদের সহযোগিতায় অথবা পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতায় নারীরা দায়িত্ব পালন করে থাকেন। ৮ জন (১৭.৭৮%) সদস্য মনে করেন দায়িত্ব পালন করতে পারেন। ১০ জন (২২.২২%) সদস্য মনে করেন আংশিক পারেন, পুরোটা পারেন না।

চেয়ারম্যান বা পুরুষ সদস্যরা নারী প্রতিনিধিদের কাজকে গুরুত্ব দেন কি নাঃ

চেয়ারম্যান বা পুরুষ সদস্যরা নারী প্রতিনিধিদের কাজকে গুরুত্ব দেন কি না প্রশ্ন করা হলে উত্তরদাতাদের একজন সদস্য বলেছেন, ইউনিয়ন পরিষদে পুরুষ সদস্যদেরই কোন গুরুত্ব নেই। যার সাথে সম্পর্ক ভাল চেয়ারম্যান তাকেই কাজ দেন। সে নারী হোক আর পুরুষই হোক। অনেক সময় চেয়ারম্যান তার ইচ্ছামত পরিষদের সভা আহ্বান করেন, সভায় নামে মাত্র সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় চেয়ারম্যানের ইচ্ছা মাফিক। টি.আর, কাবিখা, প্রকল্পগুলোতে সরকার যে অর্থ দিচ্ছে সেই অর্থ কোথায়, কীভাবে ব্যয় করা হচ্ছে তা পরিষদের কোন সদস্য জানতে পারে না। নারী বা পুরুষ সদস্য এখানে কোন বিষয় না। এক ওয়ার্ডে কাজ হচ্ছে অন্য ওয়ার্ডে চেয়ারম্যান ইচ্ছা করে বরাদ্দ দিচ্ছেন না, তাই কাজ হচ্ছে না। চেয়ারম্যান নিজেই স্বাক্ষর নকল করে টাকা তুলে নেয়। পরিষদের নামে যে অর্থ বরাদ্দ হয় তার সমুদয় অর্থ **সচি**বের সহায়তায় নিজেই তুলে নিয়ে যায়।

৫.৫ ইউনিয়ন পরিষদের সচিবদের মতামতঃ

ইউনিয়ন পরিষদের ১৫ জন সচিবের মধ্যে অধিকাংশ সচিবই উল্লেখ করেন, নারী সদস্যগণ পুরুষ সদস্যগণের ন্যায় দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হচ্ছেন না। ৫টি কারণে নারী সদস্যরা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছেন। সেই কারণগুলোর মধ্যে মূলত: শিক্ষাগত যোগ্যতা কম থাকা, প্রশিক্ষণের অভাব, অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞতা,

সংরক্ষিত ও সাধারণ আসনে দ্বন্দ্ব, সম্মানী ভাতা কম ইত্যাদি প্রধান। একজন সচিব উল্লেখ করেন, চেয়ারম্যান নারী সদস্যদের অগ্রাধিকার দেন, নারীরা পরিষদের সভায় যে কোন বিষয়ে প্রস্তাব করতে পারেন। কিন্তু তাঁরা অজ্ঞতার কারণে অনেক সময় চুপ করে থাকেন। নারী প্রতিনিধিদের সমস্যাও আছে। অজ্ঞতার কারণে তারা নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে পারে না। এই জন্যে বাস্তবে তাদের কাজ সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত। নারীরা দুর্নীতি কম করে। দায়িত্ব দিলে তা সুষ্ঠুভাবে পালন করে। অনেক নারী সদস্য কমিটির সভাপতি হবেন। কিন্তু তিনি তা জানেন না। (L.G.S.P.) প্রকল্প বাস্তবায়নে হচ্ছে কিন্তু এ সম্পর্কে তার কোন ধারণা নাই। তিনি কিছু জানেন না। ভিজিডি কার্ড সরবরাহ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে পুরুষ সদস্যদের সহযোগিতা নিতে হয়। তবে নারীরা ক্রমান্বয়ে উন্নতি করছেন। একবারে তাদের পক্ষে সবকিছু করা সম্ভব নয়। সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হয়ে আসলেও সাধারণ আসনের সদস্যরা তাদেরকে অবহেলা করেন। এক ওয়ার্ডে একজন পুরুষ সদস্য যে ভাতা পান তিন ওয়ার্ড মিলে একজন নারী সদস্য সেই একই ভাতা পেয়ে থাকেন। কাজেই এই ভাতা বৈষম্য থাকা উচিত নয়।

আর এক জন সচিব বলেছেন, নারী প্রতিনিধিরা সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন এবং নারী সদস্যরা তাদের ওয়ার্ডের সকল সমস্যার কথা স্ট্যাণ্ডিং কমিটির মিটিং সহ সকল সভায় তুলে ধরেন। নারী সদস্যদের বিধবা ভাতা, গর্ভবতী ভাতা, ভিজিডি কার্ড বিতরণে মহিলাদের তালিকা তৈরি সহ কিছু কিছু কাজ নির্দিষ্ট করে দেয়া ছাড়াও সকল কাজে নারী সদস্যদের মতামতের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। যদি আর্থিক মিটিং থাকে তাহলে নারী সদস্য বেশি আগ্রহ নিয়ে উপস্থিত থাকেন।

অধিকাংশ সচিবই বিশেষ ভাবে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়ে জোর দিয়েছেন। নারী সদস্যদের অনেকে আছেন, যাদের কোন রকম স্বাক্ষর জ্ঞান আছে তারা নির্বাচিত হয়ে আসছেন। এরা কোন রকমের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখতে পারেন না। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হিসেবে নারী পুরুষ উভয়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে স্থানীয় সরকারের সকল ধাপ আরও উন্নত হবে। ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করায় ও নারীদের যথাযথ ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে।

৫.৬ সাধারণ জনগণের মতামত জরিপঃ

গবেষণাধীন এলাকার প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে ১০ জন করে সাধারণ জনগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সাধারণ জনগণের মধ্যে বিভিন্ন পেশার ৩ জন পুরুষ ও ৩ জন নারী, ২ জন এনজিও কর্মী এবং ২ জন ছাত্র-ছাত্রীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এভাবে ১৫টি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে মোট ১৫০ জন সাধারণ জনগণের কাছ থেকে তথ্য ও মতামত সংগ্রহ করা হয়। নিম্নে সারণির মাধ্যমে তা উপস্থাপন করা হলঃ

সারণিঃ ৩৬. সাধারণ জনগণের মতামত জরিপঃ

উত্তরদাতার পেশা	সদস্য সংখ্যা	পুরুষ+মহিলা
শিক্ষক	২০ জন	১৫+৫
চাকুরী	১০ জন	৮+২
ব্যবসা	১০ জন	৭+৩
গ্রাম পুলিশ ও অন্যান্য	২০ জন	১৫+৫
গৃহিনী	৩০ জন	০+৩০
এনজিও কর্মী	৩০ জন	১৫+১৫
ছাত্র-ছাত্রী	৩০ জন	১৫+১৫
মোট	১৫০ জন	৭৫+৭৫

স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের কোন ভূমিকা আছে কি না এ বিষয়ে সাধারণ জনগণের কাছে প্রশ্ন করে যে তথ্য পাওয়া যায় তা নিম্নের সারণিতে তুলে ধরা হয়েছে এবং তা বিশ্লেষণ ধরা হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণকে সমর্থন করেন কি না এই প্রশ্নের উত্তরে ৯২ জন (৬১.৩৩%) বলেছেন তাঁরা নারীদের অংশগ্রহণকে সমর্থন করেণ, ৩৬ জন (২৪%) বলেছেন নারীদের অংশগ্রহণকে একেবারেই সমর্থন করেন না। ২২ জন (১৪,৬৭%) বলেছে আংশিক সমর্থন করেণ। কেউ কেউ

বলেছেন, এজন্য অংশগ্রহণের পাশাপাশি নারীদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। শিক্ষিত ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের সংকীর্ণ মনোভাব পরিবর্তন করা উচিত। যারা অংশগ্রহণকে সমর্থন করেন না, তাঁরা বলেছেন নারীদের রাজনীতি করার কোন দরকার নেই। তাঁরা ঘরে থাকবেন। পর্দা মেনে চলবে অংশিক সমর্থন করেন যারা তাঁরা বলেছেন, নারী তাঁদের সীমার মধ্যে থাকবে, পর্দা মেনে চলবে। শরিয়ত মোতাবেক ধর্মীয় অনুশাসন মেনে যদি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চায় তাহলে আসতে পারেন।

স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করায় নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের কোন ভূমিকা আছে কি না এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের কাছে প্রশ্ন করা হলে ৬৬ জন (৪৪%) বলেছেন হ্যাঁ, ৪৬ জন (৩০.৬৭%) বলেছেন না, ৩৮ জন (২৫.৩৩%) বলেছেন এ বিষয় সম্পর্কে তাঁরা অবগত নন বিধায় তেমন কিছু বলতে পারেন নি। যারা হ্যাঁ বলেছেন তাঁদের ধারণা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার শক্তিশালীকরণে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের অবশ্যই ভূমিকা আছে। কিন্তু তাঁরা নানা সীমাবদ্ধতার কারণে বর্তমানে ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছেন না। নারীরা শিক্ষিত না, তাঁরা নিম্ন আয়ের পরিবার থেকে এসেছে। বরাদ্দ বণ্টনের ক্ষেত্রে পুরুষ সদস্যের দ্বরা বৈষম্যের শিকার হন। তাঁদের যথাযথ দায়িত্ব দেয়া হয়না বিধায়, তাঁরা ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করায় তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারছেন না। যদি তাঁদেরকে সঠিকভাবে দায়িত্ব দেয়া হয়, সহযোগিতা করা হয় তাহলে তাঁরা ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন। যারা না বলেছেন, তাঁরা চাননা নারীরা রাজনীতিতে আসুক। নারীরা ঘরে থাকবে। পর্দা মেনে চলবে। স্থানীয় এদের কোন প্রয়োজন নেই। তাঁরা অলস অজুহাত দেখানোর প্রবণতা বেশি। পরিবার ও সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকায় ইউনিয়ন পরিষদে তাঁদের কোন ভূমিকা নাই।

নির্বাচনের সময় নারী প্রতিনিধিরা এলাকা বাসীকে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কি না এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকলে তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছেন কি না এ বিষয়ে শ্রশ্ন করলে ৩৮ জন (২৫.৩৩%) উত্তরদাতা বলেছেন হ্যাঁ, ৭৬ জন (৫০.৬৭%) বলেছেন কোন প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারেন নাই। নির্বাচনের সময় নারী প্রার্থীরা দেখা করেন, যোগাযোগ রাখেন, খোঁজ খবর নেন। নির্বাচনে জয়ী হবার পর আর খোঁজ খবর রাখেন না, দেখা করতে গেলে চেনেন না। ৩৬ জন (২৪%) বলেছেন আংশিক বাস্তবায়ন করেছেন, তাঁরা যা পেয়েছেন তা প্রয়োজনের তুলনায় একবারেই কম। তারপরও নারী প্রতিনিধিদের কাজে তাঁরা সন্তুষ্ট।

নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের দ্বারা এলাকার উন্নয়ন ও সমস্যার সমাধান করা সম্ভব কি না জানতে চাওয়া হলে উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৮ জন (৪৫.৩৩%) বলেছেন হ্যাঁ। ৫৬ জন (৩৭.৩৩%) না বলেছেন, ২৬ জন (১৭.৩৪%) কোন মন্তব্য করেন নি। যারা হ্যাঁ বলেছেন তাঁর মনে করেন, নারী প্রতিনিধিদের দ্বারা এলাকার উন্নয়ন

করা সম্ভব। তাঁদেরকে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা উচিত এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যেমে তাঁদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলা উচিত।

সারণিঃ ৩৭.১ সাধারণ জনগণের মতামত

প্রশ্নের ধরণ	উত্তর	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নারীদের সমর্থন করেণ কি না	হ্যাঁ	৯২ জন	৬১.৩৩%
	না	৩৬ জন	২৪%
	আংশিক	২২ জন	১৪.৬৭%
স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করায় নারীর কোন ভূমিকা আছে কি না	হ্যাঁ	৬৬ জন	৪৪%
	না	৪৬ জন	৩০.৬৭%
	মন্তব্য করেন নি	৩৮ জন	২৫.৩৩%
নির্বাচনের সময় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা বাস্তবায়ন করেছিলেন কি না	হ্যাঁ	৩৮ জন	২৫.৩৩%
	না	৭৬ জন	৫০.৬৭%
	আংশিক	৩৬ জন	২৪%
নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের দ্বারা এলাকার উন্নয়ন ও সমস্যার সমাধান করা সম্ভব কি না	হ্যাঁ	৬৮ জন	৪৫.৩৩%
	না	৫৬ জন	৩৭.৩৩%
	মন্তব্য করেন নি	২৬ জন	১৭.৩৪%

সারণিঃ ৩৭.২

প্রশ্নের ধরণ	উত্তর	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
নারীদের পুরুষের মত দায়িত্ব দেয়া উচিত কি না	হ্যাঁ	৬৯ জন	৪৬%
	না	৬৫ জন	৪৩.৩৩%
	মন্তব্য করেন নি	১৬ জন	১০.৬৭%
দায়িত্ব পেলে নারীরা তা সঠিকভাবে পালন করতে সক্ষম কি না	হ্যাঁ	৬৮ জন	৪৫.৩৩%
	না	৫৬ জন	৩৭.৩৩%
	মন্তব্য করেন নি	২৬ জন	১৭.৩৩%
নারী প্রতিনিধিদের কাজে আপনি সন্তুষ্ট কি না	হ্যাঁ	৫৬ জন	৩৭.৩৩%
	না	৪৬ জন	৩০.৬৭%
	আংশিক	৪৮ জন	৩২%

৬৯ জন (৪৬%) সাধারণ জনগণ মনে করেন স্থানীয় সমস্যা সমাধানে নারীদের পুরুষদের মত দায়িত্ব দেওয়া উচিত। ৬৫ জন (৪৩.৩৩%) মনে করেন একবারেই উচিত নয়, নারীরা পর্দার মধ্যে থাকবে, রাজনীতি কখনই করবে না। ঘর সংসার দেখা নারীর প্রধান কাজ। ১৬ জন (১০.৬৭%) কোন মন্তব্য করেন নি।

দায়িত্ব দিলে নারীরা তা সঠিক ভাবে পালন করতে সক্ষম কি না এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ৬৮ জন (৪৫.৩৩%) উত্তরদাতা মনে করেন নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের দায়িত্ব দিলে তারা তা সঠিক ভাকে পালন করতে সক্ষম। ৫৬ জন (৩৭.৩৩%) মনে করেন নারীরা তাদের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করতে সক্ষম না। প্রাপ্ত মতামতগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, নারীদেরকে সাঠিক দায়িত্ব না দেওয়া, ইউনিয়ন পরিষদে পুরুষ সদস্যদের

প্রাধান্য দেওয়া, নারীদের শিক্ষগত যোগ্যতা কম থাকা, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব, বাইরের জগতে কাজ না করা, বৃহত্তর নির্বাচনী এলাকা ইত্যাদি। এসব কারণে নারীরা তাদের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করতে সক্ষম হন না। ২৬ জন (১৭.৩৩%) এবিষয়ে কোন মন্তব্য করতে রাজি হন নি।

নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের কাজে সন্তুষ্ট কি না এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে হ্যাঁ বলেছেন, ৫৬ জন (৩৭.৩৩%)। না বলেছেন, ৪৬ জন (৩০.৬৭%) । সন্তুষ্ট না হওয়ার কারণগুলোর মধ্যে ছিল নারীরা কাজে তেমন দক্ষ নয়, তাঁদের মধ্যে কাজের প্রতি অনিহার ভাব বেশি, নারীর অলস পরনির্ভরশীল। আংশিক সন্তুষ্ট ৪৮ জন (৩২%)। তাঁরা বলেছেন ভাল মন্দ দুটোই, সবার কাছে যে নারী ভাল হবে এমন নয়।

নির্বাচিতনারী প্রতিনিধিদেও সম্পর্কে এলাকার জনগণের মনোভাব যাচায়ের জন্য প্রশ্ন করা হলে ৪৮ জন (৩২%) বলেছেন ভাল, ৫৬ জন (৩৭.৩৩%) বলেছেন ভাল না, ৪৬ জন (৩০.৬৭%) বলেছেন ভাল মন্দ দুটোই।

সিলেট অঞ্চলের একজন উত্তরদাতা বলেছেন, তাঁদেও এলাকায় ধর্মীয়মূল্যবোধ বেশি যার জন্য নারীরা অনেক রক্ষণশূীল, এলাকার অনেক ধারণ জনগণ চান না নারীরা রাজনীতি করুক। রাজনীতিতে ন্রীদেও নিয়মিত হওয়ার দরকার নেই, তাঁরা ঘরের মধ্যে থাকবে। রাজনীতি করলে নারীদেও চরিত্র ভাল থাকে না। নারীরা অলস, সাংসারিক অজুহাত দেখানোর প্রবণতা বেশি। তাদের কাজগুলো ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। স্থানীয় সরকারের এদের কোন প্রয়োজন নেই। এরা পরিবারের কাজ নিয়ে, সাংসারিক কাজে বেশি ব্যস্ত থাকে বিধায় ইউনিয়র পরিষদের কাজে কোন মনোযোগ দিতে পারে না। এদের কাজ শুধুমাত্র সুযোগ পেলে টাকা খাওয়া।

একজন উত্তরদাতা বলেছেন, নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের সম্পর্কে এলাকার সাধারণ মানুষের ধারণ কি তা তিনি জানেন না, তবে তিনি নারীদের ভাল চান, তাদেরকে উৎসাহ দিতে চান, তাঁরা এগিয়ে আসুক, জন প্রতিনিধি হিসেবে তাঁরা দায়িত্ব পালন করুক। নারীরা অবরেহলার শিকার, পুরুষদের অসহযোগিতার কারণে সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেনা। কম সুযোগ পায়, তাঁদের সহযোগিতা করা উচিত। কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত।

নির্বাচনের আগে বা পরে দায়িত্ব পালনে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা কি কি বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন এ বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, নির্বাচনের আগে নারীদের যে সব বাধা ছিল সেগুলো হল নির্বাচনী এলাকায় জনসংযোগের তৎপরতা কম ছিল। এ প্রসঙ্গে এক জন উত্তরদাতা বলেছেন, সিলেট আঞ্চলের জনগণ

রক্ষণশীল হওয়ায় পুরুষ সদস্যরা নির্বাচনী প্রচারাভিযানে নারীদের তেমন সাহায্য করেনি। পারিবারিক জবাবদিহিতা, পুরুষের বৈরী মনোভাব, সামাজিক অসংঙ্গতি, নারীদের সঠিক ভাবে কাজ করতে না দেওয়া নারী বলে তাঁদের কাজকে কম গুরুত্ব দেওয়া, উৎসাহিত না করা, নারী হওয়ায় বিড়ম্বনায় পড়া ইত্যাদি।

ইউনিয়ন পরিষদের পুরুষদের অনিহার দৃষ্টি, পুরুষ সদস্য ও চেয়ারম্যানের সাথে দ্বন্দ্ব। নির্বাচনের সময় তাঁদেরকে ইতিবাচকভাবে দেখা হলেও নির্বাচনের পর তাঁদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়।

কেউ কেউ বলেছেন, এখন আর ধর্মীয় বা সামাজিক বাধা তেমন কাজ করেনা। মানুষ আগের চেয়ে এখন অনেক সচেতন হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের যে সব সীমাবদ্ধতার কথা সাধারণ জনগণ উল্লেখ করেছেন, বাস্তবে গবেষণাধীন এলাকায় নারী প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায়, নারী প্রতিনিধিরা তাঁদের কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতন, দায়িত্বপেলে তা সঠিকভাবে পালন করতে সক্ষম। এই সকল মানসিকতা পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় বহন করে এবং এসব বিষয় গুলো নারীর জন্য সমস্যা সৃষ্টির কারণ ও নারী দের আত্মবিশ্বাসের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাড়ায়।

সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নারী তার অধস্তন অবস্থা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পেয়েছেন। ইউনিয়ন পরিষদের নানা সমস্যা ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও এলাকার জনগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছেন, এলাকার সমস্যা নিয়ে পরিষদের সভাগুলোয় মতামত তুলে ধরছেন, নিজেদের দাবি দাওয়া এলাকার নির্যাতিত নারীদের বিষয়গুলোও তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছেন। বিভিন্ন এনজিও, নারী সংগঠনগুলো নারীর সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও সামাধানে সুযোগ পেয়েছেন।

নারী নির্বাচনী প্রচারণায় এলাকার জনগণের সাথে পরিচিত হচ্ছেন। জনগণ তাদের সমস্যা, অভিযোগ নিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করছেন। এভাবে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদে নারী অংশগ্রহণ করলে এ ব্যবস্থার অধীনে থেকে গ্রাম পর্যায়ে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠবে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ

৬.১ ভূমিকা

৬.২ কেইস স্টাডি

৬.১ ভূমিকাঃ

১৯৯৭ সালের আগে মনোনয়ন প্রথায় নারী সদস্যরা নিজস্ব যোগ্যতার পরিবর্তে চেয়ারম্যান মেম্বারদের সাথে আত্মীয়তা, পরিবার, বংশের প্রভাব ইত্যাদির ভিত্তিতে নির্বাচিত হতেন। পরোক্ষভাবে নির্বাচিত ৯২৭ জন সদস্যদের উপর ১৯৯৬ সালে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, নারী সদস্যদের ৪০ শতাংশ চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের দ্বারা, ৪৮ শতাংশ আত্মীয়দের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। পরোক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিজস্ব চেষ্টা বা যোগ্যতার পরিবর্তে অন্যান্য নির্বাচনে বিশেষ করে পুরুষদের ইচ্ছা অনিচ্ছা মূখ্য ভূমিকা পালন করে। ফলে মনোনীত সদস্যরা পরিষদের সভায় আলোচনা কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে সুযোগ পেতেন না। এমনকি পরিষদের সভায় উপস্থিতও থাকতেন না। যারা উপস্থিত হতেন, তারাও কোন নীতিনির্ধারণী বা অন্য ধরনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন না। পুরুষ সদস্যদের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন দিয়ে যেতেন।[১]

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গঠিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কমিশন (১৯৯৩ এবং ১৯৯৬) নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত এক তৃতীয়াংশ আসনে সরাসরি নির্বাচনের জোর সুপারিশ ব্যক্ত করে। ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যরা প্রথম বারের মত প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হন। এই অগ্রগতি শুধু স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তরে গ্রামীণ নারীদের অংশগ্রহণের পথকেই উন্মুক্ত করেনি, সেই সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের জনগণের সেবা করার আকাঙ্খাকেও পূরণ করেছে।

স্থানীয় সরকারে নারীর এই অধিকার এবং মেধাপ্রয়োগের প্রথম অভিজ্ঞতা পুরুষ নিয়ন্ত্রিত, পুরুষতান্ত্রিক জনবিশ্বের (Public World) বাস্তবতাকেও প্রকট করে তোলে। কিন্তু নীতিগত সুপারিশ এবং তদারকি কর্মকাণ্ডে (Follow up Actions) প্রায়শই এই ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করা হয়। এর ফলে নতুন এই ভূমিকায় নারী প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়।[২]

স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা কী ভূমিকা পালন করছেন এই প্রসঙ্গে গবেষণা এলাকার উত্তরদাতাদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সিদ্ধান্তগ্রহণ, ক্ষমতাচর্চা ও কার্যকরী অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন

হচ্ছেন। প্রাপ্ত তথ্যগুলোর আলোকে নারী প্রতিনিধিদের প্রধান সমস্যাগুলো আলোচনা করা হলো এবং তার ভিত্তিতে কিছু সুপারিশ করা হলোঃ

প্রাথমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যগণ প্রতিনিয়ত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। তাঁরা তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হচ্ছেন না।

ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কাজের সরকারি নীতিমালার অভাব রয়েছে। নারী প্রতিনিধিদের কাজ বা ভূমিকা সুস্পষ্ট ভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। আর সে জন্যই নারীদের কাজ করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ইউনিয়ন পরিষদ সংক্রান্ত আইন, অধ্যাদেশ ও বিধিবিধানে নারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট করে কোন দায়িত্ব বা কাজ ভাগ করে দেওয়া হয় নাই।

১৯৯৩ সালে ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশের সংশোধনী মোতাবেক ৩টি সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের জন্য সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা হলেও সাধারণ সদস্যদের পাশাপাশি তারা কী ভূমিকা পালন করবে তা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি। আইনের এই অসম্পূর্ণতার কারণে ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের অংশগ্রহণে সমস্যা সৃষ্টি হলে সরকার পরবর্তীতে পরিপত্র জারি করে নারী সদস্যদের কিছু কাজের তালিকা তৈরি করে। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য বেশির ভাগ স্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে সভাপতি হিসেবে নারীকে অন্তর্ভুক্ত করণের আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীদের অধিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের অনীহার কারণে বেশিরভাগ ইউনিয়ন পরিষদে কোন স্ট্যাণ্ডিং কমিটিই গঠন করা হয় নাই। কোন ইউনিয়ন পরিষদে গঠন করা হলেও পুরুষ সদস্যরা নারীদের পরিবর্তে নিজেরাই এসব কমিটিগুলোতে দায়িত্ব পালন করছেন। পাঁচ বছর মেয়াদী ইউনিয়ন পরিষদে ১ জন চেয়ারম্যান, ৯ জন সদস্য এবং ৩ জন সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যসহ মোট ১৩ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হন। সংরক্ষিত আসন সাধারণ আসনের চেয়ে তিনগুণ বড়। তিনটি সংরক্ষিত নারী আসনের প্রত্যেকটি তিনটি নির্বাচনী এলাকা নিয়ে গঠিত হবে। এই বিধানটি একটি কাঠামোগত সমস্যা সৃষ্টি করেছে যা ব্যাপকভাবে নারীর ভূমিকা ও কাজকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। এই আইনটির জটিলতার কারণে প্রশাসনিক, আর্থিক ও সময় সংক্রান্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়, যার কারণে নারী প্রতিনিধিরা জনগণের সেবা করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। গবেষণা এলাকা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে নির্বাচন কালীন সময়ে

নারী প্রতিনিধিরা স্থানীয় জনগণের কাছে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন, তাদের উপর জনগণের প্রত্যাশা ও চাহিদা বেশি।

কিন্তু নারী সদস্যরা পুরুষের চেয়ে তিনগুণ বড় নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। অনেক সময় দেখা যায় বয়স্ক ভাতা, বিধাবা ভাতা, ভিজিএফ কার্ড ইত্যাদি সংগ্রহ করার জন্য দরিদ্র অসহায়, দুঃস্থ ও নির্যাতিত নারী ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করে। নারী প্রতিনিধিরা নিজেদের উদ্যোগে দরিদ্র নারীদের তালিকা তৈরি করে ইউনিয়ন পরিষদে জমা দেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের এই তালিকা চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা পরিবর্তন করে তাদের নিজেদের পছন্দ মত নিজেদের লোককে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করান। দরিদ্র নারীদের নাম তালিকাভুক্ত না হওয়ায় তারা নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং এ থেকে তৈরি হয় চরম অসন্তোষ।

নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের সংরক্ষিত আসন সাধারণ আসনের চেয়ে তিনগুণ বড়। তারপরও সরকারি ভাতার পরিমাণ অত্যন্ত কম। ভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও নানা অনিয়মের সম্মুখীন হতে হয়। নিয়মিত ভাতা পাওয়া যায় না, বকেয়া থাকে। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে গবেষণা এলাকায় নারী প্রতিনিধিদের পরিবারের মাসিক আয় প্রায় সকলেরই পাঁচ হাজার থেকে পনের হাজার টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ প্রায় সকলেই নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছেন। অধিকাংশ নারী সদস্যই গৃহিণী এবং দরিদ্র। নিজস্ব উপার্জন না থাকায় ইউনিয়ন পরিষদে আসা যাওয়া বাবদ যে খরচ হয় তার জন্য তার নিজের পক্ষে অর্থ সংকুলান করা সম্ভব হয়ে উঠে না। অনেক সময় দেখা যায় এই অপর্যাপ্ত ভাতা বা সম্মানীর কারণে ইচ্ছা থাকা স্বত্ত্বেও এলাকার জনগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়ে উঠে না, যা কিনা পরিষদের কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভাবে কাজ করার পথে বাধা সৃষ্টি করছে। তাই সকল সদস্যই তাদের সম্মানী বৃদ্ধির কথা বলেছেন।

ইউনিয়ন পরিষদে দায়িত্ব সম্পাদনের বিষয়গুলি সরকার আইন ও বিধি প্রণয়ন করে নির্দিষ্ট করে দেয়। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে ইউনিয়ন পরিষদের সভায়। প্রত্যেক পরিষদে, প্রতি মাসে চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে এবং উক্ত সভা অফিস সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু বাস্তবে খুব কম ক্ষেত্রেই ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা হলেও দেখা যায় সভার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তাৎক্ষণিক ভাবে না লিখে পরে মনগড়া নিজেদের পছন্দমত সিদ্ধান্ত লেখা হয়। মাসিক সভায় নারী প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকলেও

তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয় না। কোন কোন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা নারীদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা মেনে নিতে পারেননি।

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের ৩০ দিনের মধ্যে এক বছর মেয়াদের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রথম সাধারণ সভায় ইউনিয়ন পরিষদ আইন, **২০০৯ এর ৪৫ নং** ধারা মোতাবেক পরিষদ তার কার্যাবলী সুচারুরূপে বাস্তবায়ন করার জন্য **১৩** টি স্থায়ী কমিটি গঠন করবে। স্থায়ী কমিটির সভাপতি পরিষদের সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। সংরক্ষিত আসন থেকে নারী সদস্যগণ **১/৩** অংশ স্থায়ী কমিটির সভাপতি থাকবেন।

সুস্পষ্ঠভাবে নারী সদস্যগণকে **১/৩** অংশ স্থায়ী কমিটির সভাপতি করার কথা বলা হলেও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে সভপতির পদ নারী সদস্যদেরকে দেওয়া হয় না।

পুরুষ সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় তাদের প্রাধান্য বেশি। তারা নারী কর্তৃত্ব সহজভাবে মেনে নিতে পারেন না। অধিকাংশ নারী সদস্য জানেন না তাদের দায়িত্বগুলো কি। প্রায়ই পুরুষ সদস্যদের উপর নির্ভর করে দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে চান। এই সুযোগে চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা তাদেরকে তথ্য ও নিয়মাবলী সম্পর্কে সাঠিক ধারণা না দিয়ে নির্ভরশীল করে রাখে এবং পুরুষদের আধিপত্য বজায় রাখে।

ইউনিয়ন পরিষদের সভা, প্রকল্প কমিটি ও কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ে থাকে। সভায় বাজেট প্রণয়ন, দায়িত্ব বণ্টন, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। নারী সদস্যদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব না থাকার কারণে চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরাই ইউনিয়ন পরিষদের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। সভায় স্বত:স্ফুর্তভাবে নারী সদস্যরা তাদের মতামত তুলে ধরলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তাদেরকে কোন প্রাধান্য দেওয়া হয় না। অনেক সময় নারী সদস্যরা পরিষদের কর্মকাণ্ড বুঝতে পারেন না। নারীসদস্যরা পরিষদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে নিজেদের পক্ষে আনতে সক্ষম হন না এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন না। সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের তিনটি সাধারণ ওয়ার্ডের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে কার্যাবলীর বিভাজন অথবা সমন্বয়ের কোন ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে দ্বন্দের সৃষ্টি হয়। এছাড়া আনুপাতিক ভাবে নারীদের সংখ্যা কম থাকায় পরিষদ তাদের মতামত ছাড়াই যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। ফলে সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে নারীদের কার্যকর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন প্রান্তিক পর্যায়েই রয়ে গেছে।

ইউনিয়ন পরিষদের অধিকাংশ নারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা কম হওয়ায় নারীরা ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কাজের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে সহজে বুঝে উঠতে পারেন না। সমান শিক্ষার একজন পুরুষ সদস্য সামাজিক মেলামেশা এবং বাইরের জগতে চলাফেরার কারণে নারী সদস্যদের থেকে প্রশাসনিক কাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সহজেই ধারণা দিতে পারেন, প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। নারী নিজেকে অসহায় মনে করে আত্মবিশ্বাসের অভাবে পুরুষদের তুলনায় পিছনে পড়ে থাকেন এবং তাদের কাজের পর্যাপ্ত ধারণা থাকে না, যার ফলে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব পালনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন না।

১৯৯৭ সালে যে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে নারী প্রতিনিধি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, ২০০৩ সালে এসে তা স্তিমিত হয়ে যায়। ২০১১ সালের নির্বাচনেও তা দেখা যায়, নারীর উৎসাহ উদ্দীপনা আগের তুলনায় আরো কম। অর্থনীতিবিদ ও নারী উন্নয়ন কর্মীগণ মনে করেন, রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির নানা উদ্যোগ বিফল হচ্ছে। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন যেমন রাজনৈতিক কারণে পিছিয়ে আছে তেমনি এর অন্যতম আর একটি কারণ হচ্ছে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা। ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ১৩ হাজার ৫০০ পদে ১ লাখ ৮০ হাজার নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ২০০৩ সালের নির্বাচনে তা কমে দাঁড়ায় মাত্র ১ লাখ ২৪ হাজার জনে। সর্বশেষ ২০১১ সালের নির্বাচনে তা আরো কমে দাড়ায় ৯০ হাজার জনে। মাত্র ১৫ বছরের ব্যবধানে নারী প্রতিদ্বন্দিতা ৫০ শতাংশ কমে গেছে।

গবেষণা এলাকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, নারীদের সুনির্দিষ্ট কাজের নির্দেশনা না থাকা, সাধারণ আসনের তুলনায় তিনগুণ বড় নির্বাচনী এলাকা, সিদ্ধান্তগ্রহণে প্রাধান্য না থাকা, সম্মানী ভাতা কম হওয়া, প্রশিক্ষণের সুযোগ না থাকা ইত্যাদি কারণে নারী সদস্যরা সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। অনেক সদস্য ক্ষোভের সাথে বলেছেন, পরিস্থিতির উন্নয়ন না ঘটলে তারা আর জনগণের কাছে অপমানিত হওয়ার জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না। অনেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভবিষ্যতে সাধারণ আসন থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন। খুব ধীরে হলেও নারী সদস্যদের মধ্যে সচেতনতা অধিকারবোধ জাগ্রত হচ্ছে এবং নারী ক্রমেই এসব প্রতিবন্ধকতা থেকে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে না থাকলেও নারী সদস্যরা তাদের সমস্যাগুলো সাঠিকভাবে পরিষদে তুলে ধরার সক্ষমতা অর্জন করেছেন। গবেষণা এলাকাধীন এক জন নারী সদস্য মনে করেন, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য তারা যে পথ তৈরি করে দিয়ে যাচ্ছেন আগামী দিনে তৃণমূলের নারীরা সে পথ ধরেই এগিয়ে যাবেন। নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য সোচ্চার হবেন।

ইউনিয়ন পরিষদে অধিকাংশ নারী সদস্য গৃহিণী অল্প শিক্ষিত। কাজেই ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে পরিষদের কার্যক্রম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখা ও নিয়ম কানুন ও দায়িত্বাবলী বুঝে উঠা সম্ভবপর হয় না। আর সে কারণেই দরকার যথাযথ প্রশিক্ষণের। নারী প্রতিনিধিদের পুরুষের পাশাপাশি কাজ করতে হলে প্রয়োজন নিজেকে দক্ষ ও যোগ্য সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাবে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা ইউনিয়ন পরিষদের কর্যক্রম বুঝে উঠতে পারেন না। অনেক সময় অজ্ঞতার কারণে তাঁরা তাঁদের অধিকারটুকুও আদায় করে নিতে পারেন না, যার জন্য চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা তাঁদের উপর প্রভাব খাটিয়ে পরিষদের সিদ্ধান্তকে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসেন। একজন সদস্য বলেছেন নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি কিছুদিনের জন্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলেন। এই প্রশিক্ষণ তাকে দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ জানতে প্রাথমিক ভাবে সহায়তা করেছে। তিনি আরো বলেছেন নির্বাচিত হয়ে আসার পর তিনি পরিষদের কিছুই বুঝতে পরতেন না। কিন্তু ট্রেনিং পাওয়ায় তিনি অনেক কিছু শিখেছেন। কিন্তু এই প্রশিক্ষণ তাঁর আরো আগে নেয়া উচিত ছিল। সবকিছু যখন তিনি বুঝে উঠলেন তখন পরিষদের মেয়াদ প্রায় শেষ। তাই তিনি আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চান এবং তৃণমূলের নারী প্রতিনিধি হিসেবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার অধিকার আদায় করে নিতে চান।

রাজনৈতিক দলের সাথে পুরুষ সদস্যদের সম্পৃক্ততা বেশি থাকে যে কারণে পরিষদ পর্যায়ে চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা প্রভাব খাটিয়ে পরিষদের কাজগুলো নিজেদের দলের কর্মী ও সমর্থকদের দিয়ে থাকেন। আর এর জন্য দায়ী পুরুষতান্ত্রিক গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো ও ইউনিয়ন পরিষদের অসচ্ছ ব্যবস্থাপনা।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা প্রতিনিয়ত যে সকল সমস্যা ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে কাজ করছেন, সেগুলোকে সুনিদিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হলঃ

- ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কাজের সরকারি নীতিমালার অভাব।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের অসহযোগিতা।
- সাধারণ আসনের তুলনায় তিনগুণ বৃহৎ কর্ম এলাকা।
- তিনগুণ বড় আসন কিন্তু সে তুলনায় দায়িত্ব পালনের সুযোগ সুবিধার অভাব।
- ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত না হওয়া এবং নারী সদস্যদের অংশগ্রণের সুযোগ না থাকা।
- সভায় যাতায়াতের সমস্যা ও নিরাপত্তার অভাব। যাতায়াত ভাতা না থাকা।

- উন্নয়ন প্রকল্পে নারী সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত না করা।
- সিদ্ধান্তগ্রহণে নারী সদস্যদের মতামতের প্রাধান্য না দেওয়া।
- নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব।
- সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় নারীর প্রতি নেতিবাচক মনোভাব।
- পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব।
- ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পর্কে নারী প্রতিনিধিদের অজ্ঞতা।
- প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনায় নারী সদস্যদের সভাপতি না করা।
- বিচার সালিশে নিরাপত্তার কারণে অংশগ্রহণ না করা।
- ইউনিয়ন পরিষদের সভায় চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্য কর্তৃক নারী সদস্যদের মতামতের গুরুত্ব না দেওয়া।
- সরকারি ভাতা বা সম্মানী কম এবং অনিয়মিত ভাতা প্রদান।
- কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা।
- নির্বাচনের আগে বা পরে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের প্রবণতা কম।
- পুরুষ সদস্যদের তুলনায় নারী সদস্যদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা কম থাকা।

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা প্রতিনিয়ত কাজের ক্ষেত্রে যে সমস্যা ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছেন সেগুলোর আলোকে ইউনিয়ন পরিষদে নারীর কার্যকর ভূমিকা পালনের সুনির্দিষ্ট সুপারিশসমূহ তুলে ধরা হলঃ

- ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে হলে সরকারকে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। যাতে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে পারেন।
- ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা তিনগুণ বড় নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করলেও তাঁরা সম্মানী ভাতা পান সাধারণ সদস্যদের সমান। নারী সদস্যদের মাসিক সম্মানী ভাতার পরিমান বাড়াতে হবে।

- ইউনিয়ন পরিষদের গঠন কাঠামোয় যে তিনজন নারী প্রতিনিধি নির্বাচন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে তার সংখ্যা বাড়াতে হবে অথবা তাঁদের কাজের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।
- শিক্ষিত, স্বচ্ছল ও উচ্চবিত্ত পরিবার থেকে নারীদেরকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের সহযোগিতা করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদে যোগদানের পর পরই নারী প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- নারী প্রতিনিধিদের কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে তাঁরা নির্বিঘ্নে কাজ সম্পন্ন করতে পারেন।
- নির্বাচনী ইশতেহারে নির্বাচনী ব্যয় এর পরিমাণ উল্লেখ করে দিতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের সভা ও কর্মকাণ্ডে যোগদানের জন্য নারী প্রতিনিধিদের যাতায়াত ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বাধ্যতামূলক ভাবে নারী সদস্যদেরকে যেসব কমিটির সভাপতি করার সরকারি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে তাঁদের সে কমিটির সভাপতি করতে হবে। সভাপতি করা না হলে তার জবাবদিহিতা থাকতে হবে।
- সভায় সিদ্ধান্তগ্রহণেও নারী প্রতিনিধিদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে।
- সালিশ / বিচার এসব কার্যক্রমে নারী প্রতিনিধিরা যাতে নির্বিঘ্নে অংশগ্রহণ করতে পারে। তাঁর ব্যবস্থা করতে হবে।
- চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা নারী প্রতিনিধিদের কাজে অযথা যেন হস্তক্ষেপ না করতে পারেন তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি পদক্ষেপ নিতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের সভার কার্যক্রম ও দায়িত্ব পালনের নিয়মাবলী সম্পর্কে নারী প্রতিনিধিদেরকে অবহিত করতে হবে।
- ভিজিডি, ভিজিএফ কার্ড, বয়স্ক ভাতা প্রদানের জন্য দুঃস্থ মহিলাদের নির্বাচন করার তালিকা প্রণয়নের কজে নারী প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।
- ত্রাণ ও উন্নয়নমূলক বরাদ্দ বণ্টনে একজন পুরুষ সদস্য একটি আসনে যে বরাদ্দ পান একজন নারী প্রতিনিধি তিনটি আসনে সেই একই বরাদ্দ পান। এ সকল বরাদ্দ বণ্টনে নারী ও পুরুষ সদস্যদের মধ্যকার বিরাজমান বৈষম্য দূর করতে হবে।

- ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট ও অন্যান্য প্রকল্প কমিটিগুলোতে নারী প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- নারী প্রতিনিধিরা তাদের দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারছে কি না সে বিষয়ে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬.২ কেইস স্টাডি ঃ

নির্বাচিত গবেষণা এলাকা পর্যবেক্ষণ করে ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকা পালনের যে সব তথ্য সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উঠে এসেছে তা কেইস স্টাডি আকারে তুলে ধরা হল। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হে ছেন। নির্বাচিত পদের জন্য কেন ও কীভাবে প্রতিযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নিলেন, দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বাধাবিঘ্ন, পারিবারিক সহযোগিতা ও অন্যান্য বিষয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন।

কেইস স্টাডি-১

এক কন্যা সন্তানের জননী শাহীনা পারভীনের বয়স ৩২ বৎসর। স্বামী স্নাতক পাশ করে টিএণ্ডটিতে চাকরি করেন। এইচএসসি পাশ শাহীনা পারভীন নিজের আগ্রহে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন করেন। তিনি নির্বাচনে জয়ী হয়ে নারী শিক্ষা, এলাকাভিত্তিক কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রথা রোধসহ এলাকার উন্নয়নে এলাকার নারী পুরুষের সাথে কথা বলেছেন। কিন্তু এলাকার উন্নয়নমূলক কোন কাজে তেমন ভূমিকা পালন করতে পারেন নি। কর্মক্ষেত্রে অনেক সহকর্মী নারীদের কাজে সহযোগিতা করেন। কিন্তু তিনটি ওয়ার্ডে কাজ করতে গিয়ে তিনি সমস্যায় পড়েন। একজন পুরুষ মেম্বার একটি ওয়ার্ডে যা পায়, তিন ওয়ার্ড মিলে তিনিও তাই পান। তাই বরাদ্দ বণ্টনে এলাকার জনগণকে খুশী করা যায় না। এলজিএসপির কাজ, টি.আর, কাবিখার সামান্য কিছু কাজ পেলেও সেটা বণ্টনে সমস্যার সৃষ্টি হয়। সিডরের পর এই এলাকার জনগণ আর্থিক দিক থেকে খুবই কষ্টকর অবস্থানে আছে। যে একবার সাহায্য পায় সে আবার পেতে চায়। অন্য কাউকে সুযোগ দিতে চায় না বা অন্য কাউকে দিতে হবে সেটাও বুঝে না। বোঝানো যায় না। একজন বারবার সাহায্য চায়। সালিশ বিচারে তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। এলাকার নারীরা তাঁর উপর মোটামুটি সন্তুষ্ট। ভবিষ্যতে তিনি আর নির্বাচনে দাঁড়াবেন না। পরপর দুইবার এলাকার জনগণ একমুখ দেখতে চায়না। নতুনত্ব চায়। তাছাড়া তিনি জনগণকে তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী খুশী করতে না পারায় তিনি আর পরবর্তী নির্বাচন অংশগ্রহণ করবেন না। তবে তিনি বলেন, আগের চেয়ে এলাকার জনগণ অনেক সচেতন হয়েছে। সেবা নিতে এখন অনেক নারী ইউনিয়নমুখী হয়েছে এবং কিছুটা হলেও নিজের সমস্যা, অভিযোগ মন খুলে বলতে পারছে। তিনি মনে করেন, নারীদের কাজের ক্ষেত্র আরো সহজ করে দেওয়া উচিত যাতে তাঁরা এলাকার উন্নয়নে কাজ করতে পারেন।

কেইস স্টাডি-২

মোছাঃ সাহেরা খাতুন, বয়স ৪২। ২০০৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। তারপর নির্বাচনে হেয়ে যান। কিছুদিন পর স্বামী মারা যায়। স্বামী মারা যাওয়ার পর প্রতিবেশীদের ইচ্ছায় তিনি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। তিনি নিয়মিত ইউনিয়ন পরিষদের সভায় উপস্থিত থাকেন। যথেষ্ঠ আগ্রহ আছে। সভায় উপস্থিত থাকলে চেয়ারম্যান সবকিছু জানায়। কিন্তু সভায় তাঁর মতামতের কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। পুরুষ সদস্যদেরকে গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশি। একজন নারী প্রতিনিধির জন্য যেমন কাজের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে সেগুলোও তাঁকে দেওয়া হয় না। বলা হয় তোমরা মেয়ে মানুষ। এসব কাজ অনেক কঠিন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, সরকার যখন নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মাঠে নামিয়েছেন তাঁদের আলাদাভাবে কোটা ভিত্তিক বরাদ্দ থাকা উচিত। কাজের ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত যাতে চেয়ারম্যান ও পুরুষ মেম্বারদের কাছে ধরণা দিতে না হয়। ইউনিয়ন পরিষদে তিনি পুরুষ সদস্য ও চেয়ারম্যানের সাথে সমন্বয় করে কাজ করেন। কারণ, সীমিত কিছু যদি পান তা দিয়ে এলাকার উন্নয়নে কাজ করান। তিনি মনে করেন, এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে আর কোন নারী সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন করতে উৎসাহী হবেন না। অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে একজন নারী প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। অনেক সময় তাঁরা নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু চেয়ারম্যান এবং পুরুষ মেম্বাররা তাঁদের কাজে সহযোগিতা করেন না। তিনি ভবিষ্যতে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী। অধিকার আদায়ে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। তৃণমূলের নারীদের উন্নয়নে কাউকে না কাউকে তো এগিয়ে আসতে হবে।

কেইস স্টাডি-৩

রত্না হায়দার, বয়স ৪৬। এইচএসসি পাশ করার পরে বিয়ে হয়। ছোট বেলা থেকে রাজনীতির সাথে জড়িত। স্বামী ব্যবসা করেন। পুরোপুরি গৃহিণী হলেও সামাজিক উন্নয়নে নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছেন। এলাকার অত্যাচারিত ও নির্যাতিত নারীদের পাশে দাড়িয়েছেন তিনি। নিজের ইচ্ছায় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। এলজিএসপি, এলএসপি ও এলজিআরডি থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। স্বাস্থ্য বিষয়ক কাজ, মাতৃত্বকালীন কাজ, নারী উন্নয়নমূলক কাজগুলো তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে করে থাকেন। এলাকার যুবকদের সহায়তায় এলাকার রাস্তাঘাট ও অন্যান্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করেন। গ্রাম্য সালিশে/ ছোট খাট বিচারে অংশ-নেন। এলাকার মুরব্বিরা তাঁকে যথেষ্ঠ সম্মান করে। ইউনিয়ন পরিষদের সভায় তিনি নিয়মিত উপস্থিত থাকেন। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে সহযোগিতা করেন। ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নমূলক কাজে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তবে দায়িত্ব পেলে তিনি এলাকার উন্নয়নে আরো বেশি কাজ করতে পারতেন। সভায় পুরুষ সদস্যদের মতামতকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। নারী প্রতিনিধিদের কাজে সহযোগিতা দরকার। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলেন পুরুষরা যতই নারীর সম্মান ও মর্যাদার কথা বলুক না কেন তারা সবসময় নারীদের বৈষম্যের চোখে দেখেন। তাঁর ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক সভাগুলোয় নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় না। কাগজে কলমে নারী প্রতিনিধিদের যে অধিকার আছে সেগুলো ঠিকমতো বাস্তবায়ন করা হয় না। ১৩ টি স্ট্যাণ্ডিং কামটির মধ্যে নারী প্রতিনিধিদের ৫ টি স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সভাপতি করতে হবে। কিন্তু চেয়ারম্যান বাস্তবে এসব কমিটির সভাপতি নারী প্রতিনিধিদের করেন না। তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। ভবিষ্যতে তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চান। তবে ইউনিয়ন পরিষদে নয়। সুযোগ পেলে এমপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা রাখেন।

কেইস স্টাডি- ৪

আফরোজা বেগম, স্নাতক পাশ। ইউনিয়ন পরিষদে নারী সদস্য হিসেবে নির্বাচনের পর একটি কাবিখা, টিআর দুটি, এডিবি দুটি এবং একটি ভিজিএফ কার্ড ও বয়স্ক ভাতার কাজ করেছেন। তাঁকে দুটি স্টাণ্ডিং কমিটিতে রাখা হয়েছে। তাঁর স্বামী শিক্ষকতা করেন। তিনি নিয়মিত সভায় উপস্থিত থাকেন। সভায় মতামত গৃহীত হয় এবং নারী পুরুষ উভয়ের মতামতকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। তিনি ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকেন। ইউনিয়ন পরিষদের সভায় এলাকার সমস্যা তুলে ধরতে পারেন। কিন্তু এলাকার জনগণের চাহিদা অনেক। সেই তুলনায় চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না। এলাকার জনগণ আশা করে যেন সবসময় তাঁদের পাশে থাকেন। ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করায় নারীরা নির্বিঘ্নে তাঁদের সমস্যাগুলো নারী প্রতিনিধিদের কাছে তুলে ধরতে পারেন। তিনি জানান, নির্বাচিত হয়ে আসার পর সাধ্যমত এলাকার অবহেলিত নির্যাতিত নারীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। চেয়ারম্যানের সাথে সম্পর্ক ভাল। চেয়ারম্যান তাঁর কাজে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন। তারপরও তিনি সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন করবেন না। সাধারণ আসনে অথবা উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন।

কেইস স্টাডি-৫

ফিরোজা বেগম, বয়স ৪৩ বৎসর। স্বামী স্নাতক পাশ করে নিজের জমিজমা দেখাশোনা করেন। তিনি এইচএসসি পাশ করেছেন। আগে ব্রাক স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নির্বাচিত হওয়ার পর এখন আর ব্রাকে শিক্ষকতা করেন না। জনগণের ও পরিবারের ইচ্ছায় তিনি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। তিনটি ওয়ার্ড থেকে একজন নারী সদস্য নির্বাচিত হন বলে তাঁর দায়িত্ব পুরুষ সদস্যদের চেয়ে বেশি। তিনি ভিজিএফ কার্ড পান মাত্র ৫০/৬০ টি এবং ওয়ার্ড মেম্বারকেও সমান কার্ড দেওয়া হয়। কিন্তু ওয়ার্ড মেম্বারের ২/৩ টি গ্রাম আর নারী প্রতিনিধিদের গ্রামের সংখ্যা ৬/৭ টি। সবচেয়ে বেশি সমস্যা নারী প্রতিনিধিদের ওয়ার্ড সংখ্যা বেশি সেই তুলনায় বরাদ্দ কম। কাজেই একই সাথে সব মানুষের মন জয় করা যায় না। অনেক সময় নিজেদের থেকে বাড়তি কিছু জনগণকে দিতে হয় সম্মানের খাতিরে। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করায় নির্বাচনী ব্যয় হয়েছে অনেক। কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার পর ঠিকমতো বেতন ভাতা পাওয়া যায় না। তিনি ইউনিয়ন পরিষদের সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকতে পারেন না। অন্য দুই নারী প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন। সভায় মতামত তুলে ধরেন। চেয়ারম্যানের সাথে ও পুরুষ মেম্বারদের সাথে সম্পর্ক ভাল। প্রশিক্ষণ দরকার নারী প্রতিনিধিদের। কারণ ইউনিয়ন পরিষদের অনেক কার্যক্রম বোঝেন না। অনেক সময় পুরুষ সদস্যরা অসহযোগিতা করেন। কিন্তু চেয়ারম্যান নারী প্রতিনিধিদের মর্যাদা দেন। সালিশ/ বিচারে তিনি অংশগ্রহণ করেন না। তার পরিবর্তে স্বামী যান। ভবিষ্যতে তিনি আর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চান না। কারণ, এলাকার জনগণের জন্য কাজ করতে না পারলে বার বার নির্বাচন করে লাভ নেই। নারী প্রতিনিধিদের কাজের পরিধি ও দায়িত্ব সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা দরকার যাতে তাঁরা ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

তথ্য নির্দেশিকাঃ

১. জরিনা রহমান খান, বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক/প্রশাসনিক সংস্থায় অংশগ্রহণ, মেঘলা গুহঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম সম্পাদিত, নারীঃ রাষ্ট্র উন্নয়ন ও মতাদর্শ, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, **১৯৯০**, পৃষ্ঠা-(২২-২৩)।

২. উন্নয়ন পদক্ষেপ, দ্বাদশবর্ষ, সপ্তম সংখ্যা জুলাই ২০০৬, পৃষ্ঠা-২৬।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

উপসংহার ঃ

সরকার কর্তৃক স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ১৯৯৭ এর মাধ্যমে পূর্বের মনোনয়ন ব্যবস্থার পরিবর্তে ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধিদের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদের এই নির্বাচনে প্রথম বারের মত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নারী নির্বাচিত হওয়ায় পূর্বের তুলনায় রাজনৈতিক কাঠামোয় নারীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়। আগে সব সময় গ্রামের ধনী বা প্রভাবশালী ব্যক্তিগণই স্থানীয় পরিষদের সভাপতি ও সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। গ্রামের নারীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়টি কল্পনাও করা যেতো না। আইনগত বাধা না থাকলেও সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে নারীদের পক্ষে তা সম্ভব হত না। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে ধীরে ধীরে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নারীর উন্নয়নে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় নীতিতে নারীকে উন্নয়নের ধারায় অন্তর্ভুক্ত করণের বিভিন্ন নীতিমালা গৃহীত হয়েছে। সর্বোপরি জনগণের ক্রমাগত সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে নারীরা রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামের দরিদ্র নারীরা আজকাল সংঘবদ্ধভাবে নানা আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে অনেক সফলতা অর্জন করেছেন। সরকারি, বেসরকারি সংগঠনগুলো তাঁদেরকে সহযোগিতা করছে। এই সাফল্যকে নারী আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্থানীয় ও জাতীয় জীবনে সম্প্রসারণ করতে পারে। নির্বাচনগুলোতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে স্থানীয় পর্যায়ে অবদান রাখতে পারে।

ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রতিনিধিদের কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করণে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও অন্যান্য পদক্ষেপ ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডে আগের তুলনায় বেশি সংখ্যক নারী সদস্যকে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু এই গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নির্বাচিত এই নারী প্রতিনিধিরা তাদের অর্জিত ক্ষমতা ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় যথাযথভাবে প্রয়োগ, সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং প্রকৃত ক্ষমতা চর্চায় বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন।

ইউনিয়ন পরিষদে নারী সদস্যরা নির্দিষ্ট কোন দায়িত্ব পাননি বলে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ, ভিজিডি কার্ড বিতরণ, টি আর, কাবিখা, বয়স্ক ভাতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারী সদস্যরা উপেক্ষিত ও বঞ্চিত হচ্ছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোতে সিদ্ধান্তগ্রহণ, বিচার সালিশ ও অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারী প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে যে নতুন মাত্রা ও অগ্রগতি যুক্ত হবার

সম্ভাবনা ছিল, দেশ তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং নারী প্রতিনিধিরা ইউনিয়ন পরিষদে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে সক্ষম হচ্ছে না।

নারীদের নির্বাচনের মাধ্যমে নারী নির্যাতন প্রতিরোধসহ নারীর ক্ষমতায়নের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামীণ নারীর ক্ষমতা কাঠামোয় অবস্থানরত একজন নারীর সাথে তাঁদের প্রয়োজন ও অবস্থা সম্পর্কে মতামত বিনিময়ের সবচেয়ে ভাল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদে এর আগে পুরুষ আধিপত্যের জন্য গ্রামীণ নারীরা তাদের প্রয়োজন ও অবস্থার কথা সরাসরি জানানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারীরা গ্রামীণ নারীর প্রয়োজন ও অবস্থার কথা সবচেয়ে ভাল বুঝতে পারেন। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ নিজেদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্তরে না থাকলে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব হয় না।

যে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে ১৯৯৭ সালে নারী প্রতিনিধিরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, বাস্তবে পরিষদের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার পর ক্রমেই তা স্তিমিত হয়ে পড়ে। জনগণের কাছে দেওয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে না পারা এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও প্রকৃত ক্ষমতা চর্চায় অংশগ্রহণ করতে না পারার ব্যর্থতায় নারী প্রতিনিধিদের মনে গভীর ক্ষোভ ও চরম হতাশার জন্ম দেয়। যার প্রতিফলন দেখা যায় ২০০৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে। পরবর্তীতে ২০১১ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরাও প্রকৃত ক্ষমতা চর্চায় বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন। ফলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীকে সম্পৃক্ত করে যে উন্নয়নের আশা করা হয়েছিল ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ভূমিকা পালনের যে নতুন মাত্রা প্রণয়নের প্রত্যয় ছিল তা অনেকাংশে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অর্জিত হচ্ছে না।

গবেষণা প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় রাষ্ট্রীয় নীতির কারণে স্থানীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। ক্ষমতা ও অধিকার সম্পর্কে নারী সচেতন হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে বা সিদ্ধান্তগ্রহণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছেন না। অনেক নারী প্রতিনিধিই হতাশ এবং পরবর্তী নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নারীরা উন্নয়নমূলক কাজে, সিদ্ধান্তগ্রহণে আগ্রহী কিন্তু বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তাঁদের কাজের ক্ষেত্র তৈরি হয়নি। এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে ভবিষ্যতে এইসব নারী প্রতিনিধিদের দ্বারা কাংঙ্খিত উন্নয়ন আশা করা যাবে না। রাজনীতি ও ক্ষমতা কাঠামোয় জনগোষ্ঠীর অর্ধেক অংশ নারী। সমাজের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কখনোই সত্যিকার গণতন্ত্র

প্রতিষ্ঠা সম্ভব না। সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সক্ষমতার ভিত্তিতে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলে গণতন্ত্র গুণগতমান অর্জন করবে। এই প্রেক্ষাপটে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকে শক্তিশালী করতে হলে ইউনিয়ন পরিষদে নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

বর্তমান শিক্ষা এবং সাহায্যের অভাবে নারীরা এগিয়ে আসতে পারছেন না। তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কাজ করে নারীদের উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করলে এগিয়ে যাওয়া সহজ হবে। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নারীদের সংখ্যা বেড়েছে লক্ষ্যনীয়ভাবে। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যদের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশেরই শিক্ষাগত যোগ্যতা অতি নিম্নপর্যায়ের। সংরক্ষিত আসনে নারীর বিরুদ্ধে নারী প্রতিযোগিতা করেছেন বলেই তাঁরা নির্বাচনে সহজে জয়লাভ করতে পেরেছিলেন। উচ্চ শিক্ষার অভাবের কারণে অনেক নির্বাচিত নারীই তাঁদের ইউনিয়নের নারীদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারছেন না। বেশির ভাগ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রাধান্য পায়নি। যে সব নারী সদস্যের মাধ্যমিক শিক্ষার উপরে শিক্ষা আছে কেবল তারাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁদের সিদ্ধান্তগ্রহণে ভূমিকা রাখতে পেরেছেন। এখানে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছে যে, নারীদের ইউনিয়ন পরিষদে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। তাই নারীর জন্য শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

অবশ্য গত কয়েকটি অর্থ বছরে জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ক্ষেত্রে কেবল নারীর জন্য কিছু প্রকল্প গ্রহণ করার ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ক্ষেত্রের শিক্ষা স্তরে নারীর কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। বর্তমানে স্নাতক পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। এই সুযোগটি যাতে নারীরা গ্রহণ করতে পারে সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

নব্বই-এর দশকে বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠিত বৈশ্বিক পর্যায়ের সকল সম্মেলনে নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কেবল আন্তর্জাতিকভাবেই নয় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আমাদের দেশে নারীর উন্নয়নে বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে পর্যাপ্ত বরাদ্দ, বরাদ্দের বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়নের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ভূমিকা পালনে প্রয়োজন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য অতি জরুরী প্রয়োজন হলো নারীর সম্পদে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করা। পিতামাতার সম্পত্তিতে পুত্র, কন্যার সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী এই শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে।

উত্তরাধিকারের মাধ্যমে সম্পদে প্রবেশ শক্তি বৃদ্ধি পেলে নারী নির্বাচনী প্রচারণায় ও নির্বাচনী এলাকাতে প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হবে।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী একজন ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে যাতে ভাবতে পারে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আগে নারীর উন্নয়নের জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীকে পরনির্ভরশীল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নারী স্বাধীনভাবে কোন কিছু চিন্তা করার সুযোগ কমই পেয়েছে। সব সময় পরনির্ভরশীল থেকেছে। একজন ব্যক্তি হিসেবে নারীর মনোভাবকে আরও শক্তিশালী করার জন্য উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে সচেতনভাবে নারীর অংশগ্রহণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় বিচার, সলিশে অংশগ্রহণ করাকে একজন নির্বাচিত নারী প্রতিনিধি মনে করেন, এটা পুরুষের কাজ। ইউনিয়ন পরিষদের সভায় নিজে অংশগ্রহণ না করে স্বামীকে পাঠান এবং স্বামীর সিদ্ধান্তকেই নিজের সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন। কাজেই বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদেরকে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করে তুলতে হবে। ইতোমধ্যেই দেশে বিভিন্ন এনজিও নারী রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে। এই রাজনৈতিক সচেতনতার কর্মসূচিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে যাতে নারী সঠিক ভাবে ভোটদান করতে পারে, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে এবং নির্বাচিত হয়ে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে শক্তিশালী করার জন্য বেশকিছু বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। জেণ্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নে নারী নীতি নির্ধারকগণ যাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কারণ জেণ্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জন যতই তরান্বিত হয় ততই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জন সহজ হয়। জাতীয় সংসদে নারী সদস্যের অধিকাংশ সদস্যই সংরক্ষিত আসনে মনোনীত সদস্য। জাতীয় সংসদের মনোনীত নারী সদস্যদের সঙ্গে তৃণমূলের নারীর সাথে যোগাযোগ খুব কমই থাকে। জাতীয় বাজেটে নারীর চাহিদা অনুযায়ী বাজেট প্রণয়নের বিষয়ে নারী সাংসদগণ তেমন কোন ভূমিকা পালনে সক্ষম হন না। অনেক সময় জাতীয় বাজেটে নারীর জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলোর উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নারীর বাস্তব প্রয়োজনের তেমন কোন মিল থাকে না এবং বাজেট প্রণয়নে, নীতি নির্ধারণে জাতীয় সংসদে নারী

সাংসদগণ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন না। তাই রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত হয়ে জাতীয় বাজেট প্রণয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হলে নারীকে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে সংসদে আসতে হবে।

১৯৯৭ সালে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু গবেষণায় দেখা যায়, শতকরা ২৫ ভাগের কম নারী ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করছে। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের ১৩ জন নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে নারীর সংখ্যা মাত্র ৩ জন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের প্রত্যাশা পূরণ করে নারীর অংশগ্রহণ কার্যকর করতে ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসন পুর্নবিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে।

নারীর উন্নয়নের ও ভূমিকা পালনের অন্তরায় পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, এ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে সমাজের অর্ধেক মানুষ পিছিয়ে থাকবে। নারীর আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নারী উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়নে সরকার স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে।

ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বস্তরে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি ভাবে পরিষদের চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা যাতে নারী প্রতিনিধিদের প্রতি সহযোগিতামূলক আচরণ করে এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অধিকার ও ক্ষমতা যেন নারী প্রতিনিধিরা ভোগ করতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। প্রয়োজনে সরকারি ভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করতে হবে।

ইউনিয়ন পরিষদ জনগণের সবচেয়ে কাছের সরকার এবং তৃণমূলের জনগণের সুখ দুঃখের সাথী। তাই স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা দরকার। ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল বৃদ্ধি করে এর স্বাবলম্বিতা বাড়ানো প্রয়োজন। ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক ও উন্নয়ন ব্যয় করার জন্য দু'টি উৎস থেকে তারা অর্থ ও নানা সম্পদ পেয়ে থাকেন। প্রথম উৎস হচ্ছে সরকারি অনুদান, আর দ্বিতীয় উৎস স্থানীয় ভাবে পরিষদের আয় যা জনসাধারণের দেয় কর, ফি, ভাড়া ইত্যাদি। ইউনিয়ন পরিষদের কর আদায়ের ব্যাপারে জনগণের সচেতনতা বাড়ানো দরকার।

ইউনিয়ন পরিষদের দুইটি উৎস থেকে প্রাপ্ত আয়ের উপর ভিত্তি করে ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট তৈরি করে। ইউনিয়ন পরিষদ যাতে তার তৈরি করা বাজেট অনুযায়ী আয় করতে পারে সেজন্যে প্রত্যেকের উপর ধার্য করা কর বা ফিসমূহ যথাসময়ে আদায় করার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

আমাদের দেশে ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের নিজস্ব আয় অত্যন্ত কম। কর আদায়ের ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে। চেয়ারম্যানগণ অনেক সময় পরবর্তী নির্বাচনে পরাজয়ের ভয়ে কর ধার্য্য ও আদায়ের ব্যাপারে উদাসীনতা দেখান। ইউনিয়ন পরিষদের কর ধার্য্য ও আদায়ের ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এই জন্য জনগণের সচেতনতা ও সহযোগিতা বাড়ানো দরকার যা কি না ইউনিয়ন পরিষদের পাশাপাশি এনজিওরাও করতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল যাতে দুর্নীতিমুক্ত থাকে সে ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সৎ, যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচনের পর পরিষদের কাজকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে হবে।

ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নমূলক কাজের অর্থ শুধু রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ কালভার্ট ইত্যাদির উন্নয়ন করা নয়। পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদী কিছু সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদিতে ইউনিয়ন পরিষদ পদক্ষেপ গ্রহণ করে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পার।

গবেষণা এলাকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, প্রথমেই নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা যে অভিযোগটি তুলেছেন সেটি হচ্ছে তাঁদের নির্বাচনী এলাকা। এ এলাকা ৩টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত। এলাকার আকারের সাথে মোট ভোটারের সংখ্যাও বেশি। সাধারণ আসনের একজন সদস্য নির্বাচিত হন ১টি ওয়ার্ডের ভোটারদের দ্বারা কিন্তু সংরক্ষিত নারী আসনের একজন সদস্য ইউনিয়নের ৩টি ওয়ার্ডের ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হন। একজন সাধারণ আসনের সদস্য একটি ওয়ার্ডের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন, আর সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের তিনটি ওয়ার্ডের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে হয়। নির্বাচিনী এলাকা বড় কিন্তু ১২ জন সদস্যের ক্ষমতা ও বরাদ্দ সমান হওয়ায় নারী সদস্যরা জনগণের চাহিদা পূরণে সক্ষম হন না। গবেষণা এলাকাধীন প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যরাই অভিযোগ করেছেন একই বরাদ্দ দিয়ে তাঁর এত বড় নির্বাচনী এলাকার জনগণের সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়। আর এ কারণেই নারী সদস্যদের সংখ্যা বাড়ানো উচিত অথবা পুরুষ সদস্যদের নির্বাচনী আসনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ও সমন্বয় করে নারী আসনের ব্যয় বরাদ্দ বড়ানো উচিত।

ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নতুন অধ্যাদেশ অনুযায়ী ১৩টি স্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন করার বিধান রয়েছে। প্রত্যেক সদস্যকে একেকটি কমিটির সভাপতি করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সরকারি বিধান থাকলেও বাস্তবে ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্প কমিটিতে নারী প্রতিনিধিদের সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে না। প্রকল্প কমিটির সভাপতি করা হলেও কার্যত চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা নারীদের ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখেন। নামমাত্র নারী প্রতিনিধিদের সভাপতি করা হয়। কাজেই নারী প্রতিনিধিরা যাতে সঠিকভাবে সভাপতির দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা, তাঁদের নামে যে বরাদ্দ দেয়া হয় তা পরিষদ থেকে না দিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় থেকে বরাদ্দ দেয়া উচিত। চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা যাতে বৈষম্য সৃষ্টি করার কোন সুযোগ না পায়।

চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা নারী প্রতিনিধিদের প্রতি অসহযোগিতামূলক আচরণ করায় তাঁদের মধ্যে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে এবং তারা নিজেদেরকে অনিরাপদ ভাবছেন। তাঁদের উপর যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা সুস্পষ্ট না হওয়ায় ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে তাঁরা ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছেন না। কাজেই নারী সদস্যদের কাজের ক্ষেত্রে তাঁদের দায়িত্বাবলীর সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা পরিষদের সভায় নিয়মিত যোগ দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও উন্নয়ন প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী। দরিদ্র অসহায় মহিলাদের তালিকা প্রণয়ন, বয়স্কভাতা প্রদানের তালিকা তৈরিতে নারী প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করার কথা থাকলেও চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা নিজেদের পছন্দমত তালিকা তৈরি করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে নারী সদস্যদের স্বাক্ষর জাল করে তালিকা তৈরি করে থাকেন। ক্ষমতা কাঠামোয়, সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রতিটি পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নসহ সকল কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত ও মনিটরিং করা অপরিহার্য।

নারী সমাজে অধস্তন। সমাজে তাঁর অবস্থানও অসম। এই অসম সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারীর কী ভূমিকা রাখা উচিত সে সম্পর্কে তাঁকে সচেতন হতে হবে। এক্ষেত্রে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের জন্য শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গবেষণায় দেখা গেছে অধিকাংশ নারী সদস্য অল্প শিক্ষিত। নিজেদের অধিকার আদায় এবং ইউনিয়ন পরিষদে ও কর্মক্ষেত্রে তাঁদের তাৎক্ষণিক দক্ষতা ও জ্ঞান বিকশিত করার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে যাতে শিক্ষিত নারীরা অংশগ্রহণ করে সে ব্যাপারে তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

উন্নয়ন কৌশল, সমাজ কাঠামো, স্থানীয় সরকার আইন, বিধি বিধান, আইনগত অধিকার এবং অন্যান্য বিষয়ে সহজ ভাষায় নির্দেশিকা তৈরি করে নারী প্রতিনিধিদের কাছে সরবরাহ করতে হবে যাতে তারা পরিষদের কর্মকাণ্ড সহজে বুঝতে পারে। শুধু শিক্ষা অর্জনই যথেষ্ঠ নয়, তাদেরকে সচেতন করে সমাজে নিজের অবস্থান তৈরির ব্যাপারেও দিক নির্দেশনা দিতে হবে।

গবেষণা এলাকার প্রায় সকল নারী সদস্যই বলেছেন, তাঁদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অনেকে পরিষদের কিছুই বোঝেন না। তিনি কেন পরিষদে এসেছেন তাও বুঝে উঠতে পারেন না। কাজেই, সকল নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা উচিত। ইউনিয়ন পরিষদে যোগদানের প্রথম তিন মাসের মধ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত। এমন সময় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত না যখন প্রায় পরিষদের মেয়াদ শেষ।

নারী প্রতিনিধিদের সালিশ ও গ্রাম আদালত কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। সালিশ বিচারের স্থান নির্বাচন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়টি প্রাধান্য দেয়া উচিত। দূরবর্তী স্থানে সালিশ বিচারের ব্যবস্থা করা হলে যানবাহন ব্যবস্থা অথবা যাতায়াত ভাতার ব্যবস্থা থাকতে হবে। নারী নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা নিতে নারী প্রতিনিধিদেরকে সালিশ ও বিচার কার্যক্রমে বাধ্যতামূলক ভাবে অংশগ্রহণের দায়িত্ব সরকারি প্রজ্ঞাপনে নিশ্চিত করতে হবে।

নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে। গবেষণাধীন ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, পরিষদ থেকে যে ভাতা পান তা খুবই অপ্রতুল, পরিষদের যাতায়াত খরচ বাবদ এ টাকা ব্যয় হয়ে যায়। বেশির ভাগ নারী প্রতিনিধি গৃহিনী হওয়ায় তাঁরা মাঝে মাঝেই আর্থিক সমস্যায় পড়েন।

স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে নারী প্রতিনিধি ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সচিব ও সদস্যদেরকে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিদের অনেকেরই তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতার অভাব রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে সঠিক দিক নির্দেশনার অভাব, প্রশিক্ষণের অভাব ইত্যাদি। এই বিষয়গুলো স্থানীয় সরকারকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। পাশাপাশি সঠিক নেতৃত্বও গড়ে উঠছে না। নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে নারীদের কর্তব্য কাজগুলো ও দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁরা অবহিত হবে এবং প্রতিষ্ঠিত হবে যোগ্য নেতৃত্ব।

স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে হলে বিকেন্দ্রীকরণের বিকল্প নেই। অনেক সময় কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতার কারণে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা যায় না। স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে স্থানীয় সরকারের সকল স্তরের কার্যপরিধি ও ক্ষমতা পর্যাপ্ত হারে বণ্টন করতে হবে। স্থানীয় সরকাররের দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে তাঁর সুষ্ঠু সমাধান করা উচিত। বাংলাদেশ এখনও বিকেন্দ্রীকরণকৃত স্থানীয় সরকার গড়ে ওঠেনি। রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন ও আর্থিকভাবে সক্ষম একটি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিবিদদের মধ্যে রয়েছে আস্থার সংকট। স্থানীয় সরকারের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে প্রায়ই তারা নিরাপত্তহীনতায় ভূগছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা, রাজনীতিবিদদের আস্থার সংকট, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ইত্যাদি কারণে স্থানীয় পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিদের প্রধান্য বৃদ্ধির পরিবর্তে প্রশাসন নির্ভর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে উঠছে। স্থানীয় সরকার কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিরাজমান সংকট নিরসনের জন্য বিকেন্দ্রীকৃত শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রবর্তন ও নারী প্রতিনিধিদের আর্থিক ব্যয় নির্বাহের বিষয়টিকেও সুনিশ্চিত করতে হবে। ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রতিটি পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করে সকল কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো এখনও পিতৃতান্ত্রিক, রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর। এই ধরণের সমাজ কাঠামোর গণ্ডি অতিক্রম করে নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি এবং রাষ্ট্রীয় নীতির প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন সময়ের ব্যাপার। কথিত সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নীতির প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা উচিত। নাগরিক সুবিধা প্রদানে এই প্রতিষ্ঠানটি যদি দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক সংগঠনে পরিণত হতে পারে তবে সেখানে নারী তার ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে ও কর্মসূচীতে নারীর অধিকার ও দাবি-দাওয়াগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ বাড়াতে পারলে এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে দারিদ্র্য, মৌলবাদ, ফতোয়ার মত বিধিনিষেধ নারীর ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে আর বাধা হয়ে দাঁড়বে না। রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কমিটিতে অধিক সংখ্যক নারীকে যুক্ত করতে হবে এবং নারী প্রতিনিধিদেরকে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও কর্মসূচী নির্ধারণ করে দিতে হবে।

১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে নারীকে উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করার যে উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করেছে তার সফলতা নির্ভর করছে অংশগ্রহণ করা নারী প্রতিনিধিদের ইউনিয়ন পরিষদে কার্যকর ভূমিকা পালনের মাধ্যমে। পরিষদের চেয়ারম্যান ও সকল পুরুষ সদস্যের সহযোগিতার উপর। সরকারিভাবে তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র সৃষ্টির মাধ্যমে।

যতই দিন যাচ্ছে, দেশের নারী সমাজ সব দিক থেকেই সচেতন হয়ে উঠছে। আগে পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় নারীর পদগুলো ছিল মনোনীত। এ সকল পদে মনোনীত হয়ে নারীরা চেয়ারম্যান ও প্রভাবশালীদের ইচ্ছায় পরিচালিত হতেন। কিন্তু স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ১৯৯৭ অনুযায়ী নারীর সরাসরি প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এ সকল নারী প্রতিনিধিরা প্রথমবারের মত সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ও অংশগ্রহণে অবতীর্ণ হন। প্রায় অধিকাংশেরই রাজনীতিতে আগমন এটাই প্রথম। সকল সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে নারী প্রতিনিধিরা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন, অংশগ্রহণ করেছেন, নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ফলে নারীদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গবেষণা প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে কোন কোন এলাকায় চেয়ারম্যান নারী সদস্যদেরকে মর্যাদা দিচ্ছেন। ক্ষমতাচর্চা ও ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডে সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী চেয়ারম্যানগণ নারী প্রতিনিধিদেরকে সম্পৃক্ত করতে বাধ্য হচ্ছেন। নারীর ক্রমেই একটা নিজস্ব পরিচিতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রদানে মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, নিজ অর্জন সম্পর্কে আরো সচেতন হয়ে উঠছেন। গবেষণা এলাকায় দেখা গেছে, অনেক নারী প্রতিনিধিই জনগণের বিভিন্ন প্রয়োজনে সহায়তা ও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করছেন।

বর্তমান ব্যবস্থায় সাধারণ আসনে ও সংরক্ষিত আসনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে এবং নারীর ভূমিকা পালনে বাধাগ্রস্থ করছে তা একদিনে নিরসন করা সম্ভব নয়। অদূর ভবিষ্যতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালীকরণে নারীর ভূমিকা পালন সহজ হবে।

শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধির পূর্বশর্ত হলেও শুধু শিক্ষা অর্জনই যথেষ্ট নয়। নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের সভায় উপস্থিত থেকে সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে, বিভিন্ন গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে, মত বিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করে জনগণের ও এলাকার সমস্যাগুলো সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা করে জনসম্মুখে কথা বলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

নারী প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হলেই যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার শক্তিশালী হবে তা নয়। কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। নারী প্রতিনিধিদের মতামতের গুরুত্ব দিতে হবে। সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং সঠিকভাবে বাস্তবায়নেরও সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। তাহলেই তৃণমূল পর্যায়ে রাজনীতিতে নারী তার সঠিক অবস্থান তৈরি করে নিতে পারবে। স্থানীয় শাসন শক্তিশালী করায় অবদান রাখতে সক্ষম হবে। ইউনিয়নে পরিষদে নারীর ধারাবাহিক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একদিন স্থানীয় সরকারে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে। বিভিন্ন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে নারী সদস্যরা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে এবং শক্তিশালী হবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদ।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

আহমেদ তোফায়েল (১৯৯৮), স্থানীয় সরকারের সংস্কার ভাবনার দুই দশক, ভোলা, কোষ্ট ট্রাষ্ট।

চৌধুরী, নাজমা ও অন্যান্য (সম্পাদিত) ১৯৯৪, নারী ও রাজনীতি, ঢাকা, উইমেন ফর উইমেন।

গুহঠাকুরতা, মেঘনা, বেগম সুরাইয়া ও আহমেদ হাসিনা (সম্পাদিত) ১৯৯৭, নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি, ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।

হক মোজাম্মেল, মহিউদ্দিন কে, এম (২০০০), ইউনিয়ন পরিষদে নারী পরিবর্তনশীল ধারা, ঢাকা: বাংলাদেশ নারী পরিবর্তনশীল সংঘ।

হোসেন সেলিনা ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত) ২০০০, নারী ক্ষমতায়ন ও রাজনীতি ও আন্দোলন, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

হক এ, কে শামসুল ছাকী, কাজী মো: আফছার হোসেন (২০০৩), ইউনিয়ন পরিষদ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, ঢাকা: জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনষ্টিটিউট ম্যানুয়েল।

রহমান, ড. মো:মকসুদুর (২০০০), বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, রাজশাহী; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পাঠ্য পুস্তক অনুবাদ ও প্রকাশনা বোর্ড, র্তৃতীয় সংস্করণ।

হাসানুজ্জামান, আল মাসুদ (সম্পাদিত) ২০০২, বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমটেড।

আহমেদ, উদ্‌দীন, সিরাজ (২০১২), জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি মেক্সিকো থেকে বেইজিং, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা।

মজুমদার, পাল, প্রতিমা (২০০১), জাতীয় বাজেটে নারীর অংশ, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা।

কেলি, মে, রিটা ও বুটিলিয়ার, মেরী (১৯৯১), রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সাহা, কুমার, দিলীপ (১৯৯৭), স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা, মৈত্রী সাহা।

সুলতান, টিপু, এম, কে (১৯৮৫), বিকেন্দ্রীকরণ স্থানীয় সরকার ও সম্পদ আহরণ, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা।

সিদ্দিকী কামাল, (১৯৮৯), বাংলদেশের স্থানীয় সরকার, এনআইএলজি, ঢাকা।

আলী, এম,এম (১৯৯৭) ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েল, অনিন্দ্য প্রকাশক, ঢাকা।

আহমদ, এমাজউদ্দিন (২০০০) বাংলাদেশ লোক প্রশাসন, অনন্যা প্রকাশ, ঢাকা।

মজুমদার, আলম বদিউল (২০১১), গণতান্ত্রিক উত্তরণ স্থানীয় শাসন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

আহমেদ তোফায়েল (২০১১), বৃত্ত ও বৃত্তান্ত: বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় শাসন, রাজনীতি ও উন্নঢন ভাবনা, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

নাজিমউদ্দিদ, মো. (২০১২), স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ আইন ও বিধিমালা গুরুত্বপূর্ণ পরিপত্রের সংকলন, মাতৃভায়া প্রকাশ, ঢাকা।

Siddiqui, Kamal (ed)1995. Local Government in Bangladesh, Dhaka: UPL.

Ahmed, Nazimuddin (1986), Buildings of The British Raj in Bangladesh, University Press Limited, Dhaka.

Islam, Shamima (1982), Women's Education in Bangladesh Needs and Issues (FREPD) Dacca.

Huq, Jahanara, Shamim, Ishrat, Chowdhury, Najma, Begum Akhtar Hamida (1995), Women in Politics and Bureaucracy, Women for Women.

Huq, Jahanara, Salahuddin Khaleda, Begum, Akhtae, Hamida (1997), Beijing Process and Follow-Up Bangladesh Perspective, Women for Women.

Khan, Rahman, Zarina (1992) Women Work and Values, Centre For Social Studies, Dhaka University.

Chowdhury, Najma, Begum A. Hamida, Islam, Mahmuda, Mahtab Nazmunnessa (1994), Women and Politics, Women for women, Dhaka.

Khan, Mohabbat Mohammad (2011), Local Government in Bangladesh, Some Contemporary Issues and Practices, AH Development Publishing House.

UP Poll 2003, Violence Barred Many From Exercising Their Franchise (2003), A Monitoring Report, News Network.

Mallick Bishawjit (2004), Local Government People's Institution, A Compilation on Local Government Issue, AH Development Publishing House.

Ali Almas, MD. (2006) The Role of Union Council in Empowering Women at The Grass Root Level: An inquiry into The Problems and Prospects. Miazee Publications, Dhaka.

VARMA, SUDHIR (1997), Women's Struggle For Political Space, Rawat Publications, Jaipur and New Delhi.

Guha, Sampa (1996), Political Participation at Women in A Changing Society, Inter-India Publications, (India)

Nelson, Barbara, and Chowdhury Najma (1997), Women And Politics, Oxford University Press.

Jahan, Roushan, Qadir, Rowshan, Suyeda, Begum, Akhtar, Hamida, Huq, Jahanara (1995), Empowerment at Women, Nairoby to Beijing (1985-1995), Women For Women.

Vidya, C.K (1997), Political Empowerment of Women at The Grass Roots Kanishka Publishers, New Delhi.

Kumari, Ranjana (1992), Women in Decision Making, Vikas Publishing House.

বাংলাদেশে শক্তিশালী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকা : পরিপ্রেক্ষিত

ইউনিয়ন পরিষদ
প্রশ্নমালা জরিপ-২০১৩
পি.এইচডি (২০০৯-১০)
শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের মতামত জরিপ। সংগৃহীত তথ্যগুলো শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে। গবেষণা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে না।

১। উত্তরদাতার নাম ঃ .....

২। ঠিকানা ঃ গ্রাম.....ইউনিয়ন.....
থানা.....জেলা.....

৩। নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাঃ

বয়স সীমা	বৈবাহিক মর্যাদা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশার ধরণ	মাসিক আয়
২৫-৩০	বিবাহিত	স্বাক্ষর	শিক্ষকতা	৫০০০-১৫০০০
৩০-৩৫	অবিবাহিত	মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ-৯ম)	রাজনীতি	১৫০০০-২৫০০০
৩৫-৪০	তালাকপ্রাপ্ত	এসএসসি	গৃহিনী	২৫০০০-৩৫০০০
৪০-৪৫	বিধবা	এইচএসসি	এনজিও কর্মী	৩৫০০০-৪৫০০০
৪৫-৫০		স্নাতক	ব্যবসা	৪৫০০০-৫৫০০০
৫০+		স্নাতকোত্তর	অন্যান্য	৫৫০০০

৪। নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের পারিবারিক অবস্থাঃ

স্বামীর পেশা		স্বামীর শিক্ষাগত যোগ্যতা	পরিবারের সদস্য সংখ্যা
শিক্ষকতা		স্বাক্ষর	৪-৫
চাকরি		মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ-৯ম)	৬-৭
কৃষিকাজ		এসএসসি	৮-৯
অবসরভোগী		এইচএসসি	১০-১১
ব্যবসা		স্নাতক	১২-১৩
অন্যান্য		অন্যান্য	১৪+

৫। নারী সদস্যদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের কারণঃ

অংশগ্রহণের কারণ	ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগ	পারিবারিক অনুপ্রেরণা	প্রতিবেশির/জনগণের ইচ্ছা	এনজিওদের প্রচেষ্টা	অন্যান্য

৬। ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত হওয়ায় আপনার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?

ক) হ্যাঁ খ) না।

৭। নির্বাচিত হওয়ার পিছনে কোন পারিবারিক, সামাজিক বা ধর্মীয় বাধা ছিল কিনা?

ক) হ্যাঁ খ) না।

৮। শক্তিশালী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের কোন ভূমিকা আছে কি?

ক) হ্যাঁ খ) না।

৯। ইউনিয়ন পরিষদের সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকেন কি?

ক) হ্যাঁ খ) না গ) মাঝে মাঝে

১০। উপস্থিত না থাকলে কেন থাকতে পারেন না?

ক) পারিবারিক সমস্যা খ) যাতায়াতের অসুবিধা

গ) চেয়ারম্যানের অসহযোগিতা ঘ) সভার খবর যথাসময়ে না পাওয়া।

ঙ) অন্যান্য

১১। সভায় স্বতঃস্ফুর্তভাবে সবসময় নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারেন কি?

ক) হ্যাঁ খ) না।

১২। সভায় কাদের সিদ্ধান্তকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়?

ক) চেয়ারম্যান খ) পুরুষ সদস্য গ) নারী সদস্য ঘ) নারী পুরুষ উভয়ের সমান গুরুত্ব

১৩। নারী সদস্য কম হওয়ায় তাদের অবহেলা করা হয় কি?

ক) হ্যাঁ খ) না

১৪। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন?

ক) সহযোগিতামূলক খ) অসহযোগিতামূলক

১৫। সভার তারিখ আপনাকে কিভাবে জনানো হয়?

ক) চিঠিপত্রে মাধ্যমে খ) মৌখিকভাবে গ) মোবাইল ফোনে ঘ) অন্যান্য

১৬। সভার উপস্থিতি ও ইউনিয়ন পরিষদের অন্যান্য কর্মকান্ডে পরিবারের সদস্যরা কি আপনাকে সাহায্য করে।

ক) হ্যাঁ খ) না

১৭। পারিবারিক ও যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কার পরামর্শ নেন?

ক) পিতা খ) স্বামী গ) ছেলে ঘ) নিজে

১৮। আপনি কি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হিসেবে কোন সম্মানী পেয়ে থাকেন?

ক) হ্যাঁ খ) না

১৯। সম্মানী না পেলে কেন পান না?

ক) সম্মানী পাওয় যায় তা জানেন না খ) চেয়ারম্যান দেন না

গ) অন্যান্য

২০। নির্বাচনকালীন সময়ে এলাকাবাসীকে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিনা?

ক) হ্যাঁ খ) না

২১। প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকলে সেগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা?

ক) হ্যাঁ খ) না

২২। ভবিষ্যতে পুনরায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চান কিনা?

ক) হ্যাঁ খ) না

২৩। ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট, ত্রান ও উন্নয়ন খাতে সম্পদ আছে সেটা জানেন কি?

ক) হ্যাঁ খ) না

২৪। ইউনিয়ন পরিষদকে কেন্দ্রীয় সরকার যেসব দায়িত্ব দিয়েছে সে সম্পর্কে কোন ধারণা আছে কি?

ক) হ্যাঁ খ) না

২৫। সালিশ বিচারে অংশগ্রহণ করেন কিনা?

ক) হ্যাঁ খ) না

২৬। উন্নয়ন প্রকল্প কমিটি ও অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে কমিটির প্রধান করা হয় কি না?

ক) হ্যাঁ খ) না

২৭। সাধারণ মানুষের আপনার প্রতি মনোভাব কি? তারা কি আপনার কাজে সন্তুষ্ট-

ক) হ্যাঁ খ) না

২৮। ইউনিয়ন পরিষদের সভায় আপনার এলাকার সমস্যাগুলো তুলে ধরতে পারেন কি?

ক) হ্যাঁ খ) না

২৯। এ বিষয়ে আপনার এলাকার সমস্যার সমাধানে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় কি?

ক) হ্যাঁ খ) না

৩০। আপনি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত কি না?

ক) হ্যাঁ খ) না

৩১। পেশাগত দায়িত্ব পালনে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা পান কি না?

ক) হ্যাঁ খ) না

৩২। ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত নারীদের প্রশিক্ষণের দরকার আছে কি?

ক) হ্যাঁ খ) না

৩৩। আপনাকে যে ক্ষমতা দেয়া হয় সেটা বাস্তবায়ন করতে গেলে কি ধরনের বাধার সম্মুখীন হন?

১।

২।

৩।

৩৪। আপনার এলাকার প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো কী কী?

১।

২।

৩।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে শক্তিশালী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠায়
নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকা ঃ পরিপ্রেক্ষিত
ইউনিয়ন পরিষদ
প্রশ্নমালা জরিপ-২০১৩
পি.এইচডি
শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, পুরুষ সদস্য ও সচিবদের মতামত জরিপ। সংগৃহিত তথ্যগুলো শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে। গবেষণা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে না।

১। উত্তরদাতার নাম ঃ.....

২। উত্তরদাতার ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ.....ইউনিয়ন ঃ .....
থানা ঃ.....জেলাঃ.....

৩। উত্তরদাতার বয়সঃ .....

৪। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ.....

৫। পেশা ঃ.....

৬। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণকে আপনি কি সমর্থন করেন?
ক) হ্যাঁ খ) না

৭। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করায় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারীদের কোন ভূমিকা আছে কি?
ক) হ্যাঁ খ) না

৮। নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা ইউনিয়ন পরিষদের সভা ও কর্মকান্ডে নিয়মিত উপস্থিত থাকেন কি?
ক) হ্যাঁ খ) না

না থাকলে কেন থাকেন না?
১।
২।
৩।

৯। ২০১১ সালের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের কার্যক্রমে আপনি সন্তুষ্ট কি না?
ক) হ্যাঁ খ) না

সন্তুষ্ট না হলে এর কারণ কি?

১।

২।

৩।

১০। কেন্দ্রীয় সরকার নারী প্রতিনিধিদের যে দায়িত্ব দিয়েছেন সে সম্পর্কে তাদের ধারণা আছে কি?

ক) হ্যাঁ খ) না

১১। ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্যদের সংখ্যা বাড়ানো উচিত কি না?

ক) হ্যাঁ খ) না

১২। নারী প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত কি না?

ক) হ্যাঁ খ) না

১৩। নারী প্রতিনিধিরা প্রায়ই অভিযোগ করেন তারা কাজ পাননা। এর সত্যতা কতটুকু?

১।

২।

৩।

১৪। স্থানীয় সমস্যা সমাধানে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নির্বাচিত নারীদের পুরুষদের মত দায়িত্ব দেওয়া উচিত কিনা?

ক) হ্যাঁ খ) না

১৫। আপনি কি মনে করেন দায়িত্ব পেলে নারীরাও তা সঠিকভাবে পালন করতে সক্ষম?

ক) হ্যাঁ খ) না

১৬। আপনার ইউনিয়নে নারী সদস্যদের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন?

ক) সহযোগিতামূলক খ) অসহযোগিতামূলক

১৭। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী প্রতিনিধিরা আগ্রহী কি না?

ক) হ্যাঁ খ) না

১৮। নারী প্রতিনিধিরা দায়িত্ব পালনে বাধার সম্মুখীন হন কি না?

ক) হ্যাঁ খ) না

১৯। নারী প্রতিনিধিরা সালিশ বিচারে অংশগ্রহণ করেন কি না?

ক) হ্যাঁ খ) না

২০। আপনার ইউনিয়নে কর্মক্ষেত্রে নারী সদস্যরা কোন অবদান রেখেছেন কিনা?

ক) হ্যাঁ খ) না

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে শক্তিশালী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠায়

নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকা ঃ পরিপ্রেক্ষিত

ইউনিয়ন পরিষদ

প্রশ্নমালা জরিপ-২০১৩

পি.এইচডি (২০০৯-১০)

শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ জনগণের মতামত জরিপ। সংগৃহিত তথ্যগুলো শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে। গবেষণা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে না।

১। উত্তরদাতার নাম ঃ.....

২। উত্তরদাতার ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ.....ইউনিয়ন ঃ .....

থানা ঃ.....জেলাঃ.....

৩। উত্তরদাতার বয়সঃ .....

৪। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ.....

৫। পেশা ঃ.....

৬। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণকে আপনি কি সমর্থন করেন?

ক) হ্যাঁ খ) না

৭। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করায় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারীদের কোন ভূমিকা আছে কি?

ক) হ্যাঁ খ) না

৮। নির্বাচনের সময় নারী প্রার্থীরা এলাকাবাসীকে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিনা?

ক) হ্যাঁ খ) না

৯। নির্বাচনের সময় নারী প্রার্থীরা যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নির্বাচিত হয়ে সেগুলো বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন কিনা?

ক) হ্যাঁ খ) না

১০। নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের দ্বারা ইউনিয়ন পরিষদের যেসব সমস্যা আছে সেগুলোর সমাধান করা সম্ভব কিনা?

ক) হ্যাঁ খ) না

১১। স্থানীয় সমস্যা সমাধানে নির্বাচিত নারীদের পুরুষদের মত দায়িত্ব দেওয়া উচিত কিনা?

ক) হ্যাঁ খ) না

১২। বর্তমানে ২০১১ সালের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের কাজে আপনি সন্তুষ্ট কিনা?

ক) হ্যাঁ খ) না

১৩। আপনার ইউনিয়নে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনোভাব কি?

১।

২।

৩।

১৪। নির্বাচনের আগে বা পরে দায়িত্ব পালনে নারীরা কি কি বাধার সম্মুখীন হয়েছেন?

১।

২।

৩।

১৫। আপনার এলাকার প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো কি কি?

১।

২।

৩।